



হরর কাহিনি

ছায়াবৃত্ত

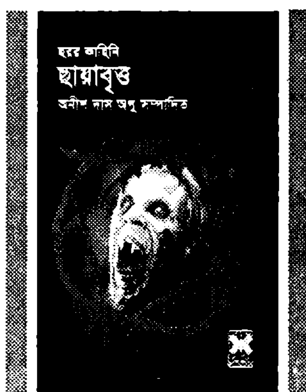
অনীশ দাস অপু সম্পাদিত

হরর কাহিনি

ছায়াবৃত্ত

সম্পাদনা

অনীশ দাস অপু





সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-0244-X

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৯

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

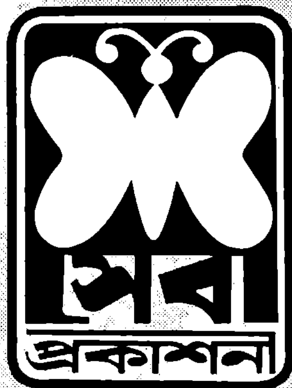
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
e-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭১৮ ১৯০২০৩

CHHAYABRITTO
Horror Stories
Edited by: Anish Das Apu



বাহান্ন টাকা

সূচি



লেখকের আরও ক'টি হরর বই

অনীশ দাস অপু

আবার অশুভ সংকেত+নেকড়ে মানবী	
ওখানে কে?	৩৬/-
আরেক ড্রাকুলা	৩৮/-
অশুভ ১৩+অশরীরী আতঙ্ক	৫০/-
অশুভ ছায়া	৪৭/-
ভূত	৫৯/-
ওয়্যারউলফ	৫১/-

অনীশ দাস অপু সম্পাদিত

ধূসর আতঙ্ক	৩৩/-
মৃত্যু-পুতুল	৪০/-
রক্ততৃষ্ণা	৫২/-
ভুতুড়ে দুর্গ	৪৭/-
ভৌতিক হাত	৫৬/

তাহের শামসুদ্দীন/অনীশ দাস অপু

প্রেতশক্তি+পিশাচ দেবতা	৪০/-

ভূমিকা

এ বইয়ের নাম **"ছায়াবৃত্ত"** রাখার কথা ছিল না। আমি আরেক লেখকের গল্পের নামে বইয়ের নাম ঠিক করেছিলাম। কারণ **'ছায়াবৃত্ত'** আমার পড়া ছিল না। আমি পাঠকদের অনুরোধে আমার দশম হরর সংকলনটি তৈরির চেষ্টা করছি শুনে একদিন টেলিফোনে টিংকু ভাই বললেন, 'অনীশ দা, **'ছায়াবৃত্ত'** পড়েছেন? না পড়লে পড়ে দেখতে পারেন। আপনার ভাল লাগতে পারে।' টিংকু ভাই যখন একটি গল্পের নাম উল্লেখ করে ওটা আমাকে 'পড়ে দেখা'র অনুরোধ করেন, বুঝতে পারি ওই গল্পে নিশ্চয় এমন কিছু থাকবে যা আমার ভাল না লেগে পারবে না। (অবশ্য সবসময় যে আমরা একমত হতে পারি তা নয়...) আমি **'ছায়াবৃত্ত'** পড়লাম এবং বলে উঠলাম, 'বাহ্! এরকম হরর গল্পই তো আমি চাই।' সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের নাম চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়ে গেল–*ছায়াবৃত্ত*।

বইটিতে দেড় ডজন গল্প আছে। কিছু পিশাচ, কিছু ভৌতিক এবং দু'একটি রোমাঞ্চ কাহিনি। আর রয়েছে দু'টি দারুণ ভৌতিক অভিজ্ঞতা। বিপিন বিহারীর *'পাহাড়ী পিশাচ'* পড়ে আমি এতটাই মুগ্ধ, তাঁর এই গা শিউরানো অভিজ্ঞতাটি এই বইতে ছাপার লোভ সামলাতে পারলাম না। রহস্যপত্রিকার পাঠক জানেন বিপিন বাবু তাঁর লেখনীতে ভৌতিক আবহ সৃষ্টিতে কতটা দক্ষ! যাঁরা রহস্যপত্রিকা নিয়মিত পড়েন না কিন্তু আমার হরর সংকলনগুলো কখনও মিস করেন না, তাঁরা বিপিন বিহারীর *'পাহাড়ী পিশাচ'* লেখাটি সবার আগে পড়বেন। বুঝতে পারবেন কেন আমি এ লেখকের মুগ্ধ পাঠক!

আবদুল বাসিতের *'জুয়াড়ী'* নিঃসন্দেহে একটি প্রথম শ্রেণীর হরর কাহিনি। একই কথা প্রযোজ্য আসমার ওসমানের *'ইকবাল আহমেদের কৌশল'*-এর ক্ষেত্রেও। এ গল্পে বহুল আলোচিত স্নাফ মুভি তৈরির বিষয়টি লেখক চমৎকার মুন্সিয়ানার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন–গায়ে কাঁটা

দেয়।

মুহম্মদ আলমগীর তৈমুরের লেখার হাতটি অতি চমৎকার। নতুন এ লেখকটি দুর্দান্ত একটি হরর কাহিনি রচনা করেছেন *'বংশালের বনলতা'* নামে। যদ্দূর জানি ভদ্রলোক শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। যাঁর লেখার হাত এত কুশলী, ভবিষ্যতে এই তৈমুর সাহেবের কাছ থেকে *'বংশালের বনলতা'র* মত চমক জাগানো আরও হরর গল্প চাই।

রুমানা বৈশাখী রহস্যপত্রিকায় দীর্ঘদিন ধরে লিখছেন। এবং ভালই লিখছেন। তাঁর *'ছায়া সঙ্গী'* আমার কাছে ভাল লেগেছে বলেই এ সংকলনে ছেপে দিলাম।

তাহমিনা সানি রহস্যপত্রিকার আরেকজন নিয়মিত লেখিকা। তাঁর *'পরাজয়'* আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি বেশ একটা চমক পেয়েছি সুলেখক মিজানুর রহমান কল্লোলের *'ফটক বন্ধ ছিল'* পড়ে। গা শিরশির করেছে শাহনেওয়াজ খানের *'ডাইনীর কুশপুত্তলিকা'* এবং রাসেল আহমেদের *'দু'জন দুর্বল মানুষ'* পড়ে। কাজী শাহনূর হোসেনের অনূদিত হরর *'ভৌতিক'*-এর শেষদিকে ধাক্কা খাওয়ার মত একটা চমক আছে। আশা করি ভাল লাগবে রুবেল কান্তি নাথের *'মৃত্যু পরোয়ানা'* এবং তারক রায়ের *'রহস্যময় অন্তর্ধান'*ও। মনোয়ার রহমান হারুনের 'অতৃপ্ত আত্মা'ও কিন্তু হরর গল্প হিসেবে উতরে গেছে। খসরু চৌধুরীর হরর অভিজ্ঞতা *'মা কালী'* রহস্যপত্রিকার পাঠকদের ভাল লেগেছে, আশা করি সেবার পাঠকদেরও ভাল লাগবে। মোঃ মুশফিকুর রহমানের *'পৈশাচিক'* আমার চোখে একটি দারুণ পিশাচ কাহিনি। আপনাদের কেমন লাগবে জানি না। জানি না এ অধম সম্পাদকের 'ভুডু' গল্পটি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হবে কিনা....

অনীশ দাস অপু
ধানমণ্ডি, ঢাকা।

ছায়াবৃত্ত

আমার নাম জুনায়েদ হায়দার পাশা। লেখক।

অবশ্য সাহিত্যজগতে এখন আমার আর কোন নামডাক নেই। এককালে লিখতাম রহস্য উপন্যাস, পাতায় পাতায় শিহরণ। সত্যি বলতে কী, ওই একটা সময় ছিল! লেখা বাজারে আসার দীর্ঘদিন পর্যন্ত বেশ ভালরকমের বিক্রিটিক্রি হত, উপার্জনও কোন অংশে কম হত না। কিন্তু বাংলায় একটা কথা আছে না, সুখে থাকতে ভূতে কিলায়, আমার হলো সেই দশা। সাহিত্যের মূল ধারায় নাম লেখানোর জন্যে ভূতের গপ্পো ছেড়ে ধরলাম সামাজিক নাটক। কী লিখেছি বলতে পারব না, তবে পরপর তিনটা বই বাজারে মুখ থুবড়ে পড়লেও সামাজিক নাটক লেখার জজবা বিন্দুমাত্র কমেনি আমার। 'ভূত' পত্রিকার সম্পাদক কয়েক সপ্তাহ আগে আমাকে তাঁর অফিসে ডেকে নিয়ে বললেন, 'শুনুন, জুনায়েদ সাহেব, ওইসব ভারি ভারি কথার সাহিত্য আপনাকে দিয়ে হবে না। আপনি যে লাইনের লোক সে লাইনেই আসুন। সামনের মাসের ঈদ সংখ্যার জন্যে আপনি একটা বেশ জমজমাট ভৌতিক উপন্যাস লিখে ফেলুন। দেখবেন, বাজারে আবার কাটতি বেড়ে যাচ্ছে।'

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, 'রহস্য টহস্য লিখতে ভাল লাগে না। সিলি সিলি সব বিষয় নিয়ে মাতামাতি করাটা অতি বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পড়ে।'

ভদ্রলোক গলা খাঁকরে বললেন, 'কিন্তু পাবলিক ডিমাণ্ড বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। কত চিঠি এসেছে আপনাকে অ্যাড্রেস করে জানেন? সব চিঠির ওই একই কথা–জুনায়েদ হায়দার পাশার জমজমাট ভূতের গল্প চাই। তা ছাড়া আপনার নিজের বাজার দরটাও তো দেখতে হবে। জনপ্রিয়তার গ্রাফ যেভাবে নামছে তাতে তো...'

আমি খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললাম, 'নতুন করে একটা লিখতে বলছেন?'

'বিজ্ঞাপনটা খালি কল্পনা করুন–আসছে ঈদসংখ্যায় জুনায়েদ হায়দার পাশার সম্পূর্ণ নতুন ভৌতিক উপন্যাস, দীর্ঘ তিনবছর পর আবার লিখলেন এককালের ভৌতিক সম্রাট।'

'দয়া করে শেষের কথাটা লিখবেন না। শুনতে অসহ্য লাগে।'

সম্পাদক সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, 'তা হলে ওসব বাদ দিয়ে শুধু হরর কিঙ লিখলে কেমন হয়? ইংরিজি কথা তো, একটা বেশ ইয়ে আছে।'

আমি ভদ্রলোককে কথা দিয়ে ফেললাম যে এবারের ঈদে দীর্ঘদিন পর আমার নতুন একটা হরর উপন্যাস যাচ্ছে।

রিটার্ন অভ দি হরর কিং জুনায়েদ হায়দার পাশা।

আর সমস্যার শুরুটা এখান থেকেই।

নিরিবিলিতে লেখালেখি করার জন্যে শহরতলির কাছে মাসখানেকের জন্যে একটা বাসা ভাড়া করলাম। আগের বাসায় লোকজন অনেক, কাজে খুব ব্যাঘাত হয়। এখানে লোকজন তেমন একটা পরিচিত নেই, কাজেই সমস্যা হবার কথা নয়। একটা ছোকরা চাকর রেখে দিয়েছি, সারাদিন থেকে রান্নাবাড়ি করে রাতে চলে যায়। আমি সারারাত টাইপ রাইটারে খটাখট শব্দ তুলে গল্প লেখার চেষ্টা করি। তবে দু'তিন দিনের মাথায়ই বুঝতে পারলাম আমার অবস্থা খারাপ। যা লিখছি, তাকে কোনভাবেই সুসাহিত্য বলা যায় না। ছাই ভস্মও বোধহয় এরচেয়ে ভাল। রাগে আমার মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করে। সারারাত জেগে থেকে গলদঘর্ম হয়ে শেষরাতের দিকে ঘুমাতে যাই। নিরুপদ্রব ঘুমও হয় না। নানান আজেবাজে স্বপ্ন দেখে দিনের বেলায় ঘুম ভাঙে।

যে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছি তার চারদিকটা বেশ সুন্দর। বাড়ির সামনে পিছনে অনেকখানি খোলা জায়গা, তাতে হরেক রকমের গাছটাছ আছে। তবে যত্নের অভাবে জায়গাটা জঙলা হয়ে গেছে। বাড়ির মালিকের একসময় হয়তো বাগান করার শখ ছিল, পরে কোন কারণে উৎসাহে ভাটা পড়ে যায়। অবশ্য জঙলা হলেও জায়গাটা আমার ভালই লাগে।

বিশেষত দিনের বেলা যখন সূর্যের আলো বড়বড় নারিকেল গাছগুলোর ওপর পড়ে তখন কল্পনা করে নিতে ভাল লাগে যে আমি জঙ্গলের মধ্যে বসে আছি। তবে রাতের বেলা বাড়ির কম্পাউণ্ডটার দিকে তাকালে একটু গা ছমছমই করে বটে। শত হলেও এতবড় একটা নির্জন বাড়ি, তার ওপর আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোন প্রাণীটি তো রাতের বেলা থাকে না–যৎসামান্য ভয় লাগাটাই স্বাভাবিক। অবশ্য গোটা ব্যাপারটা আমি রীতিমত উপভোগ করার চেষ্টা করি। হরর গল্পের লেখকের জন্যে এটাই তো উপযুক্ত পরিবেশ।

দুপুরে ভাত খাওয়ার পর কাগজ কলম নিয়ে একটু বসেছি, শব্দ পেয়ে মুখ তুলে দেখি আমার ছোকরা কাজের ছেলেটা তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে শোবার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটার বয়স পনেরো ষোলোর বেশি হবে না, মোটামুটি বুদ্ধিও রাখে।

'কিছু বলবি নাকি রে?'

'আপনের সাথে দেখা করার জন্যে চশমা পরা এক সাব আসছে। নাম জিগাইছি, কয় না।'

আমি বুঝলাম কে এসেছে। লোকটার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ মুক্তাদির, গতকালই আলাপ হয়েছে, আমার রহস্য গল্পের যাকে বলে সিরিয়াস ভক্ত। আমি কেন রহস্য রোমাঞ্চ লাইন ছেড়ে দিয়েছি এ বিষয়ে প্রথমে খুব আক্ষেপ করলেন ভদ্রলোক। কিন্তু পরে যখন তাঁকে বললাম যে আমি আবার নতুন করে ওসব শুরু করতে যাচ্ছি, তখন যারপর নাই খুশি হলেন। বললেন, তাঁর কাছে নাকি এমন একটা জিনিস আছে যেটা দেখলে আমি রীতিমত অবাক হয়ে যাব। কী জিনিস জানতে চাইলে বললেন আগামীকাল বাড়িতে এসে দেখিয়ে দিয়ে যাবেন। সত্যি বলতে কী, এই লোকটাকে কেন জানি উপদ্রব বলে মনে হচ্ছে না, তাই আর না করিনি, ভদ্রলোককে বাড়িতে আসতে বলে দিয়েছি।

'ওনাকে ড্রইংরুমে বসা। আমি আসছি।'

'আচ্ছা, মামা।'

ছেলেটি চলে যাবার পর আমি আলনা থেকে হাত বাড়িয়ে পাঞ্জাবিটা নিয়ে গায়ে চাপালাম। বসার ঘরে গিয়ে দেখি সোফার ওপর আয়েশি

ভঙ্গিতে বসে আছেন মোহাম্মদ মুক্তাদির। ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের বেশি হবে না, দেখতে যদিও বৃদ্ধের মত লাগে। এখন সময়টা মার্চ মাস, বেশ গরম আবহাওয়া, কিন্তু ভদ্রলোক দেখি এর মধ্যেও কোট-মাফলার চাপিয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখে মোহাম্মদ মুক্তাদির দাঁড়িয়ে গেলেন।

'আরে বসুন, বসুন। তারপর খবর বলুন। সেদিনের পর তো ভাবলাম আর আসবেন না।'

'কী যে বলেন? আপনার মত বিখ্যাত একজন রাইটার আমার সাথে আগ্রহ নিয়ে কথা বলছেন, এই তো আমার পরম পাওয়া।' অত্যন্ত বিনয়ী ভঙ্গিতে বললেন ভদ্রলোক।

'চা চলবে তো?'

'সার্টেনলি।'

আমি আমার ছোকরা চাকরটিকে ডেকে চায়ের ফরমাস দিলাম।

মোহাম্মদ মুক্তাদির সোফায় নড়েচড়ে বসে বললেন, 'গতদিন বলেছিলাম না যে একটা মজার জিনিস আপনাকে দেখাব? আজকে সেটা নিয়ে এসেছি। এই যে...' ভদ্রলোক হাতে ধরে থাকা এ ফোর সাইজের খামটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। খামটা খুলে দেখি ভেতরে একতাড়া ফুলস্কেপ কাগজ। সবচেয়ে উপরের কাগজে খুদে খুদে টাইপের অক্ষরে লেখা:

'ছায়াবৃত্ত' আর তার নীচে লেখা আমার নাম, জুনায়েদ হায়দার পাশা।

'আরে এটা তো দেখি আমারই লেখা ম্যানুস্ক্রিপ্ট। কোত্থেকে পেলেন?'

'সনটা বুঝতে পারছেন?'

'অবশ্যই। লেখাই তো রয়েছে। মার্চ, নাইনটিন এইটি এইট।'

ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, 'কী, ভাই? ভাল সারপ্রাইজ না?'

আমার বিস্মিত হবার পালা এখনও শেষ হয়নি। বুঝতে পারছি না এই লেখা এনার কাছে গেল কীভাবে? একজন প্রায় অচেনা লোকের

কাছে আমার বহুদিন আগে লেখা পাণ্ডুলিপি দেখতে পাব এ স্বপ্নেও ভাবিনি। কয়েকটা পাতা উল্টে দেখতে লাগলাম।

'এটা কীভাবে পেলাম সেটা একটা রহস্য হিসাবেই না হয় তোলা থাকুক, কী বলেন?'

'এই ম্যানুস্ক্রিপ্টটা আমারই লেখা সন্দেহ নেই। তবে ঠিক মনে করতে পারছি না কী লিখেছি।'

'তো অসুবিধা কী? আমি গোটাটা পড়ে দেখেছি। ফার্স্ট ক্লাস লেখা। আমার বিশ্বাস আপনি যদি এই গল্পটা লিখে শেষ করতে পারেন তা হলে আবার বাজিমাত হয়ে যাবে। জুনায়েদ হায়দার পাশার রাজসিক প্রত্যাবর্তন।'

আমি গাল চুলকে বললাম, 'সমস্যা হচ্ছে এই গল্পটা আমি আর লিখতে পারব না।'

'কেন?'

'আমি অন্যের লেখা প্লট নিয়ে কাজ করি না। আমার সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ।'

'কিন্তু এটা তো আপনারই লেখা?'

আমি হেসে বললাম, 'আমার লেখা হতে পারে, কিন্তু আমি তো, ভাই, শিওর না। মনেই করতে পারছি না কবে কখন লিখেছি। কাজেই এটাকে আমার লেখা বলে মেনে নিতে একটু প্রবলেম থাকাটাই স্বাভাবিক, কী বলেন?'

আমার কথা শুনে বুঝতে পারছিলাম মুক্তাদির সাহেব একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন। এটাই স্বাভাবিক। আমি পরিস্থিতি হাল্কা করার জন্যে বললাম, 'কিন্তু, ভাই, এটা না মেনে পারছি না যে আপনি আমাকে ভাল অ্যামাউণ্টে চমকে দিয়েছেন। থ্যাঙ্ক ইউ, সার।'

ভদ্রলোক আমার কথা শুনে হাসার চেষ্টা করলেন। তবে এরপর আর আলাপ খুব একটা ভাল জমল না। চা-চানাচুর খাওয়ার ঘণ্টাখানেক পর উনি বিদায় নিলেন। আমিও শোবার ঘরে গিয়ে বিছানায় একটু গড়াগড়ি দেব ভাবলাম। সন্ধ্যার পর আবার লিখতে বসতে হবে।

সেদিন সন্ধ্যায় প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি শুরু হলো। সময়টা মার্চ মাস হলেও

ঝড়ের তাণ্ডব দেখে মনে হচ্ছে কালবৈশাখীর ঠাকুরদাদা। আমার বাড়ির কম্পাউণ্ডের প্রত্যেকটা গাছ এমনভাবে দুলে উঠছে যেন কিছুক্ষণের মধ্যেই ওগুলো শেকড়সুদ্ধ উপড়ে যাবে। বাইরে থেকে ঝড়ো হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দ আসছে। লম্বা টানা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি কিছুক্ষণ বৃষ্টি উপভোগ করলাম। কিছুক্ষণ পর কাজের ছেলেটা এসে বলল যে তার চলে যাবার সময় হয়েছে, আমি যেন নীচে নেমে গেট লাগিয়ে দিয়ে আসি।

'কীরে, ব্যাটা, এই তুফানের মধ্যে বাসায় যাবি কীভাবে? রাতটা এখানেই থেকে যা।'

ছেলেটা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। বোঝাই যাচ্ছে আমার প্রস্তাব তার পছন্দ হয়নি। সে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মেঝেতে কীসব আঁকিবুঁকি করতে লাগল।

'কীরে, কিছু বল, গাধা।'

ছেলেটি অনেকক্ষণ পর দম নিয়ে বলল, 'এই বাড়িতে রাইতে থাকনের নিষেদ আছে।'

'মানে?'

'মায়ে কইছে এই বাড়িত জিন আছে, খুব খারাপ জিন। রাইতের বেলা থাকলে জানে মাইরা ফেলব।'

'সাংঘাতিক ব্যাপার তো?'

ছেলেটি কোন জবাব দিল না। আড়চোখে ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক সেদিক দেখল, কেউ তার কথা শুনে ফেলল কিনা বোঝার চেষ্টা করছে। আমি লক্ষ করলাম তার চোখেমুখে এক ধরনের শক্ত ভাব আছে। আন্দাজ করা যায় রাতে এ বাড়ি ত্যাগের বিষয়ে সে মোটামুটি বদ্ধপরিকর।

'আমি তো তিন চারদিন ধরে এখানে আছি, জিনভূত আমাকে ধরল না?'

ছেলেটি ইতস্তত করে বলল, 'মামা, আমারে যাইতে দেন। রাইত হয়া আসতাছে।'

'আগে ঠিক করে বল তুই নিজে কি কোনকিছু টের পেয়েছিস?'

'আমি নিজ চোক্ষে কিছু দেখি নাই। তয়...'

'তয় কী?'

'একদিন বাড়িত ফিরতে সন্ধ্যা লাগছিল। গেটের তালা খুইলা বাইরে বার হওনের সময় মনে হইল আমার পেছনে কেউ দাঁড়ায়া আছে। আমি সাথে সাথে পেছনে তাকাইলাম। কেন জানি মনে হইল কেউ আমারে আড়াল থেইকা নজর করতাছে। খুব খারাপ কেউ। আমি তাড়াতাড়ি গেট খুইল্যা চইলা যাই।'

'তুই এত ভয় পাস তাও এই বাড়িতে কাজ করিস কেন?'

'দিনের বেলা কোন ভয় নাই। মায়ে কইছে রাইতের আগে এই জায়গা ছাইড়া আইতে।'

'তুই তো, ব্যাটা, বেশ মাতৃভক্ত মনে হচ্ছে। আচ্ছা তোর থাকা লাগবে না, চলে যা।'

আমি একটা ছাতা সঙ্গে নিয়ে নীচ পর্যন্ত এগোলাম। একতলার লম্বা করিডরটা পার হবার সময় মনে হলো এতবড় এবং এত পুরানো একটা বাড়িতে, বিশেষত যেখানে একটি বৈ দুটি প্রাণী থাকে না, সেখানে অন্ধকার নামলে একটু গা ছমছম করাটাই স্বাভাবিক। আর ছেলেটির বয়সও তো দেখতে হবে।

আমি গেট লাগিয়ে দিয়ে উপরে চলে এলাম। এই বাড়িটা আসলেই অদ্ভুত। দোতলাটা, যেখানে আমি থাকি, চমৎকার জায়গা। আদ্যিকালের মত লম্বা টানা বারান্দা, বিশাল বিশাল একেকটা বাথরুম, তাতে অনায়াসে ফুটবল খেলা যায়। প্রত্যেকটা ঘর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতায় যাকে বলে দশাসই। অথচ একতলাটা দেখলে রীতিমত হতাশ হতে হয়। বিশাল একটা গোডাউনের মত জায়গা। ভেতরের সব দেয়াল ভেঙে ফেলে লম্বা একফালি জায়গা বের করে নেয়া হয়েছে। আমি যতদূর জানি ওটা একটা লোকাল ওষুধ কোম্পানির ভাঁড়ার ঘর, যদিও এ কয়দিনে কাউকে আসতে দেখিনি।

বিশাল এক তালা ঝুলছে একতলার সদর দরজায়।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির তেজও বেড়ে চলল। আমি বারান্দার দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ করে ঘরে গিয়ে বসলাম। টাইপরাইটারটা বিছানার

ওপর নিয়ে বসা মাত্রই লক্ষ করলাম একতাড়া ফুলস্কেপ কাগজ কে যেন বালিশ চাপা দিয়ে রেখেছে। ছায়াবৃত্তের সেই ম্যানুস্ক্রিপ্টটা।

ভদ্রলোককে তো সাফ বলে দিয়েছি যে এই প্লট থেকে গল্প লেখা সম্ভব না। তাঁর তো এটা নিয়ে যাবারই কথা। উনি কি ভুলে জিনিসটা ফেলে গেছেন আর আমার ছোকরা চাকরটি ওটাকে আমার লেখা ভেবে ঘরে এনে রেখেছে?

ম্যানুস্ক্রিপ্টটাকে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলাম। প্রথম যে চ্যাপ্টার লেখা হয়েছে তার কয়েকটা লাইন পড়তেই টের পেলাম অত্যন্ত জমজমাট একটা গল্পের স্টার্টিং হয়েছে। ঠিক মত লিখে শেষ করতে পারলে পাঠকমহলে আলোড়ন পড়ে যাবে। সত্যি বলতে কী মনের ভেতর একটু খুঁতখুঁত লাগছে। নিজের সাম্প্রতিক লেখা কাগজগুলোর দিকে চোখ গেল। কুসাহিত্য ছাড়া ওগুলোকে আর কিছু বলা যায় না। অথচ ছায়াবৃত্ত নামে আমারই সতেরো বছর আগেকার লেখাটা দেখলে চোখ জুড়িয়ে আসে। গল্পটা আসলে এক তরুণকে নিয়ে লেখা। ছেলেটা একটা ভুতুড়ে বাড়িতে আটকে পড়ে। আটকে পড়ার কারণটা অবশ্য একটু ছেলেমানুষি হয়ে যায়। তবে সমস্যা নেই। ভূতের গপ্পে লোকে এতকিছু খেয়াল করে না। তারপর একে একে ঘটতে থাকে ভয়াবহ সব ঘটনা। সব ঘটনার শুরু হয় একটা টেলিফোন কল থেকে। ছেলেটা রাতের বেলা একটা মিস্টিরিয়াস ফোনকল পায়। তারপর...

রিরিরিরিরিরঙঙঙঙঙঙঙ!

আমার মোবাইল ফোনটা আচমকা বাজতে শুরু করেছে।

চমকে উঠে আরেকটু হলে বিছানা থেকে পড়ে যাচ্ছিলাম। শেষটায় নিজেকে সামলে নিলাম। বুকের ভেতর কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে একেবারে। একেই বোধহয় বলে কোইনসিডেন্স। নম্বরটা দেখলাম। আমার সম্পাদক সাহেব।

'হ্যালো।'

'কী, ব্রাদার, খবর কী? শুনলাম ঢাকা শহর ছেড়ে গ্রামগঞ্জে আশ্রয় নিয়েছেন? লেখালেখির অবস্থা কেমন?'

'ভালই। আপনি কোত্থেকে বলছেন বলুন তো? লাইনটা বেশ

ডিস্টার্ব করছে।'

'নেত্রকোনা, ভাই। শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে এসেছি। ভাবলাম আপনি কী করছেন খবর নিই।'

'মেনি মেনি থ্যাঙ্কস। এখানে অবশ্য প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। আগামীকালকের আগে থামবে বলে মনে হয় না...' কথাটা বলেই থেমে যেতে হলো। মোবাইলে বিপ বিপ শব্দ হচ্ছে, এর অর্থ আরেকটা কল এসেছে। আমি সম্পাদক সাহেবকে ওয়েটিঙে রেখে কলটা রিসিভ করলাম।

'হ্যালো।'

ওপাশে কোন শব্দ নেই। ভাল করে কান পাতলাম। খুব অস্পষ্টভাবে খসখস শব্দ কানে আসছে।

'হ্যালো, হ্যালো...'

খুট করে লাইনটা কেটে দিল কেউ। আমি আবারও সম্পাদক সাহেবের কলটা রিসিভ করতে গেলাম।

ভদ্রলোক ওপাশে নেই। ফোন রেখে দিয়েছেন।

আমি বুঝতে পারলাম না কী করব? এটা কি কোনধরনের কোইনসিডেন্স, নাকি...? বিছানার ওপর পড়ে থাকা ম্যানুস্ক্রিপ্টটার দিকে চোখ পড়ল আবার। কয়েকটা পাতা দ্রুত উল্টে গেলাম। দেখি লেখা রয়েছে—

'খুব ভয় পাচ্ছি আমি। বাইরে বৈরি আবহাওয়া, অসহনীয় ভেতরকার পরিবেশ। টেলিফোনটা যে কেন ধরলাম? আগে যদি জানতাম তবে এ ভুল কখনও করতাম না। আমার মনের যত অন্ধকার আছে সব যেন আমায় আজ চেপে ধরতে বসেছে। এই ভয়াবহ আদিম নিঃসঙ্গতা আর সহ্য করতে পারছি না। বাইরের জগতের কারও সাথে যে যোগাযোগ করব তারও উপায় নেই। যোগাযোগের সমস্ত পথ বন্ধ। টের পাই নিকষ কালো আঁধার ধেয়ে আসছে আমার দিকে, মৃতের ছায়া চারপাশে অনুভব করি। হে, ঈশ্বর, রক্ষা করো আমায়।'

যোগাযোগের সমস্ত পথ বন্ধ এর অর্থ কী? জানি যা ঘটেছে তাকে একটা ছোট্ট কোইনসিডেন্স ছাড়া আর কিছু বলা উচিত না। ম্যানুস্ক্রিপ্টের

পরের পাতায় যা যা লেখা আছে তার সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজতে যাওয়াটা বোকামি হবে–নিজেকে বোঝালাম। তা ছাড়া আমার তো বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের সব পথই খোলা। এই তো চোখের সামনে আছে মোবাইল ফোন, নিমিষেই পৃথিবীর যে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। সবচেয়ে বড় কথা আমি যদি ইচ্ছা করি তা হলে অল্পক্ষণের ভেতরই কম্পাউণ্ডের গেট খুলে বাইরে যেতে পারব। সেখানে সম্পূর্ণ লৌকিক এবং স্বস্তিকর পরিবেশ অপেক্ষা করছে আমার জন্যে।

তবে, মিথ্যা বলব না, আমার কেন জানি একটু একটু ভয় করতে আরম্ভ করেছে। আমি জানি এর সবটাই ভীষণ রকমের অমূলক। কিন্তু তারপরও মনের গভীরে কুডাক ডাকতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

মোবাইল ফোনটা আবার তুলে নিলাম। লো ব্যাটারি সিগনাল দেখাতে শুরু করেছে। কুছ পরোয়া নেহি। কাছেই আছে চার্জার, দু'তিন মিনিট চার্জ পেলেই অন্তত খানতিনেক কল করা যাবে। কিন্তু তার আগে কাজ আছে। আমি পাঞ্জাবির পকেট হাতড়ে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করলাম। মোহাম্মদ মুক্তাদির আজ দুপুরেই এটা আমাকে দিয়েছেন। এই অপরিচিত জায়গায় ওনার মত একজন প্রতিবেশী পেয়েছি ভাবতেও জানে পানি আসে। লোকটাকে ফোন করব কারণ সবার আগে জানা দরকার এই ম্যানুস্ক্রিপ্ট সত্যি সত্যি তিনি পেলেন কীভাবে? অস্বীকার করব না এই একটা সামান্য কাকতালীয় ব্যাপার আমাকে একটু নাড়িয়ে দিয়েছে।

আমি নম্বরটা ডায়াল করলাম। রিঙ হলো খানিকক্ষণ, কলটা রিসিভ করল অল্পবয়সী কোন একটি মেয়ে।

'হ্যালো, মুক্তাদির সাহেব আছেন? মোহাম্মদ মুক্তাদির।'

'হ্যালো, আপনি কে বলছেন?' মিষ্টি রিনরিনে গলায় বলল মেয়েটি। ফোনে শব্দ শুনতে একটু কষ্ট হচ্ছে। বাইরের ঝড়ের প্রভাব মোবাইলের ফ্রিকোয়েন্সিতেও পড়েছে মনে হয়।

'আমি ওনার বন্ধু। একটু দেয়া যাবে তাঁকে?'

'একটু ধরুন,' বলে মেয়েটি ফোন রেখে কাকে যেন ডাকতে গেল।

আমি যথাসম্ভব শান্ত থাকার চেষ্টা করলাম। কিছুক্ষণ পর কেউ ফোন ধরল।

'হ্যালো, মুক্তাদির সাহেব?'

'না, সরি। আমি ওনার মিসেস বলছি,' বয়স্কমত একজন মহিলার কণ্ঠস্বর ভেসে আসল ওপার থেকে। সম্ভবত মুক্তাদিরের মেয়ে ফোন ধরেছিল, বাপ হয়তো বাসায় নেই তাই মাকে ফোন দিয়ে দিয়েছে।

'উনি বাসায় নেই?'

ভদ্রমহিলা ওপাশ থেকে কিছুটা অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, 'ভাই, আপনি কি বিদেশে থাকেন?'

'না তো।'

'মানে আপনি কি খবরটা জানেন না?'

'কী খবর।' রীতিমত গলা কাঁপতে আরম্ভ করেছে আমার।

'মুক্তাদির মারা গেছে তিন বছর আগে, আর আপনি কীনা বলছেন...'

আমি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম তখনই মোবাইলটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে অফ হয়ে গেল। খানিকক্ষণ বোকার মত 'হ্যালো হ্যালো' করলাম। সত্যি বলতে কী আমার মাথা কেন জানি ঘুরতে আরম্ভ করে দিয়েছে। অথচ এসময় তো চেতনা হারালে চলবে না।

আমি মাথা ঠাণ্ডা রখার চেষ্টা করতে লাগলাম। এখনও পর্যন্ত ভয়ঙ্কর কোনকিছুই ঘটেনি। মোহাম্মদ মুক্তাদির নামের লোকটা সম্পূর্ণ বানোয়াট হতে পারে। লেখকদের ভয় দেখিয়ে অনেকেই একধরনের বিকৃত আনন্দ পেয়ে থাকে–লোকটাও হয়তো সেরকমের কেউ। আর ম্যানুস্ক্রিপ্ট পড়া মাত্র ফোন আসার ব্যাপারটা নেহায়েতই কাকতালীয়। উফ, ভাবতে অবাক লাগে এরকম ভয়াবহ গল্পের প্লট নিয়ে নিজেই এসব জিনিস লিখেছি, তাও আবার আজ থেকে সতেরো-আঠারো বছর আগে। যাই হোক, এখন প্রধান কর্তব্য হচ্ছে মোবাইলটা চার্জে দেয়া এবং তারপর আমার সম্পাদককে ফোন করা। কারও সঙ্গে কথা বলে মনের উদ্বেগ কাটাতে হবে।

আমি ড্রয়ার টেনে চার্জারটা বের করলাম। আমার শোবার ঘরের

দেয়ালেই লাগানো আছে সুইচ বোর্ড। হাত বাড়িয়ে সকেটে অ্যাডাপ্টার লাগানো মাত্রই প্রচণ্ড জোরে ধারে কাছে কোথাও বাজ পড়ার শব্দ হলো, সঙ্গে সঙ্গে চারপাশ জুড়ে নেমে এল নিকষ কালো অন্ধকার।

ইলেকট্রিসিটি ফেইলর।

'...যোগাযোগের সমস্ত পথ বন্ধ। টের পাই নিকষ কালো আঁধার ধেয়ে আসছে আমার দিকে, মৃতের ছায়া চারপাশে অনুভব করি। হে, ঈশ্বর, রক্ষা করো আমায়।'

হতভম্ব হয়ে অন্ধকারের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। স্পষ্ট বুঝতে পারছি যা আমি কাকতালীয় বলে মনে করছি আসলে সেরকম কিছু নয়। ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে আমাকে ঘিরে, এ তারই পূর্বাভাস।

আমার পকেটে সবসময় দিয়াশলাই থাকে, ধূমপায়ীদের এই একটা সুবিধা। আমি কাঠি জ্বেলে আগুন ধরালাম। ড্রয়ারের ভেতর এক বাক্স মোমবাতি আছে, গতকালই কেনা হয়েছে। দু'তিনটা মোম জ্বালিয়ে ঘরের অন্ধকার দূর করার চেষ্টা করলাম। অন্ধকার দূর তো হলোই না বরং আরও জমাট বেঁধে গেল। কাঁপা হাতে যথাসম্ভব দ্রুত হ্যাণ্ডব্যাগটা টেনে প্রয়োজনীয় কিছু কাপড় আর টাকা সঙ্গে নিয়ে নিলাম। কর্তব্য আমি স্থির করে ফেলেছি, এই পোড়ো বাড়িতে আর না। যদিও জানি যা ঘটছে তার সবটাই হয়তো শক্তিশালী কোন কাকতালীয় ব্যাপার। কিন্তু আমি মিথ্যামিথ্যি ভূতের গল্পের নায়কের মত অত দুঃসাহসী নই। কাজ নেই অযথা বাড়তি উত্তেজনা নেবার। মোবাইল আর চাবির গোছাটা নিয়ে নীচতলার দিকে রওনা হলাম। রওনা দেয়ার আগে একবার জানালার শার্সি দিয়ে বাইরে তাকালাম। তুমুল ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। আজ রাতে বাড়ির বাইরে বের হবার কোন পরিবেশই আর নেই।

আমি দোতলার সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামতে লাগলাম। একটানা বৃষ্টির শব্দ আর মাঝে মাঝে ঝড়ো হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দ ছাড়া কোন শব্দ কানে আসছে না। একতলায় নেমে পোর্চের কাছাকাছি আসা মাত্রই কেন জানি মনে হলো পেছনে কেউ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালাম।

কেউ কোথাও নেই।

'জুনায়েদ হায়দার, কাম ডাউন। অতি উত্তেজনার ফলে তোমার স্নায়ু দুর্বল হয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। তুমি হ্যালুসিনেট করতে শুরু করছ। এখন সাধারণ দৃশ্য বা শব্দ তোমার কাছে ভয়ঙ্কর কিছু মনে হতে পারে। অতএব, কাম ডাউন। ঠাণ্ডা মাথায় কম্পাউণ্ডের গেটটা খুলে বের হও। তারপর একটা রিকশা নিয়ে সোজা ভোঁ দৌড়। এ বাড়িমুখোও হয়ো না আর কোনদিন। আর যদি সম্ভব হয় ওই পাণ্ডুলিপিটা পুড়িয়ে ফেলো। যত সমস্যার মূলে ওই অভিশপ্ত জিনিসটাই।'

নারিকেল আর কাঁঠাল গাছটা পেরিয়ে মূল ফটকের কাছে চলে এলাম। বড়বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে সারা গা ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে। ত্রস্ত হাতে চাবি ঢুকালাম কি হোলের ভেতর। কট করে একটা শব্দ হলো। চরম আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ করলাম চাবির একটা ভাঙা অংশ আমার হাতে, বাকিটা কি- হোলের ভেতরেই রয়ে গেছে। পাগলের মত তালা ধরে ঝাঁকাঝাঁকি করলাম। পুরানো আমলের বড় তালা, মচকানোর কোন সুযোগই দিল না।

আমার মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেছে। এখন একমাত্র লক্ষ্য কী করে এই ভয়াবহ বাড়িটা ত্যাগ করা যায়। গোটা বাড়িটাকেই দুর্গের মত ঘিরে রেখেছে বড় বড় পাঁচিল। প্রায় চার মানুষ সমান হবে তার হাইট। পাঁচিলের মাথায় সারি সারি করে জঙ ধরা পেরেক গাঁথা আছে। আমার শরীরের যে ওজন তাতে ওই পাঁচিল ডিঙানো সম্ভব না। আমি প্রাণপণে লোহার গেট ধরে ঝাঁকাতে লাগলাম। এদিকে আকাশ ভেঙে পড়ছে মাথার ওপর। প্রচণ্ড ঝড়জলের শব্দ ছাপিয়ে আমার শব্দ কি পারবে পৌঁছতে কোন মানুষের কানে?

কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলাম আমার আশা নিতান্তই দুরাশা। শহরতলির এই জায়গাটা এমনিতেই লোকালয় থেকে একটু আড়ালে, এইরকম দুর্যোগময় রাতে আমার শব্দ কারও কানেই পৌঁছবে না। গেটের আশপাশে কোন ফাঁকফোকর আছে কি না দেখার জন্যে এদিক সেদিক খুঁজতে লাগলাম। কাদায় সারা শরীর ভরে গেল, কাঁটা ঝোপে লেগে কেটে গেল সর্বাঙ্গ। কিন্তু, এ বাড়ি থেকে বের হবার কোন উপায় খুঁজে পেলাম না। কাল সকালের আগে কি বের হওয়া যাবে না এখান

থেকে?

ক্লান্তি ও অবসাদে ভরে গেল আমার মন। এদিকে বৃষ্টিতে ভিজে জবজব করছে গায়ের পোশাকগুলো। পেছনে অন্ধকারের মধ্যে থমথমে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নির্জন বাড়িটা। প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ায় চারদিক ধোঁয়াটে কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি এই দুর্যোগের রাতে ওই একটা স্থানেই থাকতে হবে আমার, এর অন্যথা হবার কোন উপায়ই নেই। ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে গেলাম শরীরটাকে ওই বাড়িটার ভেতর।

এখনও বাতি ফিরে আসেনি। আর আসবে কি না কে জানে? পোর্চের কাছে মোমবাতি আর দিয়াশলাই ফেলে গিয়েছিলাম। মোমবাতি জ্বেলে সিঁড়ি বেয়ে ক্লান্তভাবে দোতলায় উঠতে লাগলাম। আবার সেই পুরনো ভয়টা ফিরে ফিরে আসছে। লম্বা করিডরটা পার হবার সময় একবারও পেছন ফিরে তাকালাম না। শোবার ঘরে ঢুকে দরজার খিল এঁটে দিলাম। ড্রয়ার খুলে মোমবাতির বাক্সটা বের করে গুনে দেখলাম মোটে তিনটা স্টিক আছে। আজকের রাতটা কি কোনমতে চলে যাবে?

আমি এখন মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেছি যে আজ আর ইলেকট্রিসিটি ফেরত আসবে না।

ভেজা পোশাক পাল্টে বিছানার ওপর চাদর টেনে বসলাম, হাতে টেবিলের ওপর থেকে নেয়া সেই ম্যানুস্ক্রিপ্ট। এখনও মনে করতে পারছি না সত্যিই এটা আমি লিখেছি কি না? মনটাকে শান্ত রাখার চেষ্টা করতে লাগলাম। সব ঘটনা যদি বিবেচনা করি তা হলে বলতে হবে এখনও পর্যন্ত আক্ষরিক অর্থে কোন অতিপ্রাকৃত কিছু ঘটেনি। টেলিফোন আর চাবি ভাঙার ব্যাপারটা হয়তো আসলেই কাকতালীয় ঘটনা, আমার স্নায়বিক উত্তেজনার ফল। তবে মোহাম্মদ মুক্তাদির নামের লোকটার শয়তানিটা মনে পড়লে ভীষণ রাগ লাগছে। এমন জঘন্য রসিকতা কেউ করতে পারে? একবার এই ঝামেলা থেকে উদ্ধার পাই তারপর শালাকে একহাত দেখে নেয়া যাবে, মনে মনে বললাম আমি। রাগ ওঠাতে মন থেকে ভীতিকর ভাবটা একটু কেটে গেল। ম্যানুস্ক্রিপ্টটার দিকে নজর দিলাম।

'মন থেকে ভয় কাটানো সহজ নয়, তবু আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি।

রহস্যময় ফোনকলটার কথা ভুলে যেতে চাই। অন্ধকারটা অসহনীয় লাগছে। হাত পা গুঁজে বসে থাকলেও কেন জানি মনে হচ্ছে অশুভ আত্মাটা আমার খুব কাছেই আনাগোনা করছে। বাতাসে ওর উপস্থিতির কটু গন্ধটা নাকে এসে লাগছে। ও কি এসে গেল আবার?'

পড়া বন্ধ করে নিজের অজান্তেই নাক দিয়ে বাতাসটা একটু শুঁকে দেখলাম। কীরকম একটা বাজে গন্ধ টের পাচ্ছি।

অনেকটা শব পচা গন্ধ।

হয়তো কাছে ধারে কোথাও ট্যানারি জাতীয় কিছু আছে, বৃষ্টি হওয়ায় তার থেকে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। আর ম্যানুস্ক্রিপ্টের লেখা পড়েই হয়তো আমার অবচেতন মন গন্ধটার অস্তিত্ব অনুভব করতে আরম্ভ করেছে। পৃথিবীতে ভৌতিক ব্যাপার বলে কিছু নেই। যত ভয়ঙ্করই হোক শেষটায় দেখা যায় সব কিছুর পেছনেই কেমন সহজ সব লজিক কাজ করছে। এই লজিকই হচ্ছে সব। লজিকবিহীন পৃথিবী অসম্ভব। অসম্ভব, অসম্ভব...

'নিরাপদে আছি কি আমি? বাইরের পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী এই নির্জন পোড়ো বাড়িতে বন্দি হয়ে থাকাকে কি নিরাপদে থাকা বলে? শবদেহের কটু গন্ধটা বাতাসকে ভারি করে ফেলছে। চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাই এক সাগর রক্তে ভেসে যাচ্ছে গোটা ঘর। হায় ঈশ্বর, এর থেকে নিষ্কৃতি কি আমি পাব না?'

কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম–ম্যানুস্ক্রিপ্টের লেখার সঙ্গে দুর্বল হলেও অন্তত একটা অমিল পাওয়া গেল। বাতাস ভারী করে ফেলার মত কোন গন্ধ অবশ্যই নাকে আসছে না। তা ছাড়া এখন বোঝা যাচ্ছে শবদেহের গন্ধ বলে যেটা মনে হচ্ছে সেটা নিশ্চিত ট্যানারি থেকে আসা গন্ধ। আমার দুর্বল মনই এসব ভীতিকর কল্পনা সৃষ্টির জন্যে দায়ী।

কতক্ষণ বিছানার ওপর একঠায় বসে ছিলাম মনে করতে পারব না। ম্যানুস্ক্রিপ্টটা পড়তে আর ইচ্ছা করছে না। ওটা আপাতত পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে টেবিলের ওপর রেখে দেয়া হয়েছে। বৃষ্টি প্রায় থেমে গেছে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম বৃষ্টি কমলেও আকাশে ঘনঘন বিদ্যুৎ চমক থামেনি। মুহুর্মুহু চমকে উঠে যেন জানান দিচ্ছে দুর্যোগ

এখনও কাটেনি। ঘড়ি দেখলাম। রাত তিনটা পাঁচ। ভোর হতে আরও অনেক বাকি।

এমন সময় ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙার মত শব্দ হলো মাথার ওপরে সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়ে গেল আমার প্রতিটা ইন্দ্রিয়। কড়িকাঠের দি তাকানো মাত্রই বুঝতে পারলাম শব্দটা আসছে ছাদ থেকে। মনোযোগ দিয়ে শব্দটা শুনলাম। তফাৎটা তৎক্ষণাৎ ধরতে পারলাম। কাঁচ ভাঙার নয়, বরং বলা যায় কোন অল্পবয়সী মেয়ে নূপুর পায়ে দিয়ে এলোমেলো ভঙ্গিতে ছাদময় ঘুরে বেড়ালে যেরকম শব্দ হতে পারে, অনেকটা সেরকম। আমার কাজের ছেলেটার কথা মনে পড়ল।'

'এই বাড়িতে জিন আছে, খুব খারাপ জিন। রাইতের বেলা থাকলে জানে মাইরা ফেলব।'

ছাদের ওপর হঠাৎ ভারী একটা কিছু পড়ার আওয়াজ হলো।

ধুপ! তারপর সব নিশ্চুপ, ব্যাঙের একটানা ডাক কানে আসছে কেবল।

আমি স্থির দৃষ্টিতে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে আছি। বুকের ভেতর ধুকপুকানি আরম্ভ হয়ে গেছে। ছাদে এই মুহূর্তে কী ঘটছে বলতে পারব না, জানার চেষ্টাও করতে পারব না। অনেকক্ষণ উপরে তাকিয়ে রইলাম। একসময় ক্লান্ত হয়ে এল দৃষ্টি, চোখের কোণ জ্বালা করতে লাগল। তবে আমার সদাসতর্ক ইন্দ্রিয়গুলো ক্ষণিকের জন্যেও শিথিল হলো না।

খাট থেকে নেমে বাথরুমের দিকে এগোলাম। ভাগ্যিস এই ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম আছে, নইলে কী দুর্দশা হত কে জানে? বেসিনে গিয়ে ট্যাপ খুলে চোখেমুখে পানির ঝাপটা দিলাম। সঙ্গে আলো নিয়ে আসিনি তাই আয়নায় নিজের বিধ্বস্ত মুখখানা দেখতে পারলাম না। নিশ্চয়ই এক রাতের মধ্যেই আমার মাথার চুলের অর্ধেকটা পেকে গেছে।

বাথরুম থেকে বেরিয়েই বুঝতে পারলাম বাতাসে কটু গন্ধের মাত্রাটা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছে। আশ্চর্য, ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ, তবু গন্ধ আসছে কী করে? মাথার ওপরের ওই একটা ভেন্টিলেটর থেকে কি এত দুর্গন্ধ আসা সম্ভব? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর একমাত্র জানে

কেবল ওই অভিশপ্ত ম্যানুস্ক্রিপ্টটা। কাগজগুলোতে কী লেখা তা পড়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই, জানি ভয়াবহ কিছু একটা লেখা আছে সেখানে। কাকতালীয়ভাবে হয়তো মিলেও যাবে আমার বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে। ওই জিনিস পড়ারও কোন দরকার নেই। কাগজগুলো নিয়ে দলা পাকিয়ে ফেলে দিতে যাব আর ঠিক ওই সময়ে আরেকটা শব্দ কানে এল। খুব অস্পষ্ট ও চাপা, কিন্তু পরিচিত।

নকিয়া মোবাইল ফোনের সেই সুপরিচিত অফিশিয়াল টিউন, আমার মোবাইলের রিঙটোন! এবং শব্দটা আসছে নীচতলা থেকে।

পকেটে হাত দেয়া মাত্র বুঝতে পারলাম মোবাইলটিকে আমি নীচতলায় সম্ভবত পোর্চের কাছে ফেলে এসেছি। কিন্তু ফোনটা বাজছে কেন? সামান্য চার্জ কি সে ফিরে পেয়েছে?

একটা অস্বস্তিকর দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। দরজা খুলে নীচে গিয়ে ফোনটা আনব, নাকি যেভাবে খিল এঁটে বসে আছি, ঠিক সেভাবেই থাকব? পরক্ষণেই আবার মনে হলো এমনও তো হতে পারে যে আমার সম্পাদক ফোনে আমাকে ধরার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এত রাতে উনি ফোন করবেন কেন? সেই অজ্ঞাতনামা ফোনকলটি নয়তো?

আমি প্রমাদ গুণলাম। কেন জানি মনে হচ্ছে ফোনটা নীচ থেকে উদ্ধার করে আনা দরকার। খাট থেকে নেমে দরজার খিল খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। বৃষ্টি থেমে গিয়ে চাঁদ উঠেছে আকাশে। জোছনার আবছা আলোয় ভরে গেছে গোটা বারান্দা।

আমার দৃষ্টি অবশ্য সিঁড়ির দিকে, সটান নেমে গেছে নীচতলায়। আমি সিঁড়িগুলোর কাছাকছি আসা মাত্রই ফোন বাজা বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশ এক অস্বাভাবিক নৈঃশব্দ্যে ভরে গেল। সিঁড়ির দিকে পা বাড়াব ভাবছি ঠিক ওই সময় চোখে পড়ল ব্যাপারটা।

চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম সারা সিঁড়ি জুড়ে অজস্র পায়ের ছাপ। তাজা রক্ত মাড়িয়ে এসেছে কেউ, তারপর গোটা বাড়ি পা টেনে টেনে হেঁটেছে। আতঙ্কে সারা শরীর অবশ হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই চেতনা হারানো যাবে না। আমি ক্রমশ পিছিয়ে এসে আমার শোবার ঘরের কাছে চলে এলাম। বিশাল টানা বারান্দার মোটা মোটা থামগুলোর

আড়ালে নিশ্চয়ই কেউ লুকিয়ে আছে। সে কি মানুষ? নাকি অন্য জগতের কেউ?

শোবার ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই দরজার খিল এঁটে দিলাম। জানালাগুলো আগেই লাগানো ছিল, তারপরও সব ঠিকমত আছে কীনা দেখে নিলাম। বাথরুমের দরজাটা ভালমত লাগিয়ে বিছানায় উঠে বসলাম। দরজার দিকে তাকিয়ে থাকলাম অনেকক্ষণ, বুঝতে পারছি সারা শরীর রীতিমত ঘামতে আরম্ভ করেছে। কান খাড়া করে বারান্দায় কেউ হাঁটাহাঁটি করছে কীনা শোনার চেষ্টা করলাম। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আবার শুরু হয়েছে। জানালার শার্সিতে পানি পড়ার মৃদু শব্দ কানে আসছে।

কী ঘটছে বলতে পারব না। কী শুনছি বলতে পারব না। টেবিলের ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে ম্যানুস্ক্রিপ্টটা নিলাম। আমি জানি এখানে আছে সব প্রশ্নের উত্তর।

'সময় এখন স্থির। আমি চিরতরে বন্দি হয়ে গেছি। এই অন্ধকূপ থেকে আর কখনও বের হতে পারব না। একে একে স্থবির হয়ে আসছে আমার সব ইন্দ্রিয়। আতঙ্কের চূড়ায় পৌঁছলে মানুষ আর বেঁচে থাকতে পারে না। অতএব, আমিও আর বেঁচে থাকতে পারব না। কালো দরজাটা খুলে বাইরে যাবার চেষ্টা করেই আমি রচনা করেছি আমার জীবন্ত কবর। এখন ঘরময় ছড়িয়ে আছে ওটার পায়ের ছাপ, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমার শতাব্দী প্রাচীন পালঙ্কটার নীচেই স্থান করে নিয়েছে সে...'

হাত থেকে খসে পড়ে গেল ম্যানুস্ক্রিপ্টটা।

'এখন ঘরময় ছড়িয়ে আছে ওটার ছাপ, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমার শতাব্দী প্রাচীন পালঙ্কটার নীচেই স্থান করে নিয়েছে সে...'

মোমবাতির আলোয় ঘরময় যা দেখলাম তাতে চোখ দুটোতে রাজ্যের অন্ধকার নেমে এল। সারা মেঝে জুড়ে কেবলই পায়ের ছাপ আর পায়ের ছাপ। রেড অক্সাইডের লাল মেঝের কালো ছোপ ছোপ রক্তের দাগ ক্রমশ ঢুকে গেছে আমার খাটের নীচে। চরম আতঙ্কে অবশ হয়ে গেল সারা শরীর। এর কারণ অতি স্পষ্ট।

'তার দেহের প্রতিটা স্পন্দন আমার রক্তে ধ্বনিত হচ্ছে...আমি জেনে গেছি...আর একটু পরই খাটের তলা থেকে বের হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসবে একটা রক্তমাখা হাত...'

কটু গন্ধে ভারি হয়ে গেছে ঘরের বাতাস। এমন সময় খাটের তলা থেকে গভীর শ্বাস ফেলার শব্দ অনুভব করতে পারলাম, কেউ যেন খুব হাঁপিয়ে গেছে–জোরে জোরে শ্বাস নিতে চেষ্টা করছে। খাটের তলায় উঁকি না দিলেও স্পষ্ট বুঝতে পারছি কী ঘটতে চলেছে।

আমার জীবনে এক আতঙ্কের রাত...

কয়েকদিন পর।

সরকারি ডাকবাংলো, 'মায়াবী'র বারান্দায় জণ্ডিস রঙা একটা চেয়ারে বসে জুনিয়র অফিসার রিয়াজুদ্দিন অপেক্ষা করছে, বগলে মোটাসোটা আকারের কাগজের ফাইল। অনেকক্ষণ জবুথুবু বসে থাকায় তার ঘুম ঘুম পাচ্ছে। সন্ধ্যা নামতে বেশি বাকি নেই, যদিও আকাশ দেখে সকাল থেকেই সন্ধ্যা মনে হচ্ছে, বছরের এই সময়টায় এমনিতে এত বৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। এত মেঘ এল কোত্থেকে?

বারান্দায় বসে ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীরটা জুড়িয়ে যাচ্ছিল, ঠিক এমন সময় কেবিনের দরজা খুলে বাইরে এলেন গোয়েন্দা বিভাগের সিনিয়র অফিসার আ.ন.হ. জাকারিয়া। ভদ্রলোক এককালে আকর্ষণীয় স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু বর্তমানে স্থূলতার চাপে যাকে বলে পর্যুদস্ত। তিনি রিয়াজুদ্দিনকে দেখে হাসিমুখে বললেন, 'ফাইলটা কি এনেছ, রিয়াজুদ্দিন?'

'জ্বী, সার।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ, ভাই। অনেক উপকার করলে। কালই ঢাকায় ফিরব তো তাই একটু গোছগাছে ব্যস্ত ছিলাম।'

ফাইলটা নিজের হাতে নিয়ে বললেন জাকারিয়া সাহেব। তারপর খানিকক্ষণ তাতে চোখ বুলালেন।

'গত কয়েকদিন ধরে তো থরো ইনভেস্টিগেশন করলাম। আমার মনে হয় ওই লেখক সাহেবের মৃত্যুটা মার্ডার-ফার্ডার কিছু না। সাধারণ

হার্ট ফেলের কেস। যদিও বছর চল্লিশের কারও এভাবে মরাটা ঠিক মানায় না। অবশ্য লোকটার ফিগারও দেখতে হবে। এত মোটা শরীরে ব্লাড প্রেসার থাকাটা অদ্ভুত কিছু তো না, তাই না?'

'জ্বী, সার। আমারও তাই মনে হয়। লোকটা হয়তো কোন কারণে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল আর তাতেই হয়তো হার্টবিট মিস করে বসে।'

আ.ন.হ. জাকারিয়া চিন্তিত স্বরে বললেন, 'তা তো বটেই হে। বৃষ্টির মধ্যে সারা বাড়ির কম্পাউণ্ড জুড়ে দৌড়াদৌড়ি করা, উত্তেজনার ঠেলায় গেটের চাবি ভেঙে অর্ধেকটা তালার ভেতরেই রেখে আসা, তারপর সারা বাড়ির মেঝে জুড়ে এলোমেলো হাঁটাহাঁটি করা–সবটাই তো আতঙ্কগ্রস্তের কাজ কারবার। এনি ওয়ে, আর কারও পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে কি ওখানে?'

'না, সার। সব ছাপ ওই এক লোকেরই। শোবার ঘর থেকে শুরু করে সবখানে ওই একই ৯ নম্বরী সাইজের স্যাণ্ডেলের ছাপ, লোকটা মৃত অবস্থাতেও পায়ে চটি পরা অবস্থায় ছিল। আমাদের এদিকে তো, সার, লাল মাটি। ওই রেড অক্সাইডের লাল মেঝেতে টাটকা কাদা পড়ে থাকলে অনেকসময় রক্তের ছোপের মত দেখায়, আবছা আলোতে হঠাৎ করে দেখলে ভিরমি খাওয়ার দশা হয়। লোকটা এসব দেখেই ভয় পেয়ে গেল নাকি কে জানে?'

আ.ন.হ জাকারিয়া শব্দ করে হাসলেন।

'লেখক মানুষ তো, হয়তো ওরকমই কিছু একটা ভেবে নিয়ে ভয়টয় পেয়ে বিশ্রীভাবে হার্টফেল করে মারা গেছে। তবে এটা ঠিক, কাকতালীয়ভাবে তালাফালা আটকে না গেলে আর ওই সারা রাতের ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়ার ব্যাপারটা না ঘটলে হয়তো লোকটা বেঁচে যেতেও পারত।'

'জ্বী, সার। তারপর ওই ব্যাপারটাই ধরুন না, যদি কাকতালীয়ভাবে বৃষ্টির মধ্যে দুটো আস্ত ধেড়ে বেড়াল রক্তাক্ত অবস্থায় ছাদের পানির ট্যাঙ্কির ভেতর না পড়ত তা হলে কি আর অত বিদঘুটে গন্ধযুক্ত পানি বের হত ট্যাপ থেকে? কাকতালীয় ঘটনা একসাথে এতবার ঘটলে তো ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক, তাই না, সার?'

'আর ওই ব্যাপারটা বাদ দিচ্ছ কেন? এমন বাজে জিনিস কক্ষনো হতে দেখিনি। একই টেলিফোন নাম্বারে আলাদা আলাদা দুজন কনযিউমার। তাও দুজনের নামই এক। মুক্তাদির না কী যেন নামটা।'

'মোহাম্মদ মুক্তাদির, সার। দুই জনের মধ্যে একজন অনেক আগে মারা গেছেন। আমরা ভিকটিমের কল লিস্ট ঘেঁটে দেখেছি উনি লাস্ট কলটা যাকে করেছেন তিনি বাই মিস্টেক সেই মৃত মুক্তাদির। ওনার পরিবার অবশ্য রিপোর্ট দিয়েছে যে ওই রাতে তারা ভিকটিমের ফোন পেয়েছিলেন ঠিকই। মুক্তাদির মৃত এটা শুনে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই টেনশনে পড়ে গিয়েছিলেন।'

'সার্টেনলি। আর ওই আসল মুক্তাদির যার সাথে জুনায়েদ সাহেবের খাতির ছিল, তার খবর কী?'

'শোকে দুঃখে পাগল হয়ে যাবার অবস্থা ব্যাটার।'

আ.ন.হ জাকারিয়া ছেলেটির কাঁধ চাপড়ে বললেন, 'তুমি এতদিন অনেক খেটেছ, রিয়াজুদ্দিন। তোমার প্রমোশনের ব্যাপারটা আমি নিজে দেখব। এখন বাড়ি যেয়ে একটু ঘুম দাওগে।'

তিনি হাতের ফাইলটা বন্ধ করার সময় স্ট্যাপল করা একতাড়া ফুলস্কেপ কাগজ মাটিতে পড়ে গেল।

'এটা আবার কী হে?'

রিয়াজুদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'ও, সার, আপনাকে বলা হয়নি। এটা ভিকটিমের ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। বোধহয় তার লেখা শেষ গল্পটল্পের খসড়া।'

'তুমি পড়ে দেখেছ?'

'সময় পাইনি। তবে এমনি নেড়েচেড়ে দেখেছি। ক্লু জাতীয় কিছু নেই। স্রেফ গপ্পো।'

আ.ন.হ জাকারিয়া উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'সমস্যা নাই। জুনায়েদ হায়দার পাশার গল্প আমার ভালই লাগে। দেখি মরার আগে লোকটা কী লিখে গেল।'

'আমি তা হলে আসি, সার।'

'ওয়েল, গুড নাইট দেন।'

রিয়াজুদ্দিন বিদায় নিল।

তিনি গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে শোবার ঘরের দিকে চললেন। আকাশে মেঘের গুড়গুড়ানি বেড়েছে, বড়সড় ঝড়জল হতে পারে রাতে। সত্যিই এমন একটা বর্ষণমুখর রাতে জম্পেশ ভূতের গপ্পো নিয়ে বিছানায় যেতে কার না ভাল লাগে?

রাত সোয়া তিনটার দিকে সরকারি গোয়েন্দা আ.ন.হ্ জাকারিয়া বাথরুম করতে ওঠার সময় টের পেলেন যে অত্যন্ত কাকতালীয়ভাবে তাঁর ঘরের দরজার খিলটা বাইরে থেকে আটকে গেছে। ব্যাপারটা আরও কাকতালীয় হলো যখন একটা প্রচণ্ড বজ্রপাতের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গোটা এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তাঁর কেন জানি খুব ভয় ভয় করতে লাগল।

আব্দুল্লাহ্ ওমর সাইফ

জুয়াড়ী

পার্কের পশ্চিমদিকটা, যেখানে বিলিতি ইউক্যালিপ্টাস গাছের ছায়া গাঢ়, সেখানেই একটা সিমেন্টের বেঞ্চিতে জবুথুবু ভঙ্গিতে বসে আছে সাবের, চোখে কালো রোদ চশমা। সন্ধ্যা নামতে বেশি বাকি নেই। শীতকাল, তাই কিছুক্ষণের মধ্যে ঝুপ করে অন্ধকার নামা খুব স্বাভাবিক। ঘরে ফেরা পাখিদের ডাকাডাকিতে চারদিক মুখর হয়ে আছে, ইতিমধ্যেই মাথার ওপর দু একটা বড়সড় বাদুড় ওড়াউড়ি করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। ব্যাপারটা অস্বস্তিকর, কিন্তু লোকটা এরকম সময়েই আসে।

হাতঘড়ি দেখল সে। সোয়া পাঁচটা।

সাবের অপেক্ষা করছে অনেকক্ষণ। আজ তার শরীর একটু খারাপ, মাইগ্রেনের সমস্যাটা উঁকিঝুঁকি মারছে–ব্যথার চোটে রাতের ঘুমটা নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে। কথাটা মনে হতেই হঠাৎ হাসি পেল তার। আর কেনই বা পাবে না? আজ রাতে যেখানে বেঁচে থাকারই ঠিক নেই, সেখানে এ জাতীয় কল্পনা হাস্যকরই বটে। সত্যিই কি সে এমন পরিণতি চায়? এতবড় ঝুঁকি কি সে আসলেই নিতে পারবে?

এ মুহূর্তে স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে ঠিক এমনটিই সে চেয়েছিল, এবং এখনও সেটাই চাইছে। তারমত জুয়াড়ীর কাছে এটাই তো সত্যিকার চ্যালেঞ্জ, প্রকৃত উত্তেজনা। জীবনে ঝুঁকিই যদি না থাকে তা হলে তার আর দাম কোথায়? জুয়া খেলা হলো মজ্জাগত, একে টাকার অঙ্কে বিচার করা যায় না। দিনের পর দিন গোঁয়ার টাইপের কিছু মানুষের সাথে তাস-পাশা খেলে টু পাইস কামানোর মধ্যে আনন্দ নেই। যেখানে বড় কিছু হারানোর ভয় এবং একই সাথে বিরাট কিছু লাভের সম্ভাবনা না থাকে, সেখানে পাকা জুয়াড়ীর মন ভরে না কিছুতেই। বিপদের ঝুঁকি নেয়ার মধ্যে অদ্ভুত এক

আনন্দ আছে, অনুভূতিটা ঠিক বলার মত নয়। চোখ বন্ধ করে বুক ভরে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করল সাবের।

ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল ঠিক একমাস আগে, এ রকমই এক শীতের সন্ধ্যায়। ঠাণ্ডাটা তখনও তেমন জাঁকিয়ে বসেনি। সারারাত ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের ঘুপচি গলির আসরে তাস পিটিয়ে তারপর সারাটা দিন ঘুমিয়ে কাটানোর ফলে বিকেলের দিকে শরীরটা রীতিমত ম্যাজম্যাজ করছিল। সন্ধ্যায় তাই পার্কে হাঁটাহাঁটি করতে চলে এল সাবের। হাঁটাহাঁটি শেষে মাঠাওয়ালার কাছ থেকে এক গ্লাস মাঠা কিনে ঢকঢক করে খেয়ে পার্কের পশ্চিম দিকটায় গাছের নীচে বেঞ্চিটায় গিয়ে বসল সে। জায়গাটা অপেক্ষাকৃত নির্জন, গাছপালা ঘন হওয়ায় লোকজনের উৎপাত একেবারেই নেই। বসে বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে, ঠিক ওই মুহূর্তে মনে হলো বেঞ্চির খালি জায়গাটায় দীর্ঘকায় এক লোক এসে বসল। ঘাড় ফিরিয়ে লোকটাকে এক নজর দেখে নিল সাবের।

অন্ধকার একটু গাঢ় হয়েছে, লোকটার মুখ তাই পরিষ্কার দেখা গেল না। একটা ভারি খদ্দরের চাদর দিয়ে মাথা ঢাকা, কালো প্যান্ট আর পায়ে চটির বদলে একজোড়া রাজকীয় নাগরা। এমন অদ্ভুত পোশাক বহুকাল কেউ দেখেনি এটা নিশ্চিত। লোকটা আসার পর থেকেই মাথা নিচু করে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

'কিছু বলবেন?' গলা খানিকটা খাঁকরে নিয়ে জানতে চাইল সাবের। লোকটার চাহনি রীতিমত অস্বস্তিকর।

'আপনি বিখ্যাত জুয়াড়ী সাবের সাহেব না, ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের ক্লাব হাউসে নিয়মিত তাস খেলেন?'

সাবের কী উত্তর দেবে বুঝতে পারল না। 'জুয়াড়ী' উপাধিটা সম্মানের না অসম্মানের ঠিক বোঝা গেল না, যদিও নিজেকে পাকা জুয়াড়ী মনে করতে তার ভালই লাগে। সে কেবল উপর নীচে মাথা নাড়ল। লোকটা হ্যাণ্ডশেকের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আপনি তো বিখ্যাত লোক ভাই। আপনার সাথে তাসের টেবিলে বসে হাজার হাজার টাকা খুইয়েছে এমন লোকের সংখ্যা বহু অথচ তাদের কেউই বলবে না যে আপনি অখেলোয়াড়সুলভ কিছু করেছেন। আপনি সত্যিই

জিনিয়াস।'

উত্তরে মৃদু হাসল সাবের। তাসের টেবিলে অনেকে তাকে অপ্রতিরোধ্য মনে করে, কথাটা মিথ্যে নয়। সে হ্যাণ্ডশেক করল। লোকটার হাত একটু গরম, জ্বরটর করেছে নাকি?

'আপনার সাথে দেখা করার শখ অনেকদিনের। আজ শখ মিটল, ভাল লাগল। তবে আমার একটা আব্দার আছে। সেটা রাখলে খুব খুশি হতাম।'

'কী ব্যাপার বলুন তো?'

'আমি আপনার সাথে একটা মজার খেলা খেলতে চাই। পৃথিবীর সবচাইতে সহজ জুয়া। অথচ এতে বাজির পরিমাণ অনেক বেশি, অন্তত আপনাদের ওই তাসের বাজির চেয়ে বেশি তো বটেই।'

'আমি আসলে ঠিক বাইরের কারও সাথে...'

'আহা শুনুন না। প্রস্তাব পছন্দ হলে খেলবেন, না হলে চলে যাবেন। আপনাকে তো আর বেঁধে রাখছি না, হেঁ হেঁ।'

'ঠিক আছে বলুন।'

'খেলাটা আসলে অতি সাধারণ কয়েন টস। পার্থক্য কেবল এই যে, আমার ক্ষেত্রে বাজি ধরা হবে নগদ টাকা আর আপনার ক্ষেত্রে ধরা হবে আপনার বিভিন্ন পছন্দের জিনিস। যদি জেতেন তা হলে আপনি টাকা পাবেন, আর হারলে বুঝতেই পারছেন, আমাকে দিতে হবে আপনার সেই পছন্দের জিনিস।'

সাবের বিস্মিত হয়ে বলল, 'আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারলাম না। এটা আবার কোন্ ধরনের খেলা?'

'একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টা পরিষ্কার হবে। মনে করুন আপনি বাজি হিসেবে ধরলেন আপনার পোষা কালো বেড়ালটা। যদি জিততে পারেন তা হলে তার বিনিময়ে আপনি পাবেন...দাঁড়ান বলছি,' লোকটা পকেট থেকে তসবি জাতীয় একটা মালা বের করে কী সব গুনে বলল, 'হুঁ...এক্ষেত্রে আপনি পাবেন সাড়ে সাত হাজার টাকা। আসলে প্রাণীটা তো আপনার তত পছন্দের না, হলে আরও বেশি পেতেন। আবার ধরুন যদি আপনার হাতের কোনও একটা আঙুল বাজি রাখেন তা হলে পাবেন

কুড়ি হাজার টাকা। এভাবে চলতে থাকলে দুই হাতের কব্জি প্রতি পঞ্চাশ, কানের জন্যে চল্লিশ, আর চোখের জন্যে এক লাখ। আরও জানতে চান?'

সাবেরের ইতিমধ্যে ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে, সে তবু শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আমার মনে হয় আপনি ভুল জায়গায় সময় নষ্ট করছেন। আমি নিজে জুয়া খেলতে পারি কিন্তু তাই বলে এ জাতীয় জুয়া আমার পছন্দ না। আপনি অন্যত্র দেখুন।'

'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?'

'অ্যাজ এ ম্যাটার অভ ফ্যাক্ট-নো।'

লোকটা গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি মিথ্যা বলি না সাবের সাহেব। আপনার বিশ্বাস না হলে একবার যাচাই করে দেখতে পারেন আমি বাজির শর্ত রাখি, না বরখেলাপ করি।'

সাবের বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়াল। লোকটাকে উপদ্রব মনে হচ্ছে। অন্য সময় হলে একে এক হাত দেখিয়ে দিতাম। আজ শরীরটা ভাল নেই তার ওপর আবার তার 'পঞ্চম বাহিনী'র সদস্যরা এই মুহূর্তে শহরে নেই। নিজের দলের লোকজন কাছেধারে না থাকলে ঝামেলায় জড়ানো ঠিক হবে না।

চলে আসছে, এমন সময় পেছন থেকে লোকটা বলল, 'সাবের সাহেব, আপনি না রোমাঞ্চ চান? এই খেলার চেয়ে বড় রোমাঞ্চ আর কোথায় পাবেন, বলুন তো?'

থমকে দাঁড়াল সে। পেছন ফিরে দেখল লোকটা বেঞ্চির ওপরে একটা রুমাল পেতে পা তুলে জোড়াসনের ভঙ্গিতে বসে রয়েছে।

'আপনি অন্তত ওই হতচ্ছাড়া বেড়ালটাকে বাজি রেখে একবার খেলেই দেখুন না। এই যে বাজির টাকা,' লোকটা চাদরের তলা থেকে এক গোছা টাকা বের করে রুমালের ওপর রাখল। অন্ধকার হলেও পার্কের দু একটা বাতি জ্বলে উঠেছে। তার আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একতাড়া পাঁচশো টাকার নোট। পুরনো এবং ব্যবহৃত। লোকটার কথায় কী আছে ধরতে পারল না সাবের, তবে সে টের পেল জুয়া খেলার পুরনো নেশাটা খোঁচা দিতে আরম্ভ করছে। দেখবে নাকি সে লোকটা

সত্যি বলে কিনা। যদি জেতা যায় তাহলে সাড়ে সাত হাজার টাকা নিয়ে বাড়ি ফেরা যাবে, কম কীসের? পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেল সে।

'যে পয়সাটা দিয়ে খেলা হবে সেটা আমি নিজে ঠিক করব। চলবে?'

'তথাস্তু।'

সাবের পকেট চাপড়ে এক টাকার একটা কয়েন বের করল। 'হেড আমার আর টেল আপনার, ঠিক আছে?'

লোকটা উপর নীচে হ্যাঁসূচক মাথা নাড়ল।

সাবের বেঞ্চির ওপর ধীরে-সুস্থে বসল। উত্তেজনা যে হচ্ছে না তা নয়। সামান্য একটা খেলা এত ইন্টারেস্টিং হতে পারে ভাবা যায় না। সে পয়সাটা শূন্যে ছুঁড়ল। বাতাসে অল্প পাক খেয়ে সেটা রুমালের ওপর গিয়ে পড়ল।

'অভিনন্দন, সাবের সাহেব। এই মাত্র আপনি আপনার পোষা বেড়ালটাকে বাজি রেখে সাড়ে সাত হাজার টাকা জিতলেন। এই নিন পাওনা,' লোকটি গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করে গোছা ধরা টাকাটা সামনে এগিয়ে দিল।

টাকা হাতে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল সাবের। এত সহজে এতগুলো টাকা পকেটস্থ করা যাবে বিশ্বাস হয় কী করে?

লোকটা রুমাল উঠিয়ে ভাঁজ করতে করতে বলল, 'আমি রোজ একবার খেলাটা খেলি, তার বেশি নয়। আপনি চাইলে আগামীকাল আসতে পারেন, আবার না-ও পারেন। তবে আমি আসব।'

'আপনি সত্যি আসবেন?'

লোকটা 'হুঁ' বলে রুমাল পকেটে রেখে উঠে দাঁড়াল।

'আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'নাম ছাড়া আর যা খুশি জিজ্ঞেস করতে পারেন,' বলল লোকটা।

বাজি ধরার বেলায় আপনি আমার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন, কেন? জীবজন্তুদের মধ্যে বেড়াল ছাড়া আমার কি প্রিয় অন্য কেউ নেই?'

'না নেই। থাকলে আমি তালিকায় নাম পেতাম।'

'আপনি কে বলুন তো?'

লোকটা শব্দ করে হেসে বলল, 'আমি কেউ না।'

'মানে?' বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইল সাবের। একটা জলজ্যান্ত মানুষ স্রেফ 'কেউ না' হয় কী করে?

লোকটা হাসতে হাসতে একটা বড় দেবদারু গাছের আড়ালে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। হতবুদ্ধি সাবের কিছুক্ষণ পর নিজেও বাড়ির পথ ধরল। জীবনে এতটা চমক সে কখনও পায়নি। কয়েন টসের এই জুয়া তাকে রীতিমত অবাক করেছে।

অবশ্য এ ঘটনার ইতি সেদিন হয়নি।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা পার্কের সেই জায়গায় সাবেরকে দেখা গেল। গতরাতে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যে এই রোমাঞ্চকর খেলা তাকে চালিয়ে যেতেই হবে। সত্যিকার টান টান উত্তেজনার সন্ধান এতদিনে সে পেয়েছে, এ সুযোগ হেলায় হারালে চলবে না? এত বোকা তো সে নয়।

'আজকে কোন্‌টা বাজি ধরবেন? এসেই জানতে চাইল লোকটা।'

'আমার বাম হাতের কড়ে আঙুল। এটা–' হাত বাড়িয়ে দেখাল সাবের। মনে তার সন্দেহ আছে। বাজি হারলে লোকটা সত্যি সত্যিই বাম হাতের আঙুল কেটে নেবে–ঠিক বিশ্বাস হয় না।

কোন কথা না বলে লোকটা বেঞ্চির ওপর আবার রুমাল বিছিয়ে বসল, গায়ের চাদরের নীচ থেকে বের করে পাশে রাখল অনেকগুলো পাঁচশ'র নোট–কুড়ি হাজার টাকা।

পার্কের পরিবেশ অতি সাধারণ। লোকজন বাড়িমুখো, নীড়ে ফেরা পাখির কিচিরমিচির বেড়েছে, বাতিগুলো একে একে জ্বলতে শুরু করেছে। বেশ কয়েকবার রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল সাবের। উত্তেজনা আজ একটু বেশি তার। সে পকেট চাপড়ে সিগারেট এবং এক টাকার সেই পয়সাটা বের করল। এবারে টেল সাবেরের আর হেড লোকটার। যথারীতি মুদ্রা নিক্ষেপ হলো। নিমেষেই ফল পাওয়া গেল।

সাবের আবারও জয়ী! পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সাবেরের পছন্দসই মুদ্রার পিঠটা পার্কের বাতির আলোয় কিছুটা চমকাচ্ছে। একেই বলে ভাগ্য।

'এই নিন আপনার টাকা,' একঘেয়ে কণ্ঠে বলে উঠল লোকটা। হাত বাড়িয়ে টাকা নিল সাবের। আনন্দ, চাপা উত্তেজনা, সেই সাথে লোভের এক অভূতপূর্ব অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে তার দেহমন। লোকটা রুমাল উঠিয়ে ভাঁজ করতে করতে বলল, 'আজ আপনাকে একটা প্রশ্ন করলে কেমন হয়?'

'করুন,' না বলার কোনও কারণ খুঁজে পেল না সাবের।

'আপনার মতে পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ কাজ কী?'

এ আবার কীরকম প্রশ্ন? সাবের খানিকটা ভেবে বলল, 'বোধহয় শিশুহত্যা। এর চেয়ে খারাপ কাজ এ মুহূর্তে মাথায় আসছে না।'

'আর সবচেয়ে ভাল কাজ?'

'বলতে পারব না। "ভাল কাজ" ব্যাপারটাই আমার কাছে আপেক্ষিক।'

'ও আচ্ছা।'

সেদিনের মত লোকটা বিদায় নিল।

তবে পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ ও রোমাঞ্চকর জুয়াতে ঝুঁকির পাল্লা যে বেশ ভারী, তথ্যটা অচিরেই উপলব্ধি করতে পারল সাবের আলি। অবশ্য উপলব্ধির দামটা কিঞ্চিৎ চড়া, সন্দেহ নেই। কয়েকদিন বিরতির পর আবার সন্ধ্যাবেলা খেলতে যেয়ে প্রথমেই সাবের জানাল যে সে আজ খেলবে তার বাম চোখের বিনিময়ে। বাজির মূল্য নগদ এক লক্ষ টাকা।

'আপনি ভেবেচিন্তে বলছেন তো এ বাজি রাখবেন?' চ্যালেঞ্জের সুরে জানতে চাইল লোকটা।

'অবশ্যই।'

'হেড না টেল?'

'হেড।'

যথারীতি রুমাল পাতা হলো, সিগারেট ধরানো হলো, কয়েন টস হলো। অপলক কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর সাবের বুঝতে পারল কী ফল হয়েছে। আনমনেই নিজের বাম চোখটায় হাত চলে গেল তার। প্রতিবার বাজি জেতায় তার মনে একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল, বাজি সে জিতবেই। হারের কথা একবারও মাথায় আসেনি। এ কী

হলো?

'বাজি হারার জন্যে দুঃখিত সাবের সাহেব। টাকাটা এবার আপনি পেলেন না। চুক্তি মোতাবেক আপনার বাম চোখটা আমাকে দিয়ে দিতে হয় এবার।'

সাবের চোখ সরু করে তাকিয়ে রইল, তার মনে জটিল চিন্তা-ভাবনা চলছে। লোকটা যেভাবে কথা বলছে তাতে মনে হয় না সহজে ছেড়ে দেবে। ভয়ঙ্কর কিছু করে বসা এর পক্ষে বিচিত্র না-ও হতে পারে। তবে লোকটাকে নিরস্ত করার একটাই উপায় আছে। লোকটাকে বোঝাতে হবে সে যা তা মানুষ নয়। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে 'সাবের বাহিনী' বলে তার ছেলেছোকরাদের যে দলটা আছে প্রয়োজনে তাদের ব্যবহার করতে হবে। কাজেই বাড়াবাড়ি করার ফল হবে খুব খারাপ। এতটা খারাপ লোকটা হয়তো কল্পনাও করতে পারবে না।

'চোখ খুলে নেবেন মানে? মশকরা করছেন?'

'শর্তের কথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন সাবের সাহেব,' জলদগম্ভীর গলায় বলল লোকটা, কর্তৃত্বের সুর স্পষ্ট।

সাবের হাসার চেষ্টা করে বলল, 'আপনার কী ধারণা এই রকম একটা জনবহুল জায়গায় আপনি খুঁচিয়ে আমার চোখ উপড়ে ফেলবেন আর আমি চুপ করে বসে থাকব? এনিওয়ে, আপনার জ্ঞাতার্থেই বলছি, এই পার্কের অন্তত দশটা স্পটে আমার লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সঙ্কেত পেলেই ছুটে আসবে তারা। আর তখন আপনার দশা কী হবে ভাবলেই হাসি পাচ্ছে। ভাল কথা, আপনি ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের কুখ্যাত "সাবের বাহিনী" সম্বন্ধে জানেন তো?'

'আপনারা পাড়ার কয়েকজন মিলে একটু দাদাগিরি করেন এটা ঠিক। অবশ্যই কুখ্যাত শব্দটা এক্ষেত্রে খাটে না। আর আমার তুলনায় আপনারা তো শিশু।'

'বটে! হুমকি দেয়া হচ্ছে খুব। আচ্ছা, ঠিক আছে। নিন, আমার চোখ উপড়ে ফেলুন, দেখি আপনার সাহস কত।'

লোকটা শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আমার কাজ করার পদ্ধতি আলাদা। সময় হলেই আমার পাওনা আমি ঠিকই বুঝে নেব।'

'সে আপনার ব্যাপার। তবে একটা কথা জানিয়ে রাখি, আজকের পর আর কোনদিন আমার চোখের সামনে পড়বেন না যেন। যদি পড়েন, তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। কয়েন টস করার সাধ চিরতরে মিটে যাবে।'

লোকটা শব্দ করে হাসল। 'এভাবে নিয়তি এড়ানো যায় না। কয়েকজন পাড়ার ছেলের ভয়ে আমি চলে যাচ্ছি এমনটা ভেবে বসলে ভুল হবে আপনার। আমি যাচ্ছি, কারণ আমার কর্মপদ্ধতি আলাদা। সময় হলেই টের পাবেন।'

উঠে দাঁড়াল লোকটা। বোঝাই যায় কোন গণ্ডগোল চায় না। রুমাল ভাঁজ করে পকেটে রেখে ধীরে-সুস্থে ফিরতি পথ ধরল, কোন কথা বলল না।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল সাবের। মনের ভেতর একটা অস্বস্তিকর দ্বন্দ্ব ঢুকে গেছে। লোকটা অন্ধকারে মিলিয়ে যেতেই বাড়ির দিকে হাঁটা ধরল। সে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে–আজ রাতেই ট্রেন ধরে সোজা দেশে চলে যাবে, তারপর সেখান থেকে অন্য কোথাও। কিছুদিন লুকিয়ে থাকা উচিত। লোকটাকে যদিও তেমন প্রতিশোধপরায়ণ মনে হয় না, তবু সাবধানের মার নেই।

আর সে রাতেই অত্যন্ত অবিশ্বাস্যভাবে নিজের বাঁ চোখটা খোয়াল সাবের। ট্রেনে সময় মতই উঠতে পেরেছিল। টিকিট চেকিঙের পর নিজের রিজার্ভড কামরার দরজা বন্ধ করেই আরামে ঘুমিয়ে পড়ল সে, সারাদিন খুব ক্লান্ত ছিল।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখল সাবের। একটা বিশাল খোলা ময়দানে খুঁটির সাথে কেউ বেঁধে রেখেছে তাকে। আশেপাশে দৃষ্টিসীমায় কেউ নেই। এমন সময় লক্ষ করল কোত্থেকে উদয় হলো সেই লম্বা লোকটা, দুহাত পেছনে রেখে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। কিছুদূর এগিয়ে আসা মাত্রই সে বুঝতে পারল বিশাল এক লোহার রড ধরে আছে লোকটা। রডটার ডগা অঙ্গারের মত লাল। তারপর হঠাৎ, বলা নেই কওয়া নেই এসেই পেছন থেকে রডটা বের করে সোজা সাবেরের বাম চোখে ঢুকিয়ে দিল। আর সথে সাথে নারকীয় যন্ত্রণা শুরু। অসহনীয় এক অনুভূতি। চোখ পোড়ার গন্ধও নাকে এল। সাথে সাথে

ঘুম ভেঙে গেল সাবেরের। হয়তো ঘুম না ভাঙাটাই বেশি ভাল ছিল, কারণ ঘুম ভাঙার পরই যন্ত্রণাটা যেন এক লাফে স্বপ্ন থেকে বাস্তবে চলে এল। নিদারুণ জ্বালা ও আতঙ্কের সাথে সে লক্ষ করল তার বাম চোখটা এক অজ্ঞাত কারণে সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। চোখের বদলে জায়গাটা এখন খাঁ খাঁ করছে!

আর ভাবতে ভাল লাগছে না সাবেরের, চোখ খুলে তাকাল। এই মুহূর্তে পার্কের বেঞ্চিতে বসে আছে সে, সন্ধ্যা হয় হয়। মাথার ওপর বাদুড় উড়ছে, বাড়ি ফেরা পাখিদের ডানা ঝাপটানোর শব্দ কানে আসছে। সম্পূর্ণ লৌকিক পরিবেশ। রোদ চশমাটা খুলে হাতে নিল। এখন সারাদিন কালো চশমা পরে থাকায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে সে। শূন্য কোটর কাউকে দেখাতে ইচ্ছা করে না। একমাত্র অন্ধকারে মাঝেমধ্যে খুলে বসে থাকা যায়, লোকে খেয়াল করতে পারে না। দীর্ঘশ্বাস ফেলতে গিয়েও ফেলল না সাবের। সত্যিকার জুয়াড়ীর দীর্ঘশ্বাস ফেলা মানায় না। তাকে হতে হবে আরও শক্ত, আরও বেপরোয়া। পাকা জুয়াড়ীর এত সহজে হার মানলে চলবে কেন?

সন্ধ্যা নামার সাথে সাথেই পায়ে পায়ে এল লোকটা, সেই একই বেশ, একই ভঙ্গি।

'আপনাকে দেখে আনন্দ পেলাম, সাবের সাহেব। আপনি সত্যিই পাকা জুয়াড়ী, শেষ দান পর্যন্ত আশায় থাকেন।'

নিষ্প্রাণ হাসল সাবের। লোকটার মধ্যে কেমন অদ্ভুত একটা নির্লিপ্ততা আছে–ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

লোকটার প্রতি কেন জানি তার রাগ বা ক্ষোভ জাগছে না। বরং শেষ খেলাটা শুরু করার জন্যে মন উতলা হয়ে আছে। নেশা নেশা বোধ হচ্ছে।

'আপনি কে, সত্যি করে বলুন তো?'

'বলেছি তো আপনাকে, আমি কেউ না। আর কেউ না বলেই বোধহয় সব কথা জানি।'

'আপনি মিথ্যা বলছেন।'

লোকটা শব্দ করে হাসল। সাবের দুর্বল ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, 'আজকের খেলায় আপনি আমার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদটির বিপরীতে সর্বোচ্চ অঙ্কের টাকা ধরবেন। যদি জিততে পারি, টাকা আমার, আর হারলে বুঝতেই পারছেন। এখন বলুন আপনার হিসেবে আমার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদটি কী?'

'হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত? কেন আপনার কি দুনিয়াটা আর ভাল লাগছে না?'

সাবের অসহিষ্ণুভাবে বলল, 'কেন মিছামিছি সময় নষ্ট করছেন? গত একটা বছর আমার কেমন কেটেছে জানেন না? চোখ হারানোর সাথে সাথে সৌভাগ্য যেন হারিয়ে গেছে আমার জীবন থেকে। চারদিক থেকে একের পর এক বিপদ। সওদাগরি অফিসের চাকরিটা হারিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই চূড়ান্ত অর্থকষ্টে পড়লাম। কয়েকটা ব্যবসা ধরলাম, সব ফেল মারল। বাজারে আমার এখন বিস্তর দেনা। কাঁঠালবাগানের মেসবাড়িটা ছেড়ে এখন একটা বস্তির মত জায়গায় থাকতে হচ্ছে। অবস্থা এমন হয়েছে, যেখানেই হাত দিই সেখানেই ব্যর্থতা। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের বন্ধুরাও একে একে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। এতসবের পরেও আমি আত্মীয়স্বজনহীন মানুষ, কোনমতে হয়তো নিজেকে মানিয়ে নিতাম। কিন্তু সহ্য করতে পারছি না টাকার অভাবে জুয়া খেলতে না পারার কষ্টটা। এখন আর বেঁচে থেকে লাভ কী? এর চেয়ে জীবনের সর্বস্ব বাজি রেখে শেষবারের মত ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

'তারমানে আপনার কুখ্যাত সাবের বাহিনীও খতম?'

সাবের কোন কথা বলল না।

লোকটা কৌতুক করে বলল, 'আপনার হিসেব মতে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদটিকে আন্দাজ করতে পারছেন না? ভাগ্যের সাথে সাথে বুদ্ধিবিবেচনাও হারিয়ে ফেলেছেন নাকি?'

সাবের দীর্ঘশ্বাস গোপন করতে পারল না। 'ওটার দাম কত ধরছেন?'

'আপনার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদটির দাম সাত রাজার ধনের সমান। জিততে পারলে আপনি দুনিয়ায় রাজত্ব করতে পারবেন, এ ভরসা দিতে পারি।'

সাবের অসহিষ্ণু স্বরে বলল, 'তা হলে খেলা শুরু করুন, দেরি করা অর্থহীন।'

'তার আগে বলুন আপনি সজ্ঞানে রাজি হচ্ছেন তো? আমার ক্ষমতা তো দেখেছেন, পালিয়ে পার পাবেন না।'

'ওই একটা জিনিস ছাড়া আমার আর হারাবার কিছুই নেই। সংসারে এমন কেউ নেই যার জন্যে আমাকে বেঁচে থাকতে হবে,' সে হাসার চেষ্টা করল। 'আমার হঠাৎ কি মনে হচ্ছে জানেন? ওই সর্বোচ্চ মূল্যবান সম্পদটির হয়তো আসলে কোনও দামই নেই। আপনি খামোকা সাত রাজার ধন দিয়ে ওটা কেনার চেষ্টা করছেন।'

'সে আমার ইচ্ছা। আসুন, খেলা শুরু করা যাক,' বলল লোকটা।

সাবের কম্পিত হাতে পকেট থেকে এক টাকার কয়েন বের করল। হেড–সাবেরের টেল–লোকটার।

মুদ্রাটা টস করার মুহূর্তে একবার তার মনে হলো সে যা করছে তা কি সঠিক? জুয়া খেলা ছাড়া তার তো এখন আর অন্য কোনও দোষ নেই। সে গান গাইতে জানে, মানুষের উপকার করতে ভালবাসে– এসবের কি কোন দাম নেই? এভাবে নিজের জীবন নিয়ে বাজি ধরা কি ঠিক?

কিন্তু সময় আর নেই। শূন্যে কয়েকবার পাক খেয়ে কয়েনটা রুমালের ওপর পড়ল। কতকটা যেন অবধারিতভাবেই পরাজিত হলো সাবের।

সব শেষ, আশা, ভরসা সব শেষ। গোটা জীবনের একটা ছবি মুহূর্তের মধ্যে চোখের সামনে এল আর চলে গেল।

'আপনার পাওনা আপনি বুঝে নিতে পারেন। আমার আর কোনও আপত্তি নেই,' শান্ত কণ্ঠে বলল সাবের। লোকটার দিকে তাকাতে ইচ্ছা হচ্ছে না। ক্লান্তিতে ঘুমঘুম পাচ্ছে তার। অনেক বছর আগে একবার পরীক্ষার হলে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারার সময় ঠিক এমন ধরনের অনুভূতি হয়েছিল। চোখের পাতা ভারি ভারি লাগছে, মনে হচ্ছে বহুদিন ভাল ঘুম হয় না।

'আপনার জন্যে সত্যি আফসোস হচ্ছে, সাবের সাহেব। বহুকাল

পর সাহসী একজন জুয়াড়ী দেখলাম। বেশিরভাগ লোকই চোখ কিংবা হাত হারানোর পর আর আমার কাছে আসে না। কিন্তু ব্যতিক্রম এই আপনি। কী সাহসটাই না দেখালেন! আপনাকে অভিনন্দন জানানো উচিত।'

লোকটা স্থির দৃষ্টিতে তাকাল প্রথমবারের মত সাবের লোকটার চোখদুটো দেখল। ভাঁটির মত জ্বলজ্বল করছে। এ চোখ কোনও মানুষের হতে পারে না।

'আপনি আমাকে হত্যা করুন। আমি বাজি হেরে গেছি।'

লোকটা শরীর দুলিয়ে হাসতে লাগল। 'বাহ! একটু আগেই বললেন যে আপনার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদটিকে আপনি বাজি রাখছেন, আর এখন আলতু ফালতু জিনিস আমাকে গছাতে চাইছেন? এ তো শর্তের বরখেলাপ!'

'কী বলতে চান আপনি?' হঠাৎ টান টান হয়ে গেল সাবেরের সমস্ত শিরা-উপশিরা। লোকটার কথা শুনে হঠাৎ করে শরীরে শক্তি ফিরে আসতে শুরু করেছে। বেঁচে থাকার একটা ক্ষীণ সম্ভাবনার কারণে প্রকৃত রোমাঞ্চ অনুভব করল সাবের, এর চেয়ে টানটান আর কিছু নেই।

লোকটা গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'শুনে রাখুন, সাবের সাহেব, একটা মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ কখনোই তার জীবন নয়। যারা জীবনকে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ভেবে বসে আছে তারা নির্বোধ। মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান হচ্ছে তার আত্মা, বুঝলেন, তার আত্মা, আর এই মহামূল্যবান বস্তুটিই আপনি...' এই বলে লোকটা তার গা থেকে মোটা চাদরটা সরিয়ে ফেলল।

পার্কের হলদেটে বাতির আবছা আলোয় সাবের যা দেখল তা বর্ণনাতীত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে কুৎসিত সত্তাটি নিজেকে মেলে ধরল তার সামনে। অতি দীর্ঘ তার ঘৃণিত রূপ, ঘোর অশুভ, পাপ-পঙ্কিলতার চূড়ান্ত আধার। ঈশ্বরের আর কোনও সৃষ্টিই এরচেয়ে বীভৎস, এত পাপিষ্ঠ হতে পারে না। সমগ্র মানবজাতির পাপাচার তার অনন্ত জিঘাংসায় ভরা দুই চোখে। স্বরূপ মেলে ধরার পর পেছন থেকে ভেসে এল হাজার হাজার সম্মিলিত কণ্ঠস্বর। প্রত্যেকটা শব্দে স্বরতরঙ্গ কমছে,

বাড়ছে, ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। গেঁথে যাচ্ছে হৃদয়ে।

'আজ থেকে তোর আত্মা আমার। তুই হবি আমার আজ্ঞাবহ দাস, নরকের ঘৃণিত পিশাচ।'

'কে আপনি? কী আপনার পরিচয়?'

সম্মিলিত কণ্ঠস্বর রক্তজল করে জবাব দিল, 'আমি শয়তান, নরকে আমার বাস।'

সাথে সাথে এক অশুভ নীল আলো ঘিরে ধরল সাবেরকে। চোখ ধাঁধাল না, দৃষ্টির সীমা বাড়ল না, কেবল মনে হলো খুব অপবিত্র কেউ তার হৃদপিণ্ডে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। মস্তিষ্কের ভেতর বাজতে শুরু করেছে দামামা। যুক্তিবোধ, চিন্তা, সবকিছু ক্রমশ গুলিয়ে আসছে। তবে একটা বোধ এখনও মন ছেড়ে যায়নি। আর কিছু না বুঝলেও সাবের আলি এতটুকু বুঝতে পারল, আপাতত তাকে মরতে হচ্ছে না। মনুষ্য সত্তাই যেখানে বিলীনের পথে, সেখানে মৃত্যু অবান্তর।

কয়েকদিন পর কাগজে একটা খবর ছাপা হলে শহরে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হলো। খবরটা ছিল এরকম–

নবজাত শিশু হত্যা: নগরীতে আতঙ্ক

বিশেষ সংবাদদাতা: গত কয়েকদিন যাবৎ নগরীতে নবজাত শিশু হত্যা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়াছে অপেক্ষাকৃত কম খরচের মাতৃসদনগুলোতে মাঝরাত্রে রহস্যজনকভাবে কেহ বা কাহারা প্রবেশ করিয়া শিশুদিগের মুখে লবণ পুরিয়া হত্যাকাণ্ড চালাইতেছে। এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দাসূত্র মারফত খবর পাওয়া গিয়াছে যে এই জঘন্য কর্মকাণ্ডটির পিছনে একক ব্যক্তির হাত রহিয়াছে। গতকাল এক হাসপাতালের ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায় আততায়ীর চেহারার ছবি ধারণ করা সম্ভব হইয়াছে। লোকটির বয়স তিরিশ-পঁয়ত্রিশের অধিক হইবে না। উল্লেখ্য, লোকটির বাম চক্ষু কানা, স্থানটিতে তুলা গুঁজিয়া রাখা হইয়াছে।

আবদুল বাসিত

সরাইখানা

গ্রাম্য চিকিৎসকের জীবন বেশ কষ্টকর। বিশেষ করে যখন তার এলাকা কুড়ি বর্গমাইল জুড়ে, এবং যানবাহন বলতে যখন একটা সেকেলে সাইকেল ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। তাই যখন এক শীতের রাতে সাড়ে চারটে নাগাদ সাটনের ঘুম ভাঙে, অত্যন্ত বিরক্ত হন তিনি। তাঁর চাকরানীটা সে রাতে বাড়ি ছিল না। সাটন অবিবাহিত, বাড়িতে একাই থাকেন।

বাইরে ঘণ্টার আওয়াজ ক্রমেই জোরাল হয়ে উঠছে, কিন্তু ডাক্তারের একটুও ইচ্ছা নয় উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেন। ঘণ্টার শব্দ উপেক্ষা করে তিনি আরও জড়োসড়ো হয়ে শুলেন। কিন্তু যেভাবে দরজায় আওয়াজ হচ্ছে তাতে ডাক্তারের বুঝতে অসুবিধা হলো না যে আগন্তুক নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত তিনি বাধ্য হলেন দরজা খুলে দিতে।

অন্ধকারে উঁকি দিয়ে তাকাতেই এক ব্যক্তি সবেগে ঘরে প্রবেশ করল, আর সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে দিয়ে কাঁপা দু'হাতে ডাক্তারের হাত চেপে ধরল। ডাক্তার চেষ্টা করেও হাত ছাড়িয়ে নিতে পারলেন না। আগন্তুক আরও জোরে চেপে ধরল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আপনিই কি সাটন? আমার একজন ডাক্তার দরকার!'

'হ্যাঁ, আমি সাটন।'

'তাহলে বলুন–বলুন ডাক্তার, আমি কি পাগল? ঈশ্বরের দোহাই, বলুন!'

উত্তর দেবার আগে ডাক্তার তাকালেন আগন্তুকের দিকে। আশ্চর্য তার আকৃতি। চুল এলোমেলো; আর ঘামে, ধুলোয় চটচটে। পোশাক ছিন্নভিন্ন। এবং তার মুখ এমনিতে যদি বা সুন্দর হত, রক্তে আর ধুলো কাদায় বীভৎস হয়ে উঠেছে। তার চোখেও বন্যদৃষ্টি। কিন্তু কণ্ঠস্বরে

এমন এক উদ্বেগের আর আকুলতার প্রকাশ যে ডাক্তার খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। 'খুব ভয় পেয়েছেন দেখছি!' এই বলে তাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাতে বসেই এলিয়ে পড়ল লোকটা। একটু ব্র্যান্ডি এনে ডাক্তার তাকে খেতে দিলেন। ব্র্যান্ডিটা এক ঢোকে গিলে ফেলল লোকটা। আস্তে আস্তে তার মুখে রক্তের আভাস ফুটে উঠল। এরপর কিছুক্ষণ স্তব্ধতা বিরাজ করল। ডাক্তার ভাল করে তাঁর রোগীকে লক্ষ করতে লাগলেন। তিনি জানেন তাড়াহুড়ার কিছু নেই, রোগী নিজেই সামলে উঠে তার গল্প শোনাবে। তিনি বুঝতে পারলেন, রোগীর স্নায়ুর উপর যে প্রচণ্ড চাপ পড়েছে তা সহ্য করা তার পক্ষে বিশেষ কঠিন হচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে সত্যি লোকটা নিজে থেকেই তার কাহিনি শুরু করল।

'আমার নাম ফ্র্যাঙ্ক মেথুয়েন। ফটোগ্রাফির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আমার ব্যবসা। কোম্পানি দিন পনেরো হলো আমার উপর এই জেলার ভার দিয়েছে। এলাকাটা আদৌ সুবিধার নয়, কিন্তু চাকরি করতে গেলে তো অত বাছ বিচার করা চলে না। আমি লন্ডনের মানুষ, সুতরাং বুঝতেই পারছেন যখন আমাকে বাধ্য হয়ে ককারমাউথের নিকটবর্তী হায়াতে কাজে যোগ দিতে হয়, তখন আমার মনের অবস্থা কী।'

আগন্তুক একটু দম নিয়ে আবার বলে চলল, 'চেষ্টা করে চলেছি, কিন্তু বিশেষ কিছুই করতে পারছি না। এই জলা এলাকায় আর কী ব্যবসা হতে পারে! শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, ওয়ার্কিংটন আর হোয়াইটহ্যাভেন জেলায় চেষ্টা করে দেখব। তাই গত রাতে মোটর বাইকে করে বেরিয়ে পড়লাম, যাতে সময় থাকতে হোটেলে পৌঁছে স্নান সেরে একটু ঘুমিয়ে সকাল বেলা আবার কাজে বেরোতে পারি। কিন্তু আমার ভাগ্য ছিল বিরূপ।

'হঠাৎ আমার বাইক অচল হয়ে গেল। আমি তখন নির্জন জলা এলাকায়। দেখলাম, যে-কোন কারণেই হোক, আমার পেট্রোল ট্যাঙ্কে লিক হয়েছে, এবং বাড়তি পেট্রোলের ট্যাঙ্কেও খুব সামান্যই তেল আছে। নিশ্চয় কেউ চুরি করেছে, সন্দেহ নেই। তখন আমি সেই ছিদ্রটা চুইং গাম দিয়ে সাধ্যমত মেরামত করে আবার যাত্রা করলাম। কিন্তু মাত্র

সিকি মাইলের মত এগিয়েছি, এমন সময় আবার দেখি তেল চুইয়ে পড়ছে। ফলে সম্পূর্ণ আটকে পড়লাম আমি। রাত দশটা, পিচের মত অন্ধকার, আর কাছাকাছি গ্রামের দূরত্ব সেখান থেকে অন্তত দু'মাইলের মত। কোথাও জনমানবের সাড়া নেই, তার উপর আবার কুয়াশা ক্রমেই ঘন হয়ে উঠছে। আমি মোটেই ভীতু নই, কিন্তু তাহলেও কেন জানি না অমঙ্গলের আশঙ্কায় মন কুঁকড়ে উঠল। ঝোপের ভেতর একটা গর্ত আছে, কে যেন বলে গেল আমাকে। বলল, ওখানে যাও। গর্তটার কাছাকাছি পৌঁছে এবং সেখানে নেমে গিয়ে স্বস্তির সাথে অনুভব করলাম, অমঙ্গলের প্রভাব আমার উপর থেকে সরে যাচ্ছে, হঠাৎ দেখলাম আমার ঠিক সামনেই আমি যার প্রত্যাশায় ছিলাম—একটা সরাইখানা। এ যেন নির্বান্ধব দেশে এক পরম বন্ধুর আবির্ভাব! অবশ্য সরাইখানাটি সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঢাকা। কিন্তু তাহলেও যেমন করে হোক নিশ্চয় মালিককে জাগাতে পারব। সরাইটা একটা ঝোপের আড়ালে থাকায় এতক্ষণ চোখে পড়েনি।

'মোটামুটি বেশ বড়ই সেটা। একটু সেকেলে ধরনের। একটা রঙ করা সাইনবোর্ড চোখে পড়ছে। তবে অন্ধকারে লেখাটা পড়তে পারলাম না, দরজায় গিয়ে আওয়াজ করলাম। বাইক যেখানে আছে সেইখানেই থাকুক। কোন সাড়া পেলাম না। আবার আওয়াজ করলাম। এবার আরেকটু ভাল করে সরাইটা লক্ষ করলাম। রোদে-জলে অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া একটা ছবি দেয়ালে। একটা কফিন আঁকা। কফিনটা বহন করছে চারটা মুণ্ডহীন মানুষ, তার নীচে লেখা, 'পথের শেষ প্রান্ত।'

'হঠাৎ এই সময়ে সরাইয়ের ভিতর থেকে নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল। ডান দিকের একটা জানালা দিয়ে আলোর ক্ষীণ আভাস চোখে পড়ল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আর দেখতে পেলাম না আলোটা। এমন সময় একটা অস্ফুট আওয়াজ আমার কানে এল। কে যেন চটি পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। পরক্ষণেই খিল খোলার আওয়াজ। তার পরেই ধীরে ধীরে দরজাটা খুলে গেল।

'যাকে সামনে দেখলাম সে মানুষটা ছোটখাট। মুখ গোলাকার, সেখানে দাড়ি, গোঁফের বা ভুরুর কোন বালাই নেই। একটা লম্বা কালো

পোশাক কাঁধ থেকে নেমে এসেছে। আর সব থেকে যা ভয়াবহ, লোকটার চোখ বলতে কিছু নেই। দু'হাত বাড়িয়ে সে হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে আসছে। তার পাশে এক মহিলা, সেকেলে একটা মোমবাতি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। মহিলাটি মাঝারি উচ্চতার এবং অত্যন্ত রূপবতী। আমাকে সে লক্ষ করতে লাগল। আমার সমস্যার কথা শুনে অন্ধ লোকটি আমার দেহ স্পর্শ করতে চাইল। আমার মুখে যে বিতৃষ্ণার ভাব ফুটে উঠেছিল তা হয়তো মহিলাটি লক্ষ করেছে। চক্ষুহীনকে সে বলল, 'ওকে আসতে দাও, ওকে দিয়ে বেশ চলবে।'

'অন্ধ লোকটি তখন সরে গিয়ে আমাকে ভেতরে আসার জন্যে হাতছানি দিয়ে ডাকল, আমি শপথ করে বলছি, তখন যদি কোন মুরগির ঘর কিংবা গোলাবাড়িও পেতাম তো এখানে এক মিনিটও আমি কাটাতাম না। কিন্তু তখন ওরা আমাকে আশ্রয় দিতে রাজী হয়েছে, এতেই আমি অত্যন্ত খুশি। মালিক আমার মধ্যে যতই ত্রাসের সৃষ্টি করুক না কেন, বাইরে রাত কাটানোর থেকে তো ভাল!

'মহিলাটি আমাকে নীরবে দোতলার একটা শোবার ঘরে নিয়ে এল। কিছু খাবার চাইতে এবং স্নান করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। ভাবলাম মহিলা খুব ক্লান্ত বোধহয়। এই অসময়ে তাকে অসুবিধায় ফেলার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলাম, তারপর শুভরাত্রি জানালাম। একটু রহস্যময় হাসি হেসে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল সে।

'তাকালাম ঘরটার চারদিকে। আসবাবের বিশেষ বালাই নেই, ঘরের এক কোণে একটা বেসিন, তোয়ালে, আর একটা দেয়াল বরাবর গোটাদুয়েক চেয়ার, ঘরের প্রায় পুরু এক দিকটায় কেবল একটা খাট, আর অন্য দিকটায় কেবল একটা দরজা ছাড়া কিছুই নেই। সেটা খুলতে চাইলাম, কিন্তু পারলাম না।

'যাই হোক, আমি ক্লান্ত। এবার ঘুমাব। পোশাক ছাড়তে শুরু করলাম। একটা প্রকাণ্ড ব্রোঞ্জের বাতি ছাড়া ঘরে আর কোন আলো নেই। ঘুমোনোর জন্যে বিছানায় উঠতে গিয়ে আবার স্নানের ইচ্ছাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আবার একবার দেয়ালের ছোট দরজাটার কাছে

গেলাম। আমার কাছে কিছু পুরনো চাবি থাকে–যদি কখনও কাজে লেগে যায়। এক্ষেত্রে কাজও হলো। খোলা গেল দরজাটা। কিন্তু স্নানটা অন্ধকারেই করতে হবে, কারণ শুধুমাত্র ব্রোঞ্জের বাতিটা ছাড়া ঘরে আর কোন বাতি নেই। আর সেই বাতিটি এত বড় ও ভারী যে তিন জনে মিলেও সেটাকে তুলতে পারবে কিনা সন্দেহ। বাথরুমে ঢুকে দিলাম কল খুলে। শোবার ঘর থেকে যে সামান্য পরিমাণ আলো আসছে তাতে দেখলাম জলে লোহার পরিমাণ বেশি থাকার ফলেই হয়তো কালো দেখাচ্ছে। টবটা লোহার, অত্যন্ত সেকেলে ধরনের। ড্রেসিং গাউন খুলে আমি টবে নামলাম। সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। হা ঈশ্বর, এ কী? টবটার পাশগুলো আর তলাটা রক্তে পিচ্ছিল। তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে এলাম। কিছুক্ষণের জন্য হয়তো আমার জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান ফিরলে দেখলাম আমি টবটার পাশে শুয়ে আছি। আমার পায়ে ও গোড়ালিতে রক্তের দাগ। বুঝতে পারলাম, মানুষের রক্ত। গুছিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছি। যখন বিছানায় ফিরে যাওয়ার মত শক্তি পেলাম তখন প্রথমেই রক্ত মুছে ফেললাম। পুরো ব্যাপারটিকেই আমার স্বপ্ন বলে মনে করতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু টাওয়ালে লেগে থাকা রক্তগুলো তো কিছুতেই স্বপ্ন হতে পারে না। এ সত্য, এ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। শেষ পর্যন্ত মনকে শান্ত করে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে আমি কাপড় পরে ফেললাম। পাশের ঘরেই সেই মূর্তিমান আতঙ্ক রয়েছে–এ কথা জানার পর আর ঘুমানো সম্ভব নয়। এবং ওই স্নানের ঘরেই যে দেহটা কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয় তার শরীরের সমস্ত রক্ত নিঃশেষে নিংড়ে নেয়া হয়েছে। যেন কোন প্রকাণ্ড জোঁক তার সব রক্ত শুষে নিয়েছে। হ্যাঁ, জোঁক, জোঁকই বটে–অন্ধ সরাইয়ের মালিককে জোঁকের সাথে বেশ তুলনা করা যায়। কে ওর পরবর্তী শিকার হতে চলেছে?

'শিউরে উঠল শরীর, দৌড়ে গেলাম জানালার কাছে। না, ও পথে পালানো অসম্ভব, কারণ জানালার উপর থেকে নীচে পর্যন্ত রয়েছে ছয়টা মোটা লোহার শিক। তখন দৌড়ে গেলাম দরজার কাছে। সেটাও তালাবদ্ধ। অর্থাৎ আমি বন্দী। কী করব ভেবে না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছি,

এমন সময় সিঁড়িতে আবার চটির আওয়াজ। আওয়াজটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে। থামল দরজার কাছে এসে। বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছি। প্রায় নিঃশব্দে দরজায় চাবি পড়ল, একটু একটু করে দরজাটা খুলে যাচ্ছে। মহা আতঙ্কে চলৎশক্তি হারিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কী ভয়ঙ্কর সেই স্তব্ধতা। হঠাৎ আমি বাকশক্তি ফিরে পেলাম। চিৎকার করে উঠলাম, 'যাও! চলে যাও বলছি!' তারপর দরজাটার উপর ছিটকে পড়ে সেটা বন্ধ করে দিলাম। সেই আতঙ্কের মধ্যেও শুনতে পেলাম পায়ের আওয়াজ ক্রমশই পিছিয়ে যাচ্ছে। তারপর আবার সেই স্তব্ধতা। ভীরুতার জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিলাম। কেন যে সেই অন্ধ মূর্তিমান আতঙ্কের মাথার ঘিলু উড়িয়ে দিইনি! তাহলেই তো পালাতে পারতাম। আসলে ওকে দেখেই যেন সারা শরীর অবশ হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর আমি সাহস সঞ্চয় করে দরজাটা খুললাম। নিবিড় অন্ধকার। এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার, ভিতর থেকে যে দরজাটা বন্ধ করে দেব তাও সম্ভব হচ্ছে না, কারণ চাবিটাই নেই। দরজা ভিজিয়ে দিয়ে গেলাম ঘরের কোণে রাখা একটা প্রকাণ্ড সিন্দুকের কাছে। অনেক কষ্টে সেটাকে টেনে এনে দরজার সাথে আটকে রেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। এখন আর কিছুই করার নেই, কেবল ভোরের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া। পোশাক পরা অবস্থাতেই আমি আলো না নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঠিক করলাম পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব।

'অলস ভাবে চিৎ হয়ে শুয়ে আছি। হঠাৎ দেখলাম ঠিক আমার মুখের সামনে অতি বৃহৎ মাকড়সা, একটি মাত্র সুতায় ভর করে ঝুলছে। পৃথিবীতে একমাত্র যে পোকা আমার প্রচণ্ড বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করে তা হচ্ছে মাকড়সা। লক্ষ করলাম, মাকড়সাটি ঝুলছে সুতো ধরে নয়, একটা খুব সরু ধাতব পদার্থ ধরে। একদৃষ্টে লক্ষ করছি মাকড়সাটাকে আর চেষ্টা করছি জেগে থাকতে। কিন্তু ক্লান্ত শরীর আর সইল না, ঘুমিয়ে পড়লাম এক সময়। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। চাপা আর্তনাদ করে পলকের মধ্যে বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লাম। আর সেই মুহূর্তেই, যে সুচাল অত্যন্ত ভারী ধাতব বস্তু থেকে মাকড়সাটা ঝুলছিল সেটা ভয়ঙ্কর বেগে পড়ল ঠিক যেখানে আমি শুয়ে ছিলাম সেই জায়গায়, বলতে কী,

মাকড়সাটার জন্যই আমি এ যাত্রা বেঁচে গেলাম।

'নিতান্তই অকৃতজ্ঞের মত আমি মাকড়সাটাকে আমার গা থেকে ঝেড়ে ফেললাম। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা কি হয়েছিল। ধাতব সুচাল বস্তুটা হচ্ছে একটা বর্শার একাংশ। ছাদের একটা গর্তের ওপারে তার বাকি অংশটা অদৃশ্য। মানুষ হত্যা করার জন্যে শয়তানী বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভাবছি কী করব, এমন সময় মনে হলো যেন দরজার বাইরে থেকে আঁচড়ানোর আওয়াজ আসছে। না, এ আমার উত্তেজিত স্নায়ুর ভুল শোনা। তেমনি কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর বিছানার পাশের দেয়ালের ওপার থেকে যে মৃদু আঁচড়ের আওয়াজ আমার কানে এল সেটা যে বাস্তব তাতে সন্দেহ রইল না। ফিরলাম সেদিকে। দেয়ালটার একটা ফাটল একটু একটু করে দেখা দিল। তারপর সেই ফাটল দিয়ে অস্পষ্ট আলো দেখা দিতে লাগল। তাড়াতাড়ি গিয়ে নিবিয়ে দিলাম বাতিটা। ঠিক করেছি এবার আর ভয়কে আমল দেব না। বুকে সাহস নিয়ে বাথরুমে গিয়ে দরজাটা ফাঁক করে দেখতে লাগলাম, নিজেকে যথাসম্ভব আড়ালে রেখে। দেখলাম সেই ফাঁক ক্রমেই বড় হচ্ছে–শেষ পর্যন্ত সরাইয়ের মালিক ঢুকে পড়ল। মুহূর্তের জন্যে থেমে দাঁড়াল। তারপর হাতড়াতে হাতড়াতে আন্দাজ করে আমার বিছানার দিকে এগোল। হাতড়াতে হাতড়াতে ধাতব বস্তুটি অনুভব করে পরম তৃপ্তির সঙ্গে দেহটা খুঁজতে ব্যস্ত হলো। মহিলাও তার পিছু পিছু এগোচ্ছে। সরাইয়ের মালিককে হতাশাব্যঞ্জক আওয়াজ করতে দেখেই ব্যাপারটা সঙ্গে সঙ্গে আন্দাজ করে ফেলল সে। বলে উঠল, 'বাথরুমটা বাথরুমটা! তাড়াতাড়ি!'

'তারপর খানিকটা টেনে, খানিকটা ঠেলে দ্রুত তাকে আমার দিকে এগিয়ে দিতে লাগল। পলকের মধ্যে আমি সেখান থেকে পালাবার উপায় খুঁজতে লাগলাম। টবের উপরে যে চৌবাচ্চাটা রয়েছে, সেখান দিয়ে যেন একটু তারার আলো চোখে পড়ল। বিদ্যুতের বেগে আমি উঠে পড়লাম ওখানে। সেখানে শুয়ে হাঁপাতে লাগলাম। একটা বিকট দুর্গন্ধ নাকে আসছে। কিন্তু তবুও আমি নড়তে সাহস পেলাম না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাথরুমের দরজাটা গেল খুলে। আততায়ীরা প্রবেশ করল।

আমাকে দেখে ফেলবে নাতো? সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করলাম। কী যেন বলে মহিলা ঝুঁকে পড়ল, তারপর টবের ভিতর থেকে আন্দাজে একটা কুড়ুল তুলে নিয়ে অতি বীভৎস হাসি হেসে উঠল—যেন কোন বুনো জন্তু মাংসের গন্ধ পেয়েছে।

চেঁচিয়ে উঠল সে, 'নেমে আয় বলছি! আমার ভাড়া মিটিয়ে যা!' কিন্তু আমার কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে সে মোমবাতিটি অন্ধের হাতে দিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। মুহূর্তের মধ্যে কনুইয়ের আঘাতে কাঁচ ভেঙে ফেললাম। বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি, এমন সময় মহিলাটির উঠে আসার আওয়াজ পেলাম। বাঘিনীর তৎপরতার সঙ্গে এগোচ্ছে সে। ঠিক সেই সময়ে আমি পা পিছলে পড়ে গেলাম। হাতে আর পায়ে নরম পদার্থের ছোঁয়া পেলাম, তাকালাম নীচে। আতঙ্কের উপর আতঙ্ক, একরাশ গলিত মৃতদেহের মধ্যে আমি পড়ে আছি। পুরুষের আর নারীর অসংখ্য মৃতদেহ সেখানে। কোনটা পচে গেছে, কোনটা প্রায় টাটকা। ভয়ানক দুর্গন্ধ। এরা সবাই এই সরাইখানায় আতিথ্য গ্রহণ করেছিল! কোনরকমে সেখান থেকে উঠে ছাদের ঢালু টালির উপরে নামলাম। ফিরে দেখি, মহিলাটিও অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে সেই স্কাই লাইট দিয়ে বেরিয়ে আসছে। একটা গাছের ডাল চোখে পড়ল, যা ধরে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হতে পারে। ডালটা প্রায় ধরে ফেলেছি, এমন সময় হঠাৎ পা পিছলে যেতে ডালটা প্রাণপণে চেপে ধরে ঝুলতে থাকলাম। এখন যদি পড়ে যাই, তাহলে হাত-পা ভাঙবে, এবং নিশ্চয় ধরাও পড়ব। ইতস্তত করলাম আমি, এবং তাতেই হলো সর্বনাশ। ভদ্রমহিলা উল্লসিত চিৎকার করে উঠল। মহা আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ করলাম, কুড়ুলটা দোলাচ্ছে। আর পরমুহূর্তেই ডান হাতে একটা ভয়ঙ্কর আঘাত অনুভব করলাম। সেই সঙ্গে অনুভব করলাম আমি নীচে পড়ে যাচ্ছি। যাই হোক, সেই অবস্থাতেও কোন রকমে উঠে ছুট দিলাম। রাতের অন্ধকারে কতক্ষণ দৌড়েছিলাম জানি না। শেষ পর্যন্ত পেছনে ফিরে দেখতে গেলাম কেউ তেড়ে আসছে কিনা। দেখলাম, যেখানে সরাইটা ছিল, সেখানে আগুন জ্বলছে। সেই আগুনে অন্ধকার আকাশ আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে।'

মেথুয়েনের কাহিনি শেষ হলো। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যাচ্ছে। যেন কাহিনি বর্ণনা করতে করতে সে আবার ঘটনাস্থলে চলে গেছে। ডাক্তার বললেন, 'অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক কাহিনী। শেষ পর্যন্ত তাহলে সরাইখানায় আগুন লেগে গেল?'

'এর একমাত্র যুক্তি হচ্ছে, মহিলা যখন অন্ধকে মোমবাতিটি ধরতে দিয়েছিল তখন সেই আগুন কোন দাহ্য পদার্থে লেগে গিয়েছিল, এবং তাতে আগুনটা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।'

ডাক্তার বললেন, 'আপনি দিব্যি সব কিছু বুঝিয়ে বলতে পারেন দেখছি।'

মেথুয়েন উঠে চেয়ারের পিছনে গেল। তার মুখ চোখ অত্যন্ত ফ্যাকাসে। ডাক্তারের দিকে ফিরে বলল, 'তাহলে আপনি আমাকে পাগল বলেই সাব্যস্ত করলেন? তাই যদি, তাহলে এটার কী ব্যাখ্যা করবেন?' এই বলে চট করে তার ডান হাতটা পকেট থেকে বের করল। সেই হাতের চারটে আঙুলই নেই। যে ব্যান্ডেজে হাতটা বাঁধা ছিল সেটা চটচটে রক্তে মাখা।

লোকটা পড়ে যাচ্ছিল, ডাক্তার সাটন ধরে ফেললেন তাকে।

মূলঃ গাই প্রেস্টন
রূপান্তরঃ মার্টিনা হিলারী গোমেজ

বংশালের বনলতা

আমার জীবনের সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৭৪ সালে শ্রাবণ মাসের এক গুমোট দুপুরে। রাষ্ট্রপতি নিক্সন পি এল ৪৮০-র অধীনে আমেরিকা থেকে পাঠানো এক জাহাজ গম চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। দেখা দিয়েছে দুর্ভিক্ষ, তার ওপর বন্যা। খেতে না পেয়ে আর ডায়রিয়ায় ম্যালেরিয়া সারা দেশজুড়ে লোক মরছে কাতারে কাতারে।

ঢাকা শহরের রাস্তা-ঘাটে, গুলিস্তান আর কমলাপুরের আশপাশে দিনে রাতে লাশের পর লাশ পড়ছে। বেওয়ারিশ লাশ দাফন করতে করতে আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামের দম বেরিয়ে যাওয়ার দশা। শাহবাগ মোড়, ফুলবাড়িয়া, ওসমানী উদ্যান, রমনা পার্ক, আর রেসকোর্স ময়দানের আশপাশে মফস্বল এবং গ্রাম থেকে আসা অগুনতি উঠতি বয়সের মেয়েরা মুখে রঙরঙ মেখে লাল-সবুজ ফিতে দিয়ে চুল, বেঁধে খদ্দেরের আশায় বকের ধৈর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সারাদিন। র‍্যাবের বাবা রক্ষীবাহিনী সারাদেশে নকশাল, সর্বহারা, ডাকাতদের উকুন বাছা করে বাছছে।

দেশের এই যখন অবস্থা আমি তখন মতিঝিলে “আইসিস ট্রেডিং এজেন্সি”র জুনিয়ার অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে চাকরি করি। থাকি বংশালের কাছাকাছি আলাউদ্দিন রোডের অর্মেনীয় ধাঁচে তৈরি দেড়শো বছরের পুরনো এক বাড়িতে, জগন্নাথ কলেজে বি.কম. পড়ার সময় থেকেই আছি ওখানে। চাকরি পাওয়ার পর নতুন ভাল বাসায় উঠতে পারতাম, কিন্তু আমি তা করিনি। বাড়িটির মোটা মোটা নোনাধরা দেয়াল, লোহার বিম-বরগা দেয়া উঁচু ছাদ, জাফরিকাটা রেলিংঘেরা লম্বা বারান্দা আর ছায়াছায়া ঠাণ্ডা ঘরগুলো আমাকে কেমন একটা মায়ায় জড়িয়ে

ফেলেছিল। স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনার বর্তমানে এই বাড়ির মালিক। এই বাড়িতেই শ্রাবণ মাসের এক রোববারে (তখন সাপ্তাহিক ছুটির দিন ছিল রোববার) বেলা একটার দিকে ঘটনাটা ঘটল। কিছুদিন থেকেই তেলাপোকার জ্বালায় তিতিবিরক্ত হয়ে পড়েছিলাম। এই প্রণীটিকে আমি ঘৃণা করি, দেখতে পেলেই পায়ের তলায় পিষে ফেলি। যদিও একাজে সফল খুব কমই হই। এগুলো রাতের বেলা শুয়ে পড়লে মুখের ওপর হাঁটে এবং এদের শরীরের টকটক দুর্গন্ধ নাকে মুখে লেগে যায়। সাবান দিয়ে মুখ ধুলেও গা ঘিনঘিন করে। এর আগে ফিনিস পাউডার দিয়েছি, কোন কাজ হয়নি। অ্যারোসল স্প্রে দিয়েও মারার চেষ্টা করেছি, তাতেও ভাল কাজ দেয়নি। তেলাপোকার গায়ে স্প্রে করলেই তবে ওটা মরে। সমস্যা হলো তেলাপোকার স্বভাব ভূতের মত, বের হয় শুধু রাতের বেলা, অন্ধকারে। দেখতে পেলে তবেই না স্প্রে করার প্রশ্ন ওঠে। এবার নিয়ে এসেছি "লক্ষণ রেখা" নামের একধরনের চক। মেঝেতে ইচ্ছেমত আঁকিবুঁকি কাটলেই আমার কাজ শেষ, বাকিটা করবে চকের দাগ।

দুপুর একটার দিকে গোসলের আগে মুকুলের মাকে সাথে নিয়ে ঘরে চকের দাগ দেয়া শুরু করলাম। এখানে বলে রাখি মুকুলের মা আমার রান্না-বান্না থেকে শুরু করে ঘর সাফ করা, কাপড় কাচা সবই করে। পান খাওয়া লাল ঠোঁট, পেটা শরীর, আর ঝামা-কালো গায়ের রঙে ছায়াছায়া অন্ধকারে তাকে দেখে মনে হয় মা কালীর জীবন্ত মূর্তি। তাকে আমি দু'ঈদে কাপড় দেই, ভাল খাবার রান্না হলে কিছুটা দেই, এবং চাল-ডাল, তেল-নুনের কোন হিসাব কখনও নেই না। সে বলতে গেলে পুরোপুরি স্বাধীনভাবেই সংসার চালাচ্ছে। তার সাথে কথা আমার খুবই কম হয়, এইজন্যেই হয়তো আমার যাবতীয় কর্মকাণ্ড জানার ব্যাপারে তার আগ্রহ অসীম। তার কাছে আমার ঘরের একটি চাবি আছে; আমি অফিসে গেলে সে ঘর পরিষ্কার, বিছানা ঠিকঠাক এইসব কাজ করে।

ঘরে আসবাব সামান্যই; দেয়ালের স্কার্টিং-এর নীচ বরাবর দাগ দিচ্ছি। দুদিকের দেয়ালের খড়খড়ি লাগানো জানাগুলো লম্বায় প্রায় দরজার সমান। বাকি দেয়াল দুটোর একটির মাঝে কুজিটের মত একটি ফাঁকা জায়গা। আগে কাপড়-চোপড়, জুতো-মোজা, হোল্ডঅল এইসব

ওখানে রাখা হলেও বহুদিন যাবৎ ফাঁকা পড়ে আছে। ক্লজিটের দরজা খুলে দেখি ভেতরটা স্যাঁতসেঁতে আর ধুলো ও ঝুল-কালিতে একাকার। লম্বালম্বি করে সেট করা একটি কাঠের লাঠিতে মাকড়সার জালে ঢাকা তিনটি আদ্যিকালের কাঠের হ্যাঙ্গার ঝুলছে। বোঝাই যাচ্ছে মুকুলের মা ওটাকে কোনদিন পরিষ্কার করার কথা ভেবেও দেখেনি। তেলাপোকার আদর্শ ব্রিডিং গ্রাউণ্ড হিসেবে এর পরিবেশ তুলনাহীন। ভেবে দেখলাম পোকাগুলোকে ঝাড়ে-বংশে শেষ করতে হলে ক্লজিটটা পরিষ্কার করা খুবই জরুরী। মুকুলের মাকে পানির বালতি, ঝাঁটা, ন্যাকড়া এইসব আনতে বলে ক্লজিটের দরজা দুটো খুলে দিলাম। ভেতরটা দিনের আলোতেও অন্ধকার, কিছু একটা আলোর ব্যবস্থা না করলে পুরোটা দেখা যাচ্ছে না। গত তিন বছর ধরে এখানে আছি অথচ একবারও ভেতরটা ভাল করে দেখা হয়নি ভেবে অবাকই হচ্ছি। কেননা আমি হচ্ছি সেই দলের, যারা "যেখানে দেখিবে ছাই..." এই আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করে জীবন কাটাই। মুকুলের মা ঝাঁটা, বালতি, ন্যাকড়া এইসব নিয়ে এসেছে। তাকে পরিষ্কার করতে দিয়ে আমি গেলাম বাড়ির সামনে নারায়ণের দোকান থেকে টর্চ লাইট কিনতে। পুরনো ঢাকার এই এক সুবিধা: বাসা-বাজার-হোটেল-রেস্টুরেন্ট-মসজিদ-গোরস্থান সব এক জায়গায়।

তিন ব্যাটারির এভারেডি টর্চ কিনে, চা খেয়ে ফিরে এসে দেখি মুকুলের মা ঝেড়ে মুছে ক্লজিটটা তকতকে করে ফেলেছে। ওটার ভেতরে আর বাইরের মেঝে ভেজাভেজা, না শুকানো পর্যন্ত চকের দাগ দেয়া সম্ভব না। মুকুলের মাকে বিদেয় করে ক্লজিটে টর্চের আলো ফেললাম। ভেতরটা বেশ চওড়া, অনায়াসে একজন মানুষ ঢুকতে পারবে। সামনের ধূসর দেয়ালে পড়ে ঝিকিয়ে উঠল আলো। সাধারণ প্লাস্টার করা দেয়ালে আলোর প্রতিফলন এত তীব্র হয় না। পরীক্ষা করে দেখলাম প্লাস্টারের বদলে ওখানে মার্বেল স্ল্যাব লাগানো। ডানদিকের দেয়ালও মার্বেল মোড়া। বাঁদিকে আলো ফেললাম অথচ প্রতিফলন তেমন জোরালো হলো না, দেয়ালের রঙটাও কেমন যেন মরামরা মনে হলো। ভেতরে ঢুকে কাছে গিয়ে ভাল করে লক্ষ করলাম, নখ দিয়ে

হালকা একটা আঁচড়ও দিলাম। যা ভেবেছিলাম তাই, ওখানকার দেয়াল কাঠের তক্তা দিয়ে ঢাকা। বহু পুরনো তক্তা, আঙুলের গাঁটের টোকা দিয়ে মনে হলো বেশ পুরু। বুঝতে পারলাম, এই আলগা তক্তার ওপাশেও কিছুটা ফাঁকা জায়গা আছে। ক্লজিটের বেশ খানিকটা দেয়ালের ভেতর দিকে ঢুকে আছে। সম্ভবত ঢুকে থাকা অংশটা এই তক্তা দিয়ে আলাদা করা। একটা লোহার ছেনি আর হাতুড়ি পেলে কাঠটা সরানো সম্ভব, শাবল দিয়ে চাড় মেরেও ওটা খুলে ফেলা যায়। সমস্যা হলো শাবল, হাতুড়ি, ছেনি এসবের কোনটাই আমার কাছে নেই। থপথপ শব্দ শুনে পেছন ফিরে তাকালাম। মুকুলের মা রান্না শেষ করেছে এখন চলে যাবে, আমি যেন খেয়ে নেই একথাটি বলতে এসেছে। বলে কী ভাত খাব! উত্তেজনায় আমার পেট গুড়গুড় করছে তখন।

বংশাল মোড়ে বিউটি ভলকানাইজিং, গাড়ি আর মোটর সাইকেলের পাংচার টায়ার ঠিক করে। ছেনি হাতুড়ি ওদের কাছ থেকে চেয়ে আনলাম। তক্তার পাশে ছেনি লাগিয়ে হাতুড়ির বাড়ি মেরে দেয়াল থেকে ওটাকে আলগা করে ফেললাম। যেখানে তক্তাটি লাগানো ছিল সেখান থেকে ভেতর দিকে ক্লজিটটা আরও ফুট চারেক এগিয়েছে। স্যাঁতসেঁতে ধুলোভরা মেঝে তার ওপর আলো-আঁধারিতে চামচিকে-বাদুড়ের কঙ্কাল ধবধবে সাদা দাঁত বের করে পড়ে আছে। ভক্ করে কটু একটা গন্ধ নাকে এসে লাগল, ঝিমঝিম করে উঠল মাথার ভেতরটা। কাত হয়ে পড়েই যাচ্ছিলাম, মার্বেলের দেয়াল ধরে নিজেকে খাড়া রাখলাম। ক্লজিট থেকে বের হয়ে টর্চটা নিয়ে আবার ফিরে গেলাম ওখানে। ভেতরে আলো ফেলে দেখলাম দুদিকে একই রঙের মার্বেলের দেয়াল। শেষ মাথায় কালো কুচকুচে সাধারণ পাথরে মোড়া দেয়ালের মাঝখানে একটা কুলুঙ্গির মত গভীর গর্ত, লম্বা-চওড়ায় ফুট দুয়েক হবে। এই কুলুঙ্গির ভেতর সাদা রঙের দেড়ফুট লম্বা একটি মূর্তি। মূর্তিটা ভাল করে দেখা যাচ্ছে না, পুরু ধুলো পড়ে আছে ওটার ওপর। মূর্তিটার কাছেই দুদিকের দেয়ালে ছোট ছোট দুটো কুলুঙ্গি; মোম বা বাতি রাখার জন্যে। ব্যস এই, আর কিছু নেই ওখানে।

ফিরে এসে খাটের ওপর বসলাম, নিজেকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে। একে উত্তেজনা তার ওপর সকাল থেকে খাওয়া নেই, বমি-বমি লাগছে। গোসল করে কিছু খেয়ে নিতে হবে, ছেনি হাতুড়িও ফিরিয়ে দেয়া দরকার। ভেবেছিলাম কী না কী পেয়ে যাব। পেলাম তিনটে ফাঁকা কুলুঙ্গি আর ধুলো ভর্তি একটি দেড়ফুট লম্বা মূর্তি। এইসব মূর্তি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গৃহ দেবতার হয়। গৃহের ঐশ্বর্য ধরে রাখাই এইসব দেবতাদের কাজ, অন্তত যারা ওগুলো রাখে তারা তাইই বিশ্বাস করে। বেচলেও যে খুব বেশি টাকা পাওয়া যাবে এমন নয়। এগুলো ছাঁচে ঢেলে বানানো পোড়া মাটির তৈরি, টেরাকোটা নামেই বেশি পরিচিত। মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষ, কান্তজী'র মন্দির, পাহাড়পুর-ময়নামতির বৌদ্ধ বিহার থেকে শুরু করে ঢাকার ঠাটারী বাজারের কাছে মন্দিরগুলো পর্যন্ত এইসব টেরাকোটায় বোঝাই। তবে ধাঁধায় যেটা ফেলেছে সেটা হলো একে এত গোপন করে রাখা হয়েছে কেন বা আশপাশের দেয়ালে মার্বেল স্ল্যাবই বা কেন লাগানো? নাহ্, মূর্তিটা ভাল করে দেখতে হবে। একটা মাঝারি সাইজের রঙ করার ব্রাশ হলে ওটা পরিষ্কার করা সম্ভব। মোছামুছি করতে গেলে ভেঙে-টেঙে যেতে পারে, ড্যাম্পের ভেতর বহুদিন থাকলে পোড়ামাটিও ভুসভুসে হয়ে ওঠে। হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে ব্রাশ কিনে আনতে হবে। মনে মনে ভাবলাম, ভাল ঝামেলা হলো দেখছি, সারাদিন দোকানে দোকানেই কাটবে নাকি। ছেনি-হাতুড়ি ফিরিয়ে দিয়ে হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে মাঝারি সাইজের রঙ করার ব্রাশ কিনে এনে গোসল করে খেয়ে দেয়ে যখন বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম তখন পাশ ফিরে শোয়ার মত শক্তিও আর অবশিষ্ট নেই শরীরে।

মশার কামড়ে যখন ঘুম ভাঙল তখন সন্ধে গড়িয়ে গেছে, ঘর অন্ধকার। মুকুলের মা রাতের খাবার তৈরির জন্যে তখনও আসেনি। বাইরে গিয়ে চা-নাশতা খেয়ে ঘরে ফিরলাম। ঘরে আলো জ্বেলে ক্লজিটের দরজা খুলে ভিতরে টর্চের আলো ফেললাম, দুপুরে তক্তাটি খোলার পর একদিকে সরিয়ে রেখেছিলাম। ব্রাশ দিয়ে মূর্তিটি আস্তে আস্তে পরিষ্কার করলাম। দুদিকে ছোট ছোট দুটো পেঁচার মূর্তির মাঝখানে সাদা বেলে পাথরের একটি ছোট যুবতী নারীর মূর্তি। সম্পূর্ণ

নগ্ন শরীরটা থেকে যেন স্বাস্থ্য আর যৌবন ফুটে বেরুচ্ছে। ঢেউ খেলানো চুল, চোখ, ভ্রূ, স্তন, উরু আর তলপেটের প্রতিটি বাঁক নিখুঁত। দেখে মনে হলো যুবতী মেয়েটি বাঁকানো একটি মাঝারী সাইজের গাছের গুঁড়ি দুপা আর দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আছে। গাছের একটি কাটা ডাল ডান কাঁধের ওপর লেপ্টে বা ঝুলে আছে। দেখে মনে হলো গাছটি খুবই মসৃণ এবং এর আর কোন ডাল-পালা বা পাতা নেই। পেঁচাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওদুটোর পা পাখির পায়ের মত না হয়ে তরুণী মেয়েদের পায়ের মত। পরিবেশ ড্যাম্প হওয়ার কারণে মূর্তির গায়ের রাস্ট-এর দাগ পড়ে গেছে। এই দাগ উঠাতে হলে স্পিরিট দিয়ে মূর্তিটাকে ঘষতে হবে। ঘরে রাবিং অ্যালকোহল ছিল, রুমালে অ্যালকোহল লাগিয়ে ঘষেঘষে দাগ কিছুটা তুলে ফেললাম। যেটাকে গাছ মনে করেছিলাম, দেখলাম সেটা মোটেও কোন গাছ নয়, ওটা একটা মোটা সাপ যেটা যুবতীকে জড়িয়ে ধরে আছে। সাপের চোখগুলোয় নীল রঙের ছোট্ট দুটো পাথর বসানো। নজর দিলাম কুলুঙ্গিদুটোর দিকে, ওপরে ঘন কালোরঙের ছোপ। কোনও এক সময় নিয়মিত বাতি জ্বালানো হত ওদুটোর ভেতর। দীর্ঘ সময় টর্চ জ্বালিয়ে রাখার কারণে ব্যাটারি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। দুটো মোম ধরিয়ে দুই কুলুঙ্গিতে রাখলাম। মোমের কাঁপাকাঁপা আলোতে মনে হলো যুবতীর শরীরের ওপর সাপটি মোচড় খাচ্ছে। তাকিয়ে থাকলে নেশা ধরে যায়। আমার ঘোর কেটে গেল জোরে জোরে দরজা ধাক্কানোর শব্দে। ক্লজিটের দরজা বন্ধ করে রুমের দরজা খুলে দেখি মুকুলের মা দাঁড়িয়ে আছে। রাতের রান্না শেষ, যাওয়ার আগে আমাকে এককাপ চা বানিয়ে দেবে কি না জিজ্ঞেস করতে এসেছে। তাকে বিদায় করে কাপড়-চোপড় পরে বাইরে বের হলাম। ভাবলাম খোলা হাওয়ায় একটু হাঁটাহাঁটি করে আসি।

রাস্তাঘাট বেশ ফাঁকাফাঁকা, একে রোববার তার ওপর এমনিতেই তখন ঢাকায় লোকজন এখনকার তুলনায় অনেক কম ছিল। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম হোসেন-ই-দালানের (বর্তমানে আহসান মঞ্জিল) সামনে বুড়িগঙ্গার ধারে। বিশাল কম্পাউণ্ডের এই ভেঙে পড়া প্রাসাদটির এক সময় দোর্দণ্ডপ্রতাপ ছিল। জাতির দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা এখানে বসে

বাইজি নাচ দেখতেন, ফিস্ট খেতেন, এবং বিরাট বিরাট সব সিদ্ধান্ত নিতেন। তখন এখানে যত ভবঘুরে আর ভিখিরীরা এসে জুটেছে। গাঁজা খাওয়া, জুয়াখেলা সহ আরও অনেক ধরনের অসামাজিক কাজ এজায়গাতে সমানে চলত। হাইজ্যাকার, ছিনতাইকারীরা এর আশপাশে ঘুরঘুর করত। তখনও প্রাসাদটির আশপাশে অনেকগুলো পুরনো আমলের বাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। নবাবদের কর্মচারীরা ওই সব বাড়িতে থাকত। এখন ওগুলো ভূমিদস্যুদের দখলে, তারা বাড়িগুলো ভেঙে-চুরে সেখানে রুচিহীন সব দালান তুলেছে। একালের লেখক হুমায়ূন আযাদ একবার বলেছিল, সবকিছু নষ্টদের দখলে যাবে, বাস্তবে হয়েছেও তাই। হোসেন-ই-দালানের সামনে আসলেই আমার সবসময় একটি কিংবদন্তীর কথা মনে পড়ত। কিংবদন্তীটা এই এলাকার সবার মুখেমুখে ছিল। নবাব সলিমুল্লাহ'র অভ্যাস ছিল প্রতিদিন ভোরে বুড়িগঙ্গায় গোসল করে ফজরের নামাজ আদায় করা। এজন্যে তিনি একটি সুন্দর ঘাটও বানিয়েছিলেন। একদিন ভোরে গোসল করতে এসে দেখেন প্রচুর সোনার গহনা গায়ে লাল শাড়ি পরে খালি পায়ে এক যুবতী ঘাটের সিঁড়িতে একা বসে আছে। তখন আলো ঠিকমত ফোটেনি। তিনি মেয়েটিকে অনেক মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে প্রাসাদে এনে নীচতলার একটি গোপন কুঠুরীতে রেখে দেন। সেখান থেকে কোনদিন তাকে তিনি বের হতে দেননি। ওই ঘরে শুধু তিনিই ঢুকতেন, অন্য কারও সেখানে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। সলিমুল্লাহ বিশ্বাস করতেন যতদিন ওই মেয়েটি তাঁর প্রাসাদে থাকবে ততদিন তাঁর ঐশ্বর্যের কোন ঘাটতি হবে না। আরও শোনা যায় মেয়েটির কাছ থেকে তিনি হীরা, চুনী, পান্না ভর্তি একটি সোনার বদনাও পেয়েছিলেন। সলিমুল্লাহ মারা যাওয়ার কিছুদিন পর মাঘ মাসের দারুণ কুয়াশা ঢাকা এক ভোরে প্রাসাদের দারোয়ান দেখল লালশাড়ি পরা সোনার গহনা গায়ে একটা মেয়ে গেট পার হয়ে ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। ব্যাপার কী জানার জন্যে দৌড়ে যেয়ে দেখে শুনশান ঘাট পড়ে আছে, মেয়েটি উধাও। নবাবদের অবস্থা এর পর থেকেই খারাপ হতে থাকে। আমার খুব ইচ্ছা ওই ঘরটি দেখার যেখানে নবাব মেয়েটিকে আটকে রেখেছিলেন, নবাবের সঙ্গে মেয়েটির

সম্পর্ক কেমন ছিল সেটাও জানতে ইচ্ছে করে। মনে পড়ল যুবতী মেয়ে একটা আমার ঘরেও আছে তবে পার্থক্য শুধু এই যে সে পাথরের এবং তার গায়ে কিছু নেই। নদীর ধারে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে বাসায় ফিরলাম। খেয়েদেয়ে বিছানায় শুয়ে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প "মণিহারা" পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লাম। রহস্যময় অদ্ভুত এক গল্প, সময় পেলে পড়ে দেখবেন। ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে মনে হলো কুজিটে যে মূর্তিটা আছে ওটার একটা নাম দেয়া দরকার। যেহেতু মেয়েটির চুলগুলো লতানো এবং তার ভেতর একটি বন্যভাব আছে এজন্যে ঘুমের অতলে তলিয়ে যেতে যেতে ওটার নাম দিলাম বনলতা।

পরদিন সকালে অফিসের কাজ শুরু করলাম এক দুঃসংবাদ শুনে। আমাদের এক্সিকিউটিভ অ্যাকাউন্ট্যান্ট অমল বোস সন্ধের সময় নিউমার্কেট থেকে কাঁচা বাজার করে বাসায় ফেরার সময় পলাশীর মোড়ে ছিনতাকারীর হাতে পড়েছিলেন। ঘড়ি, আংটি, মানিব্যাগ, বাজার সবই তারা নিয়ে গেছে। তবে ভয়ংকর ব্যাপার যেটি সেটি হলো যখন ছিনতাইকারীরা সবকিছু নিয়ে হাসতে হাসতে সলিমুল্লাহ হলের পাশ দিয়ে জহুরুল হক হলের দিকে সরে পড়ছে তখন অমল বাবু রাগে ফেটে পড়ে পেছন থেকে একজনকে জাপটে ধরে চেঁচাতে শুরু করেন। তাদেরই একজন তখন ড্যাগার দিয়ে তাঁর পেটটা আড়াআড়ি চিরে দিয়েছে। ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউ-তে শুয়ে আছেন তিনি এখন, ছয় মাসের আগে কাজে ফিরে আসার কোনও সম্ভাবনা নেই। দুপুরে লাঞ্চ আওয়ারের আগে কোম্পানির এমডি আফতাব সাহেব আমাকে ডেকে পাঠালেন। সেদিন থেকে এক্সিকিউটিভ অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর দায়িত্ব দেয়া হলো আমাকে। নরমাল অবস্থায় এই পোস্ট পেতে কমপক্ষে দশ বছর তো বটেই তার ওপর ভাগ্যের সহায়তাও লাগত। বেতন বেড়ে গেল চারগুণ। শুধু তাই-ই নয় কোম্পানির সব ইমপোর্ট এক্সপোর্টের খবর থাকে এক্সিকিউটিভ অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর হাতে, এজন্যে ক্ষমতাও অনেক। অবশ্য একথা ঠিক যে, অফিসে পাশ করা অ্যাকাউন্ট্যান্ট তখন আমি একাই। সকালে কাজ করছিলাম সার বেঁধে রাখা অনেকগুলো

টেবিলের একটাতে বসে। অথচ বিকেলে কাজ করলাম এক্সিকিউটিভের বিলাসবহুল কামরায়, যেটার দরজার পাশে টুলে পিয়ন বসে থাকে।

অফিস থেকে আমি বাসায় ফিরি হেঁটে, রুট খুবই সিম্পল। অফিস থেকে বেরিয়ে বিমান অফিসের সামনে দিয়ে ডিআইটি হয়ে গুলিস্তান হলের পাশ দিয়ে ফুল বাড়িয়া ফায়ারব্রিগেড হেড অফিস হয়ে আলাউদ্দিন রোডে আসি। কিছুটা সামনেই হাতের ডানে বিখ্যাত হাজীর বিরিয়ানির দোকান। মাঝেমধ্যেই ওখানে বসে বিরিয়ানি খেয়ে বাসায় ফিরি। বাসায় ফিরে কাপড় ছেড়ে গোসল করে খবরের কাগজ নিয়ে বিছানায় বসলাম। মুকুলের মা এক গ্লাস পানি, টোস্ট বিস্কুট, এবং চা রেখে গেছে। কাগজ পড়া শেষ করে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছি এমন সময় মনে পড়ল মূর্তিটার কথা। দুটো মোম ধরিয়ে ঢুকলাম ক্লজিটে। আগের মতই দেয়ালে ঝুলে আছে ওটা। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে মনে হয় ওটার শরীরের ওপর সাপটা মোচড় খাচ্ছে। তাকিয়ে আছি তো আছিই। সম্বিত ফিরে পেলাম মুকুলের মায়ের ডাকে। রান্নার লবণ নেই। ক্লজিট থেকে বেরিয়ে মুকুলের মায়ের হাতে একটা টাকা দিয়ে লবণ আনতে পাঠালাম। আর ঠিক তখনই বিদ্যুৎ চমকের মত একটা কথা মনে হলো। মনে হলো বললে ঠিক বলা হয় না, আসলে মনের ভেতর কে যেন কথা বলে উঠল। মনে হলো কে যেন বলছে "লবণ কেনো আরও লবণ কেনো।"

পরদিন সকালে অফিসে গিয়েও ওই একই কথা মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। ধরা যাক অনেক লবণ কিনে রাখলাম, কিন্তু তারপরে কী হবে? তবে একটা কথা ঠিক, স্বাধীনতার পর থেকেই কোন কোন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম যা আগে প্রায় একই রকম থাকত হঠাৎ হঠাৎ অস্বাভাবিক বেড়ে যেত। কিছু লবণ কিনে রাখলে কেমন হয়, ধরা যাক একশো মণ। বর্ষাকাল চলছে, অফ সিজন। কিনে দেখা যেতে পারে, লস হলে আর কতই হবে। তখন এক সের লবণের দাম ছিল ৬০ পয়সা থেকে ১২ আনা। অফিসের পেটি ক্যাশে সবসময় পঞ্চাশ হাজার টাকা থাকে। সেখান থেকে দুহাজার টাকা উঠিয়ে পাইকার বাজার থেকে একশ' মণ লবণ কিনে অফিসেরই গোডাউনে রেখে দিলাম। সপ্তাহ

দুয়েক পরে হঠাৎ করেই দাম বাড়তে লাগল। আপনারা জানেন সেসময় প্রতি সের লবণ বিশ-বাইশ টাকাতেও বিক্রি হয়েছে। যার কাছ থেকে কিনেছিলাম বিক্রিও করলাম তার কাছেই; কেনা ছিল দু'হাজারে বেচলাম আশি হাজারে। সেই সময় আটাত্তর হাজার টাকা অনেক টাকা। রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেলাম। এই ঘটনার মাস খানেক পরে ঘটল প্রায় একই রকম আর একটি ঘটনা, তবে মুকুলের মা এইবার লবণের পরিবর্তে উল্লেখ করল শুকনো মরিচের কথা। আমি তখন যথারীতি ক্লজিটের ভেতর। বলে রাখা ভাল যে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমার প্রধান একটি কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল মোমবাতি জ্বেলে মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে থাকা। ওই কাজটি না করলে শান্তি পেতাম না মনে। তবে এবার আর অত চিন্তা করলাম না। এমডি সাহেবকে রাজি করিয়ে প্রচুর শুকনো মরিচ কিনে গোডাউন ভরে ফেললাম। তাঁর সাথে আমার ফিফটি ফিফটি লভ্যাংশের চুক্তি হলো। অফিসকে এর মধ্যে জড়িয়ে ফেলার পেছনেও কারণ ছিল। ভেবে দেখেছিলাম এভাবে একা একা যদি টাকা বানাতে থাকি তা হলে সহকর্মীদের কোপানলে পড়তে বেশি সময় লাগবে না। তারা যদি কেউ একবার রক্ষীবাহিনীর কানে তুলে দেয় যে আমি মজুদদার বা কালোবাজারী তা হলে আর দেখতে হবে না। আপনারা সবাই জানেন যে পাঁচ টাকা সেরের শুকনো মরিচ তখন একশ' ষাট টাকা সেরে বিক্রি হয়েছিল।

এঘটনার পর এমডি সাহেবের সাথে আমার গলায় গলায় ভাব হলো। একসাথে লাঞ্চ করি, ডিনার খাই, পার্টিতে যাই। এখন মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে যেসব জিনিস বাংলাদেশে ইমপোর্ট করা হয় ওগুলোর কথা গভীরভাবে ভাবলেই একটা আইটেমের নাম পেয়ে যাই। যদিও একই বাসায় তখনও থাকি এবং মুকুলের মায়ের রান্না খাই তবুও আমার ভেতর একটা বড় পরিবর্তন এসে গেল। মেয়েদের প্রতি হয়ে পড়লাম ভীষণ দুর্বল। আজে বাজে মেয়েদের প্রতি যতখানি না হলাম তার চেয়ে বেশি হলাম ভদ্রঘরের মেয়েদের প্রতি। যেকোন উপায়ে তাদের বিপথগামী করা আমার জন্যে নেশার মত হয়ে উঠল। আমার প্রথম শিকার হলো আমাদের অফিসের রিসেপশনিস্ট মেয়েটি। ভদ্র ঘরের

গ্র্যাজুয়েট-মেয়ে, যুদ্ধের আগে ওরা ছিল যথেষ্ট ধনী পরিবার। এখন অভাবে পড়ে চাকরি করছে, ভাল একটা বিয়ের আশাতে আছে। কুরবানির ঈদের চারদিনের ছুটি এই মেয়েকে নিয়ে বক্সবাজারে কাটিয়ে আসলাম। এরপর নজর দিলাম এমডি সাহেবের পরিচিত লোকদের বৌ-ঝিদের দিকে। তবে এতেই আমার শান্তি হলো না। আমি চাইলাম আমার পরিচিত পুরুষেরা সবাই আমার মত চরিত্রহীন হোক। শুরু করলাম অফিস থেকেই। এমডি সাহেবকে বোঝালাম অফিসের অন্যান্য কর্মচারীদেরকেও লাভের একটা হিস্যা দেয়া দরকার। না হলে, কে কখন কোথায় ঝামেলা বাধাবে কে জানে। আসলে এসব বাকওয়াজ, মূল উদ্দেশ্য ওদেরকে আমার কাছাকাছি নিয়ে আসা। ছুটির দিনগুলোতে সহকর্মীদের নিয়ে মদ-জুয়ার আড্ডা বসিয়ে দিতাম হোটেল পূর্বাণী আর ইন্টারকনে (বর্তমানে শেরাটন)। ভদ্রঘরের শিক্ষিত বিবাহিতা-অবিবাহিতা মেয়েরা আমাদের সঙ্গ দিত। এইসব সহকর্মীদের স্ত্রীরা সচ্ছলতার মুখ দেখল ঠিকই তবে ঘরের শান্তি হারাল চিরতরে। কলিগদের অনুপস্থিতিতে তাদের বাসাতেও আমি যেতে শুরু করলাম নিয়মিত।

এত কাণ্ডের ভেতরেও রাতে বাসায় ফিরলেই আমি মোম জ্বেলে মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়াতাম, মাঝে-মাঝে একটা গোলাপ বা গন্ধরাজ ফুল রাখতাম ওটার পায়ের কাছে। তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে একটি প্রশ্ন সবসময়ই আমার মনে উঁকি দিত মূর্তিটি কীসের বা ওটা ওখানে রাখলই বা কে? এরই মধ্যে আমার ভেতর আরও একটা পরিবর্তন লক্ষ করলাম। আমার হাত-পা, গাল ফুলে যেতে লাগল। দেখলে মনে হত ওই জায়গাগুলোতে পানি জমেছে। চোখের নীচের মাংসপিণ্ডগুলো দুটো পোঁটলার মত ঝুলতে লাগল। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে মনে হয় সামনে রাবণের মা দাঁড়িয়ে আছে। অল্প পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে উঠতে লাগলাম। আগে একঘুমে রাত পার করতাম। এখন ঘুমালেই ভীষণ নোংরা সব স্বপ্ন দেখি আর ঘেমে নেয়ে উঠি, সারা রাতে ঘুম হয় ছাড়া ছাড়া। সবসময় অস্থির লাগে, মেজাজ চড়ে থাকে সপ্তমে। যেহেতু আমার অনেক টাকা এবং অনেকেই আমার সাহায্যেই টাকা বানিয়েছে সেহেতু কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। তবে ভিখিরী,

রিকশাঅলা, ফেরিঅলা, হোটেলের বয়বেয়ারাদের সাথে আমি যে ব্যবহার করতে লাগলাম তা মানবেতর। তবে ভাল-মন্দ জ্ঞান তখনও আমার সম্পূর্ণ লোপ পায়নি।

তখন ফাগুন মাস চলছে। রোববার সকাল এগারোটার দিকে বাসা থেকে বের হয়েছি, ঢাকা ক্লাবে এমডি সাহেবের সাথে মেজবানীর দাওয়াতে যাওয়ার জন্যে। এমন সময় নারায়ণ আমাকে ডেকে তার দোকানে বসা এক হিন্দু ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। পঞ্চাশের কছাকাছি এই ভদ্রলোককে কৌন্দর্পকান্তি বললেও কম বলা হয়। চওড়া কপালের ওপর ঢেউ খেলানো পাতলা চুল, টিকালো নাক, ফর্সা টকটকে গায়ের রঙ, ফিনফিনে ধূতি পাঞ্জাবী পরনে, পায়ে পামশু, গলায় চন্দন কাঠের ছোট মালা, কপালে চন্দনের টিপ। নারায়ণ বলল, ভাইয়া, উনার নাম জীবন চৌধুরী, খুলনা থেকে এসেছেন। এই বাড়িতে বাস করে এমন কারও সাথে কথা বলতে চান।'

যদিও নারায়ণের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে একজন অপরিচিত লোকের সাথে ফালতু আলাপ করার কোন ইচ্ছা আমার ছিল না তবুও স্বীকার করতেই হবে ভদ্রলোককে দেখে আমি একরকম মুগ্ধই হয়েছিলাম। ভাবলাম দু একটা কথা বললে ক্ষতি কী। খুলনা তো আর নারায়ণগঞ্জ না; এত দূর থেকে যখন এসেছে, বলিই না দুয়েকটা কথা। মেজবানী শুরু হতে এখনও ঘণ্টা খানেক বাকি। স্রেফ ভদ্রতার খাতিরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জীবন চৌধুরীকে বললাম, 'চলুন না বাড়ির ভেতরে আমার ঘরে গিয়ে বসি?'

উত্তরে জীবন চৌধুরী বলল, 'দেখুন আমি সময়ের মূল্য বুঝি। আপনি যখন বাইরে যাওয়ার জন্যে বের হয়েই পড়েছেন তখন আর ফিরে কী হবে। তারচেয়ে বলুন আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন। সেদিকে যেতে যেতেও তো কথা বলা যায়, অবশ্য আপনার যদি কোন অসুবিধা না থাকে।'

'না, না, অসুবিধা আর কী, দৈনিক বাংলার মোড়ে বারোটার দিকে আমাদের কোম্পানির এমডি সাহেবের সাথে দেখা করতে হবে। ওখান

থেকে আমাদের একজায়গায় যাওয়ার কথা।'

'তা হলে চলুন একটা রিকশা নিয়ে ওদিকেই যাই।'

রাস্তায় যানবাহন নেই বললেই চলে। শেখ সাহেব চতুর্থ সংশোধনী দিয়ে সব দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও খবরের কাগজের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। গাঢ় সবুজ রঙের উর্দিপরা রক্ষীবাহিনীর গাড়ি মাঝে-মধ্যে হুস হাস করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ফুলবাড়িয়া রেলগেট (সেই সময় ফুলবাড়িয়াতে বাসস্ট্যাণ্ডের জায়গায় একটি রেলওয়ে স্টেশন ছিল) পার হয়ে রেলওয়ে হাসপাতালের কাছে রিকশা যখন ডানদিকে মোড় নিল জীবন বাবু তখন মুখ খুললেন :

'লিলিথ হাউসে আপনি কতদিন আছেন?'

'কী হাউস বললেন? "লিলি" হাউস?'

'ভাই, লিলি হাউস না, "লিলিথ হাউস"।'

'এ আবার কী ধরনের নাম? জীবনে শুনিনি। ওই বাড়ির যে একটি নাম আছে তা-ই তো জানতাম না।'

'না জানাই স্বাভাবিক, নামফলকের মার্বেল স্ল্যাবটি অনেক আগেই তুলে ফেলা হয়েছে। তা ছাড়া "করিম্যা" কমিশনার যে বাড়ির মালিক সে বাড়ির যদি নাম দেয়া হয় তা হলে সেটি হবে "করিম কুটির"।'

'জীবন বাবু, একটা প্রশ্ন করলে কিছু মনে করবেন না তো?'

'দেখেন আমি একই সাথে খুলনার কালিঘাট হাইস্কুলের হেডমাস্টার এবং মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক। রোজই বিভিন্ন মানুষের অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে একাধিক প্রশ্ন করেন।'

'আপনি বাড়িটা সম্পর্কে এত কিছু জানলেন কী করে? আমার সাথে কথাই বা বলতে চান কেন?'

'প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলছি, এই বাড়ি এক সময় আমার ঠাকুরদার ছিল। আমার ছেলেবেলা কেটেছে এখানেই। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হলো, নিদারুণ এক দুর্ঘটনার কারণে এই বাড়িটি আমাদের ছেড়ে যেতে হয়েছিল। স্কুলের একটি কাজে ডিজি অফিসে এসেছিলাম। আজকেই খুলনা ফিরে যাব সন্ধের লঞ্চে। নবাবপুর রোডে এক হোটেলে উঠেছি, ভাবলাম এত কাণ্ড যে বাড়িতে ঘটল সেটা একবার দেখে আসি, ওখানে

যদি কেউ এখন বাস করে তা হলে তার সাথেও একটু আলাপ করা যাবে।'

এই লোকের বলার আর্ট দুর্দান্ত। যাকে বলে টু দ্য পয়েন্টে কথা বলে এই মানুষটি। এদেশে একশ' জনের ভেতর নিরানব্বই জনের এই গুণটির অভাব আছে। তার কথা শুনতে আমার ভাল লাগছে। রিকশা গুলিস্তান সিনেমা হল পার হচ্ছে, আর বড়জোর পাঁচ-সাত মিনিট লাগবে দৈনিক বাংলার মোড়ে পৌঁছতে। ভেবে দেখলাম এঁর কাছ থেকে পুরো ঘটনাটা শুনতে হবে। মূর্তিটার ব্যাপারে হয়তো এঁর কাছ থেকেই কিছু জানা যাবে। মতিঝিল থেকে স্টেডিয়ামে ঢোকার জন্যে যে গেটটি আছে তার পাশেই একটা ভাল রেস্টুরেন্ট ছিল, এখনও আছে। জীবন বাবুকে নিয়ে সেখানে গেলাম। একে সাপ্তাহিক ছুটির দিন তার ওপর লাঞ্চ আওয়ার শুরু হতে এখনও বেশ দেরি। রেস্টুরেন্ট ফাঁকা। সমুচা এবং দুকাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে দুজনে থিতু হয়ে বসলাম। বাবুকে অনুরোধ করলাম পুরো ঘটনাটা খুলে বলতে। চায়ে চুমুক দিয়ে শুরু করলেন জীবন বাবু, 'আপনাকে গোড়া থেকেই বলি। আইজ্যাক কোহেন নামের এক ইহুদী ১৮৫৫ সালে এই বাড়িটি বানিয়েছিল। অনেকেই এটাকে আর্মেনীয় ধাঁচের বাড়ি মনে করলেও এটার স্থাপত্যশৈলী আসলে সিরীয়। তখন দেশে চলছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালেস তার কুখ্যাত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন চালু করার ফলে দেশে বড়বড় সব আয়েশী জমিদার সৃষ্টি হয়েছিল। এইসব জমিদারদের বখে যাওয়া ছেলেদের চড়া সুদে হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার দেয়াই ছিল কোহেনের মূল ব্যবসা। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের ঘোড়দৌড়ের বুকি'র কাজও করত সে। কোহেনের এদেশে এসে ঘাঁটি গাড়ার পেছনে ছোট্ট একটি ইতিহাস আছে। লণ্ডনে বসে ইংরেজরা দেখল কোম্পানির যেসব অফিসার ইণ্ডিয়াতে চাকরি করছে তারা আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যাচ্ছে। কথাটি খুবই সত্যি। এতবড় এশ্বর্যশালী একটি ভূখণ্ডের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা যদি ইংল্যাণ্ডের একটি কোম্পানি হয় তা হলে এটা খুবই স্বাভাবিক যে কোম্পানির অফিসার-কর্মচারীরা অঢেল সম্পদের একটি অংশ তাদের পকেটে পুরবে। তখন কোম্পানির প্রায় সবাই যে যেভাবে পারে ব্যবসা-

বাণিজ্য করে অথবা দুর্নীতি করে বা নীল চাষ করে দুহাতে পয়সা লুটছে। এরকম অবস্থায় দলে দলে ইংরেজ ভাগ্যান্বেষী এদেশে আসতে থাকে। তবে একথা ঠিক যে তাদের অনেককেই নিঃস্ব হয়েও এখান থেকে ফিরতে হয়েছে। তা ছাড়া কোহেনের ব্যাপারটি ভিন্ন, সে হয়ে উঠেছিল একটি জীবন্ত কিংবদন্তী, কেননা সে টাকা বানিয়েছিল অন্যভাবে। ব্রিটিশ নাগরিক হলেও তার বাবা-ঠাকুরদারা ছিল সিরিয়ার অধিবাসী। সিরিয়ায় কিছু ইহুদী আছে যারা অত্যন্ত প্রাচীন কিছু অপদেবতার পুজো করে। এদেরকে কাবালিস্টও বলতে পারেন। তেরো থেকে ষোলো শতকের মধ্যে চরম বিকাশ ঘটে এদের, যদিও এই কাল্টের গুরু রাব্বী আকিবা প্রাচীন সিডন নগরীতে এর সূচনা ঘটান আনুমানিক ৭০ খ্রিস্টাব্দে। মূলধারার ইহুদী, খ্রিস্টান উভয় দলই এদেরকে শয়তানের পূজারী মনে করে। মধ্যযুগে এদের অনেককে প্রকাশ্যে পুড়িয়েও মারা হয়েছে। সাফির যাযিরা ও যোহর নামের দুটো দুষ্প্রাপ্য এবং গোপন কিতাবে এদের পুজোর সব আচার-অনুষ্ঠানের কথা বিস্তারিত লেখা আছে। প্রাচীন কাল থেকেই ইহুদীরা অর্থলোভী চশমখোর হিসাবে সারা দুনিয়ায় পরিচিত। এরা বিশ্বাস করে কিছু কিছু প্রাচীন অপদেবতা আছে যাদের নৈবেদ্য দিলে প্রচুর অর্থলাভ ঘটে। আমি ধারণা করেছি কোহেনও ওই দলেরই একজন। তবে সে সবগুলো পরিচিত অপদেবতা বাদ দিয়ে সম্ভবত পুজো করত একজন অপদেবি'র। এই অপদেবি'র নাম হলো লিলিথ। দেবির শ্রীচরণে পুরো বাড়িটিই সে উৎসর্গ করে, নাম দেয় "লিলিথ হাউস"। বাড়িটি তৈরি করে কোহেন এটার দোতলায় একটি বড় হলঘরকে বানাল তার রঙ মহল। সেখানে মদ, জুয়া, বাইজি নাচ, এবং আনুষঙ্গিক যত বাজে কাজ আছে সবই হত। ঝামেলা শুরু হলো এখান থেকেই। আজকাল বারবণিতারা সমাজের বোঝা, কিন্তু তখনকার প্রেক্ষাপট ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। এরা ছিল সমাজের মান্যগণ্য বিত্তশালী সম্প্রদায়। রবীন্দ্রনাথ এদেরকে উল্লেখ করেছেন "নগরীর নটী" বলে। ঢাকার সেরা এক নটী কনকলতার নিয়মিত খদ্দের ছিল কোহেন। সপ্তাহে দুদিন লিলিথ হাউসে সে তাকে আনবেই। নটীও কোহেনকে খদ্দের হিসেবে না দেখে অনুরাগী হিসেবেই

দেখতে শুরু করল। হাজার হলেও সে শ্বেতাঙ্গ এবং প্রচুর বিত্তের মালিক। সেকালে নামকরা নটীদের বাড়িতে এনে মজমা বসানো আভিজাত্যের অন্যতম প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিক্রমপুরের এক অল্পবয়সী জমিদার একবার কোহেনের অতিথি হয়ে লিলিথ হাউসে কনকলতার সান্নিধ্যে এসেছিল। এরপর থেকে কনকলতাকে পাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠল সে। ইচ্ছে, কনকলতাকে নিয়ে বিক্রমপুরে নিজের কাছে রেখে দেবে। কিন্তু কোহেন তো সেটা মেনে নিতে পারে না। একদিন এ নিয়ে গণ্ডগোল চরমে উঠল, বিক্রমপুরী তাকে শুয়োরখেকো বিদেশী সাদা কুত্তা বলে সবার সামনে গালি দিয়ে বসল। এরপর, কোহেন ঢাকার পুলিশ সুপার অ্যাণ্ড্রু ম্যাথারসকে ধরে বিক্রমপুরীকে তিনমাস জেলে আটকে রাখল। নববই দিনের জেল-জীবনে জমিদার প্রতিজ্ঞা করল ইহুদী সুদখোরের শেষ দেখে ছাড়বে। বিক্রমপুরীর কপাল ভাল, ইহুদীর শেষ দেখার জন্যে তাকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। ১৮৫৭ সালে শুরু হলো সিপাহী বিদ্রোহ। ঢাকার কিছু সিপাহীকে টাকা খাওয়াল বিক্রমপুরী। একরাতে লিলিথ হাউসে হানা দিল বিদ্রোহী সিপাহীরা। দোতলার রঙমহলে কোহেন তখন কনকলতার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। রঙমহলের দামি ইরানী গালিচার ওপর দুজনকেই জবাই করে তারা। কোহেনের হাত, পা, জিহ্বা, পুরুষাঙ্গ, ইত্যাদি কেটে টুকরো টুকরো করে আগুন লাগিয়ে দেয় ঘরটিতে। এরপর বহু বছর বাড়িটি খালি পড়েছিল। ১৯২১ সালে আমার ঠাকুরদা অশ্বিনী কুমার চৌধুরী বাড়িটি নিলামে কিনে নেন। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার কারণে ঢাকার নবাবেরা ইংজে সরকারের ওপর নাখোশ। তাদেরকে খুশি করতে ঢাকাতে তখন তারা সরকারী অর্থায়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরি করে দিচ্ছে। নগরীর চেহারা, গুরুত্ব বদলাতে শুরু করেছে। সরকারী হাসপাতাল, জেল এবং পুলিশ বিভাগে খাবারদাবার, এটা সেটা সাপ্লাই করে ঠাকুরদা তখন অনেক টাকার মালিক। ঠাকুরদারা খুলনার বাগেরহাটের লোক, তাঁর বাবা ছিলেন স্থানীয় জমিদারের নায়েব। তখন পরিবারগুলো প্রায় সবই যৌথ ছিল। ঠাকুরদা আমাদের নিয়ে এলেন এই বাড়িতে। আমি ভর্তি হলাম আর্মানিটোলার একটি

মিশনারী স্কুলে। বাবা ইসলামপুরে বড় একটি দোকান কিনে কাপড়ের পাইকারী কারবার শুরু করলেন, ঠাকুরদা শুরু করলেন নিলামে ওঠা বাড়িঘর, জমিজমা কিনে সেগুলো বেচে দেয়ার ব্যবসা। পয়সা আসতে লাগল হু হু করে। সেই সাথে আসতে শুরু করল সমস্যাও। ঠাম্মা মারা গেলেন তিন দিনের কী এক জ্বরে। কোলকাতা থেকে অনেক খরচ করে আইস বক্সে ভরে পেনিসিলিন অ্যাম্পুল আনা হলো। তবে সেই পেনিসিলিন এসে যখন পৌঁছাল তখন ঠাম্মা ধরাধাম ত্যাগ করেছেন। এর পরপরই ঠাকুরদা বদলে যেতে লাগলেন। প্রতিরাতে বাড়ি ফিরতে লাগলেন পাঁড় মাতাল হয়ে, সবসময় রেগে থাকতেন, কথা বলতেন চিৎকার করে, ব্যবহার করতেন সদরঘাটের কুলিদের ভাষা। বাড়ির লোকের কাছে তিনি হয়ে উঠলেন মূর্তিমান দুঃস্বপ্ন। এরই মধ্যে আমার মায়ের গর্ভপাত হলো যখন তিনি সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা। মা'র এখন তখন অবস্থা দেখে বাবা খুলনা থেকে আমার এক বিধবা মাসীকে এনে রাখলেন তাঁর সেবা শুশ্রূষার জন্যে। খুব অল্প বয়সে বিধবা হওয়া এই মাসি তখন পূর্ণ যুবতী। একরাতে মা'র অবস্থা বাড়াবাড়ি ধরনের খারাপ হলে বাবা মাসিকে আমার কাছে রেখে মাকে নিয়ে গেলেন পুলিশ হাসপাতালে। ঠাকুরদা যথারীতি মাতাল হয়ে বাসায় ফিরলে মাসি তাঁকে খাবার দিতে গেলেন। ফিরলেন অনেক পরে আলুথালু হয়ে কাঁপতে কাঁপতে। ঠাকুরদা তাঁর সর্বনাশ করেছেন। সেই রাতে মাসি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করলেন এবং ভোরের দিকে হাসপাতালে মারা গেলেন মা। সকালে মায়ের লাশ নিয়ে বাসায় ফিরে বাবা দেখলেন ঠাকুরদা সেখানে আরেক নাটক সাজিয়ে বসে আছেন। দুজন কনস্টেবল সহ লালবাগ থানার দারোগা মাসির লাশ সামনে শুইয়ে রেখে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। মাসির মৃত্যুর জন্যে ঠাকুরদা বাবাকেই দায়ী করেছেন। বাবা দারোগাকে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করেননি। তিনি জানতেন দারোগাকে ঠাকুরদা আশাতীত বকশিশ দিয়েছেন। তিনি ওই যে থানায় গেলেন আর ফিরলেন না। বিচারে দশ বছরের জেল হলো তাঁর। ফুসফুসে পানি জমে জেলখানাতেই মারা যান ছ'মাসের ভেতর। এরপরে ঠাকুরদা এক বছর বেঁচে ছিলেন, তবে তা না থাকার মতই। বিচিত্র এক

রোগে তাঁর হাত, পা, মুখ সব ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছিল। বিছানা থেকে উঠতে পারতেন না। শুয়ে থাকতে থাকতে তাঁর সারা গায়ে বড় বড় সব ঘা হয়েছিল। লোকে বলত কেউ তাকে বাণ মেরেছে, বাণ মারা রোগীর কোন চিকিৎসা নেই। কথা বলতে পারতেন না, তরল খাবার খেতেন এবং সারাদিন শুধু গোঁ গোঁ আওয়াজ করতেন। বোঝা যেত অসহ্য কষ্ট ভোগ করছেন। রাজ্যের যত গরীব, অপদার্থ আত্মীয়-স্বজনে বাড়ি ভরে থাকত। দেখতে দেখতে চিকিৎসার নামে ঠাকুরদার টাকা-পয়সা ব্যবসা-বাণিজ্য সব ফুঁকে দিল তারা। শেষের দিকে না খেতে পেয়ে বিনা চিকিৎসায় ধুঁকে ধুঁকে মারা যান ঠাকুরদা। এরপর আমার মামারা আমাকে খুলনায় নিয়ে যান। আমি আজ অবধি ওখানেই আছি।

আপনারা এই বাসায় উঠেছিলেন কত সালে? আপনার বয়সই বা তখন কত, এত কিছু মনে থাকলই বা কীভাবে আর জানলেনই বা কীভাবে?

ঠাকুরদা বাড়িটা কিনে ঠিকঠাক করেন প্রথমে। আমরা উঠি ১৯২৫ সালের দিকে। আমি তখন ক্লাস থ্রি'র ছাত্র। আমার স্মরণশক্তি ভাল। তা ছাড়া এই বাড়িতে ওঠার পরপরই আমাদের জীবন আমূল বদলে যায়, ছারখার হয়ে যায় পুরো পরিবার। ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে হয়েছে ওখানে অশুভ একটা কিছু আছে। বহু বছর ধরে তিলতিল করে ওটার ব্যাপারে আমি তথ্য সংগ্রহ করেছি।

আচ্ছা বলুন তো আপনার দাদা ঠিক কোন ঘরটায় থাকতেন?

ঠাকুরদা প্রথমে থাকতেন দোতলার রঙমহলে। ঠাম্মা মারা যাওয়ার পর নীচতলায় চলে আসেন। বাড়িটিতে ঢুকতেই ডানদিকে ঘেরটোপ বারান্দাঅলা যে ডায়মণ্ড শেপ্‌ড রুমটা আছে তার পরের ছোট কামরাটিতে। মারাও যান ওখানেই। ঘরের কথাই যখন উঠালেন তখন বলি আশ্চর্যের ব্যাপার কী জানেন, ঠাকুরদা তাঁর ঘরের ক্লজিটের কাছে কখনও কাউকে যেতে দিতেন না। অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকা অবস্থাতেও অনেকবার তাঁকে দেখেছি ক্লজিটের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে। ওদিকে কেউ যাওয়ার চেষ্টা করলে গোঁ গোঁ চিৎকার জুড়ে দিতেন। অনেকেই ভেবেছিল ঠাকুরদা ওখানে সোনার মোহর,

চাঁদীর টাকা এইসব ঘড়াভর্তি করে রখেছেন। তিনি মারা গেলে ক্লজিট খুলে দেখা গেল সেখানে কিছুই নেই, সম্পূর্ণ খালি।

পরিষ্কার বুঝতে পারলাম জীবন বাবুর ঠাকুরদার ঘরটিই বর্তমানে আমার ঘর। আরও মনে হলো জীবন বাবু আমার সম্পর্কে কিছুটা হলেও জানেন এবং ইচ্ছে করেই এসব শোনাচ্ছেন, কিন্তু কেন? আমি সরাসরি তাঁকে বললাম, 'এত কথাই যখন বললেন তখন আরও দুটি প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিন। লিলিথ সম্পর্কে আমাকে আরও একটু বিস্তারিত বলেন, তা ছাড়া বাড়ি বয়ে এসে আমাকেই বা এত কিছু কেন শোনাচ্ছেন সেটাও জানতে চাই।'

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটাই আগে দেই। আমার ঠাকুরদা মারা যাওয়ার পর ওই বাড়িটি খালি পড়েছিল অনেকদিন। চল্লিশের দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ওখানে ব্রিটিশ আর্মির লোকেরা থাকত। ৪৭-এ দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান সরকারের কাস্টমস্ বিভাগের মালখানা বানানো হয় ওটাকে। ৭১-এর পর সরকারের পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হওয়া একজন রেওয়ে অফিসারের পরিবারের সদস্যদের ওটা দেয়া হয়। তবে ওই পরিবারকে স্থানীয় কমিশনার বাড়িটিতে উঠতে দেয়নি। বলতে গেলে আমরা বিদায় হওয়ার পর স্থায়ীভাবে একমাত্র আপনি এবং আরও চারজন ওটাতে থাকছেন। ধার্মিক হিন্দুদের ওপর সাধারণ হিন্দুদের শ্রদ্ধা আজও আছে। এখানে যাঁরা থাকেন তাঁদের ব্যাপারে নারায়ণকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি একমাত্র আপনিই এখানে একটানা অনেকদিন আছেন এবং অল্প সময়ে প্রচুর অর্থ আয় করলেও এই বাড়িটি ছেড়ে যাননি। আমার সন্দেহের কথা আগেও বলেছি। এই বাড়ি ঘিরে একটি রহস্য আছে। সারা জীবন ধরে সেই রহস্যের কিনারা করার চেষ্টা করছি। কে জানে হয়তো আপনার মাধ্যমেই ওটার সমাধান হবে।

এবার লিলিথে'র প্রসঙ্গে আসি। দুনিয়ায় অতি প্রাচীন যত অপদেবি আছে তার মধ্যে লিলিথই সবচেয়ে পুরনো। এর পুজো মানুষ প্রথম শুরু করে খ্রিস্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগে। পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন গল্প সুমেরিয়ান উপাখ্যান গিলগামেশ-এর ভূমিকাতে একে উল্লেখ করা

হয়েছে "হৃদয়হরণকারী সকল ইন্দ্রিয়সুখের উৎস হিসেবে"। বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ব্যাবিলনীয় ধর্মগুলোতে এর নাম কিসকীলিলাকে। হিব্রু বাইবেলের বুক অভ আইজেয়াহ্ এবং তালমুদে এর থেকে শত হাত দূরে থাকতে বলা হয়েছে। মেসোপটেমীয় উপাখ্যান লিলিথকে উল্লেখ করা হয়েছে ভয়ঙ্কর পাষণ্ড ব্যাবিলনীয় যুদ্ধের দেবতা এনলিল-এর স্ত্রী হিসেবে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ইজরায়েল-জর্ডান বর্ডারে কামরান ভ্যালির এগারোটি গুহায় পাওয়া এযাবৎকালে বাইবেলের সবচেয়ে পুরনো সংস্করণ ডেড সী স্ক্রল-এ পর্যন্ত এর উল্লেখ আছে। ডেড সী স্ক্রল এত বেশি গোপনীয় যে এ পর্যন্ত শুধুমাত্র দশজন স্কলার ওটাকে পড়ে দেখেছেন। ব্যাবিলনের ধ্বংসাবশেষের ভেতর থেকে অধ্যাপক বার্নি খ্রিস্টপূর্ব দুহাজার বছর আগের একটি মূর্তি পান যেখানে কিউনিফর্ম লিপিতে লেখা ছিল "রাতের রানী লিলিথ তার বোন এরেশকিগালকে নিয়ে ব্যাবিলনের সমস্ত বেশ্যালয় নিয়ন্ত্রণ করে।" আপনি হয়তো জানেন যে, হাজার হাজার বছর আগে প্রাচীন ব্যাবিলনে প্রকাণ্ড সব বেশ্যালয় গড়ে উঠেছিল। মানব সভ্যতায় প্রথম এবং সবচেয়ে বড় "সিন সিটি" ওটাই। লিলিথের পুজো সেসময় এত বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে তা প্রধান দেবী ইসথারকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কামরান ভ্যালিতে পাওয়া ডেড সী স্ক্রু-এর একটি অধ্যায় "বুক অভ প্রভার্ব"-এ বলা হয়েছে "লিলিথের মন্দিরের প্রবেশ দ্বার হলো নিশ্চিত মৃত্যুর প্রবেশ দ্বার, সে মন্দির থেকে সে [লিলিথ] যাত্রা করে শেওলের উদ্দেশে। সেখানে যে একবার প্রবেশ করেছে সে আর কোনদিনই ফিরতে পারবে না। এবং যারা তার আরাধনা করে তাদের স্থান হবে নরকের শেষ ধাপে।" লিলিথ হলো নিষিদ্ধ ইন্দ্রিয়সুখ, বিকৃত যৌনক্রিয়া, মদ, জুয়া, এবং বীভৎস অসুখের সবচেয়ে প্রাচীন একচ্ছত্র দেবী। বার্নি যে মূর্তিটা পেয়েছিল তাতে দেখা যায় উদ্ভিন্নযৌবনা লিলিথ একটি মোটা সাপকে জড়িয়ে ধরে আছে; সাপের মুখটি তার ডান কাঁধের ওপর এবং দুদিকে দুটো পেঁচা যাদের পা তরুণী মেয়েদের মত। লিলিথের পুজো করা খুবই সহজ। মূর্তির দুদিকে দুটো মোমবাতি সন্ধের সময় জ্বালালেই লিলিথ তাকে পূজারী হিসেবে গ্রহণ করে। এরপর পূজারীর ভাল-মন্দের দায়িত্ব তার।

ভীষণ ক্ষতিকারক বলে বছরের পর বছর ধরে ইহুদী এবং খ্রিস্টধর্মগুরুরা লিলিথের সব মূর্তি ধ্বংস করে ফেলে। ১৮২৭ সালে অধ্যাপক বার্নির লিলিথের মূর্তিটি আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত আধুনিক দুনিয়ার মানুষ জানতই না লিলিথ দেখতে কেমন। তিনি প্রাচীন ব্যাবিলনের ধ্বংস হয়ে যাওয়া মন্দিরের অত্যন্ত সরু একটি চেম্বারের ভেতর দেয়ালে আটকানো অবস্থায় দেখতে পান ওটাকে। তবে একথা শোনা যায় যে সচরাচর কোন পূজারীকেই লিলিথ দুবছরের বেশি বাঁচতে দেয় না, যদি না অন্যকেউ ওই সময়ের ভেতর স্বেচ্ছায় তাকে পুজো দেয় এবং আগের পূজারী চিরতরে লিলিথকে ত্যাগ করে সৎ-জীবন বেছে নেয়। কোহেন সে অর্থে কিছুটা বেশিদিনই বেঁচে ছিল বলতে হবে। আমি যেটা বুঝতে চেষ্টা করছি তা হলো এই বাড়িটিতে লিলিথের প্রভাব এত স্থায়ী হলো কী করে?

জীবন বাবু, আপনার রহস্যের সমাধান এখনই করে দিচ্ছি। আমি ধারণা করছি আইজাক কোহেন তার সিরীয় কাবালাগুরুদের কাছে থেকে আসল মূর্তিটির একটি হুবহু প্রতিকৃতি এখানে নিয়ে আসে। লিলিথের মূর্তিটা ভুলেও যাতে কারও হাতে না পড়ে সেজন্যে ছোট্ট একটি মন্দির বানিয়ে গোপনে ওটাকে পুজো করতে শুরু করে সে। বাইরে থেকে মন্দিরটিকে একটি ক্লজিটের রূপ দেয়, যাতে করে কেউ কোন সন্দেহ না করে। কোহেন হঠাৎ করে খুন হওয়ায় মন্দিরটি যা তাই রয়ে যায়। এরপর আপনার দাদা যেভাবেই হোক খুঁজে পান ওটাকে। সম্ভবত বাড়ি ঠিকঠাক করার সময় ক্লজিটের ভেতর একটি তক্তা দিয়ে মূর্তিটা আড়াল করা ছিল। ওটা হয়তো তিনিই লাগিয়ে থাকবেন।

এই প্রথম জীবন বাবুকে বিচলিত মনে হলো, তার কপালে দেখা দিল চিকন ঘাম। বুকচেরা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন তিনি। ঝাড়া তিন মিনিট কোলের ওপর ফেলে রাখা হাতদুটোর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। সারা জীবন যে রহস্যকে তিনি তাড়া করে ফিরছেন তার সমাপ্তি ঘটেছে।

এরপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। জীবন বাবু ফিরে গেলেন খুলনায় এবং আমি

ঢাকা ক্লাবে মেজবানী খেয়ে, দু'তিন ঘণ্টা ফ্ল্যাশ খেলে সন্ধের পর ফিরলাম লিলিথ হাউসে। বাসায় ঢুকতে যাব এমন সময় চোখ গেল আমার ঘরের খড়খড়ি দেয়া জানালার দিকে, মনে হলো ভেতরে খুব হালকা আলো জ্বলছে। দেখলাম দরজা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে, তালা খোলা। মুকুলের মা ঘর পরিষ্কার করে আলো জ্বেলে, অন্ধকার করে নয়। আস্তে করে দরজা ফাঁক করে উঁকি দিলাম ভেতরে। দেখলাম ক্লজিটের দরজা খুলে বের হয়ে আসছে মুকুলের মা। হাতে মোমবাতি।

পরিশিষ্ট আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ছাত্র। আমাদের বিভাগের এক অধ্যাপক ঢাকা হেরিটেজ শিরনামে একটি বড় বই লিখেছিলেন। বইটিতে পুরনো ঢাকার বিভিন্ন প্রাচীন বাড়ির ছবিসহ বর্ণনা ছিল। বইটি লেখার সময় তিনি এক কাণ্ড করলেন। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে পাঠকদের অনুরোধ করলেন কোন বিশেষ বাড়ি সম্পর্কে কারও কাছে তথ্য থাকলে তা তাঁকে লিখে জানানোর জন্যে। বিজ্ঞাপন ছাপা হওয়ার পর পাঠকেরা সারের কাছে প্রচুর চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিগুলো পড়ে বাছাই করার দায়িত্ব সার আমাকে দেন। এরকমই অনেক চিঠির ভেতর উপরের লেখাটি আমি দেখতে পাই। লেখক তাঁর লেখার শেষের দিকে সারকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর লেখা যেন ছাপা হয় কেননা তাঁর দাবি ছিল তাঁর প্রতিটি কথা সত্যি। চিঠিটা আমি বাতিল করে দেই, কেননা, আমি জানতাম সার একজন ইতিহাসবেত্তা এবং প্রখর যুক্তিবাদী। এই দীর্ঘ বর্ণনা পড়লে তিনি বিরক্ত তো হবেনই, উল্টো আমার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন। তবে সারকে না জানালেও রহস্যপ্রিয় মানুষকে জানাতে দোষ কী? লেখক সত্যি বলছেন না বানিয়ে বলছেন সেটার বিচার তাঁরাই করুন।

মুহম্মদ আলমগীর তৈমূর

পাহাড়ি পিশাচ

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে আচমকা এক আদেশজারি হয় আমার উপর। কাপ্তাই এফ.ডি.টি.সি.তে পনেরো দিনের ট্রেনিঙে যেতে হবে। তখন আমার কর্মস্থল পাশউড বাগান বিভাগ, বান্দরবানে। যোগদানের তারিখটা বার বার ক্যালেণ্ডারের সাথে মিলিয়ে দেখি, কোন রকম ভুল আছে কিনা। কিন্তু না, কোন ভুল নেই।

আসলে অর্ডারটা যখন আমি পাই তখন হাতে সময় ছিল খুব কম। বান্দরবানে সদর থেকে দুর্গম থানচিতে কোনকিছু পৌছতে হরহামেশা এমনই ঘটে। তাড়াতাড়ি গোছগাছ করে রওনা দিই বান্দরবানের উদ্দেশে। একদিন পর সেখান থেকে যাত্রা শুরু হয় কাপ্তাইয়ের দিকে।

কাপ্তাই জল-বিদ্যুৎ বাঁধ ও কৃত্রিম হ্রদের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার সাধ পূরণ হতে যাচ্ছে বলে আমার আর তর সইছিল না। সবকিছুতেই ছিল তাড়াহুড়ো।

বান্দরবান থেকে কাপ্তাই উত্তর দক্ষিণে দূরত্ব বেশ কাছাকাছি হলেও, তখন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু ছিল চট্টগ্রাম শহর ছুঁয়ে। বান্দরবান থেকে চট্টগ্রাম শহরের বহদ্দার হাটে, বাস বদলে আবার কাপ্তাই। তাতে ছয়/সাত ঘণ্টা লেগে যেত। তিন পার্বত্য জেলার মাঝে আন্তঃযোগাযোগের জন্য যে রাস্তাগুলো এখন সচল, তখন তা ছিল না। ঢিমেতালে রাস্তার কাজ চলছে তখন। জোড়াতালি দেওয়া সে রাস্তায় চলে চান্দের গাড়ি। বান্দরবানের বালাঘাটা থেকে তখন চান্দের গাড়ি ছেড়ে যাত্রা শেষ হয় বাঙ্গালখালীয়াতে। আবার সেখান থেকে নির্দিষ্ট কিছু চান্দের গাড়ি আসে রায়খালী। রায়খালী কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে। সেখানে দাঁড়ালে এককালের এশিয়ার বিখ্যাত কাগজ কল কর্ণফুলী পেপার মিল চোখে পড়ে। নদীর এপার আর ওপার। খেয়া পার হলেই

চন্দ্রঘোনার লিচুবাগান স্টেশন। ওখানে পৌঁছতে পারলে আর বাহনের কোন অভাব নেই। বাস অথবা বেবিট্যাক্সিতে কাপ্তাই যাওয়া বেশ সহজ। খুবই কম সময়ে এবং কম খরচে কাপ্তাই যাওয়ার এমন সুন্দর রাস্তাটার খবর দিল বালাঘাটার কামাল মেম্বার। সে আরও জানাল, চাঁটগাঁ রোডে যতক্ষণে আমি কেরানীহাট হয়ে পটিয়া যাব, ততক্ষণে আমি কাপ্তাই পৌঁছে যাব। অসুবিধা শুধু চান্দের গাড়ি, এই যা। এমন মোক্ষম সুযোগ হাতছাড়া করতে আমার মন সায় দেয়নি। তা ছাড়া নতুন রাস্তায় নতুন কিছু দেখার নেশাটা আমার বরাবরই ছিল।

বালাঘাটা পৌঁছতে একটু দেরি হওয়াতে তিনটার গাড়ি ফেল করে হতাশ হয়ে বসে থাকি আরও এক ঘন্টা। দশ-বারোজন যাত্রী হলেই ছেড়ে যায় চান্দের গাড়ি। নির্দিষ্ট সময় দিয়ে তখন বেঁধে রাখা যায় না। যাত্রী হলে আর দেরি নেই, ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে বিকট শব্দে উঁচু-নিচু পথ বেয়ে চলে চান্দের গাড়ি।

যখন রওনা হলাম তখন বেলা চারটা। চেমীভুলুপাড়া হয়ে দুধপুকুরিয়া চলে আসি বেশ ভালভাবেই। পাকা রাস্তায় চলার আরাম এখানেই শেষ। তারপর শুরু হলো গাড়ির লম্ফঝম্ফ। মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠে যায় দু-তিন হাত। মাথায় দুএক ঘা খেতেই দৃশ্য দেখার সাধ মিটে গেল। শক্ত করে লোহার ডাণ্ডা ধরে দেহটাকে স্থির রাখার চেষ্টা করি। মাঝে মাঝে পীচঢালা পথ, আবার কোথাও শুধু ইট বিছানো এবড়োখেবড়ো রাস্তা। কোমরের বারোটা বাজিয়ে যখন বাঙ্গালখালীয়া পৌঁছি তখন গোধূলির আবির ছড়ায় পাহাড়ি উপত্যকার গাছের পাতায়।

যাত্রীর অভাবে রায়খালী যাওয়ার বিখ্যাত চান্দেরগাড়ি রাস্তার এক পাশে তখন চুপচাপ বসে আছে। আধাঘণ্টা পর লাস্ট ট্রিপের জন্য যাত্রী হলাম মাত্র পাঁচজন। আমি ছাড়া বাকি চারজনই পাহাড়ি। চলার পথে যত্রতত্র গাড়ি থামিয়ে প্রচুর আনারস আর কাঁঠাল তুলে নেয় গাড়ির ছাদে। ধীরে ধীরে গাড়িতে হয় যাত্রীর গাদাগাদি। টালমাটাল অবস্থায় সন্ধ্যার পর রায়খালী পৌঁছতে না পৌঁছতেই শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। কাকভেজা অবস্থায় আশ্রয় নিই নদীর পাড়ে ছোট্ট চায়ের স্টলে।

কেটলির চায়ের জল টগবগ করে যেন ডাকে চা-খোরদের। মাঝারী

সশপ্যানে গরুর দুধের উপর পুরু হয়ে আছে হলদে সর। চামচ দিয়ে কেটে গাঢ় দুধ নিয়ে একটার পর একটা চা বানাতে ব্যস্ত দোকানী। বৃষ্টি দোকানীর কপাল খুলে দেয়। এমন গাঢ় খাঁটি দুধের চা দেখে আমারও জিভে জল আসে। একটানা ঘণ্টা দুই বৃষ্টির পর আকাশ ভারমুক্ত হলো। মেঘ কেটে একটা দুটো তারা রাতের আকাশে ফুটতে লাগল। আপাতত বৃষ্টি আসার কোন লক্ষণ নেই। বর্ষার দীর্ঘস্নানের জল টপ্‌টপ্‌ করে পড়ে সেগুন পাতায়। তারই মাঝে আস্তে আস্তে নেমে যাই নদীর তীরে।

কর্ণফুলী এমনিতে খরস্রোতা। তার উপর দু'পাড়ের পাহাড়ি ঢল নেমে স্রোতকে করেছে আরও বেগবান। ইঞ্জিনচালিত ট্রলার ছাড়া এ মুহূর্তে এ নদী পাড়ি দেওয়ার কথা কল্পনা করা যায় না। পারাপারে ছোট ছোট সাম্পানগুলো কূল আঁকড়ে ভেসে আছে। পাড়ি দেওয়ার সাহস করছে না। ট্রলার নিয়ে রাতের আঁধারে নদী পাড়ি দিতেও বেশ সমস্যায় পড়তে হয়। স্রোত ঠেলে নিয়ে যায় আঘাটে। রাস্তার কাদাজল মাড়িয়ে চন্দ্রঘোনার সেই লিচু বাগানে যখন পৌঁছি তখন রাত সাড়ে দশটা। চারদিকটা বেশ নীরব। ইতিমধ্যে অনেকে দোকানপাট বন্ধ করে ঘরে ফিরে গেছে। রাস্তায় লোক চলাচল নেই বললেই চলে। দু-একটা রিকশা এদিক-ওদিক টুংটাং ঘণ্টা বাজিয়ে চলে গেলেও কোন বেবিট্যাক্সি চোখে পড়ে না। ব্যাগ কাঁধে পাকা রাস্তার উপর তীর্থের কাকের মত দাঁড়িয়ে খুঁজি কাপ্তাই যাওয়ার বাহন। এগারোটা পেরিয়ে ধীরে ধীরে বারোটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল ঘড়ির কাঁটা। প্রবল বৃষ্টিতে এখানকার সবকিছু যেন স্থবির হয়ে গেছে।

বিদ্যুতের চির অন্তর্ধানে রাতের এ প্রহরকে নিয়ে যায় আরও অনেক গভীরে। আঁধার ফুঁড়ে একটা জোনাকির আলো রাস্তা ধরে আসছে এদিকে। জোনাকিটা ক্ষণে ক্ষণে দ্যুতি ছড়ায় আবার হারিয়ে যায়।

কাছে আসতেই বিড়ির আগুনে একটা কালো কুচকুচে মুখের দেখা পেলাম। মাথায় গামছা বাঁধা, কাঁধে সাম্পানের বৈঠা। আমাকে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। বয়স্ক, মুখে খোঁচা খোঁচা আধপাকা দাড়ি। প্রতি টানে টানে চেহারা দেখা যায়।

'দাদা, আপনি কোত্থেকে আসলেন?' আচমকা প্রশ্ন করতেই লোকটা

বিড়ি ফেলে দেয় রাস্তার গড়ানো জলের উপর। একটা ক্ষীণ শব্দ করে, শেষ আলোটুকু বিদায় নিল আঁধারের দুনিয়া থেকে।

উত্তরে–চাঁটগাঁর ভাষায় যা বলল, তার সারমর্ম হলো–দোভাষী বাজার ঘাটে সাম্পান বেঁধে তিনি এখন বাড়ি ফিরছেন।

'দাদা, আশপাশে কোন বেবিট্যাক্সি পাওয়া যাবে? আজ রাতেই আমাকে কাপ্তাই যেতে হবে। একটা বেবিট্যাক্সি খুব জরুরী।'

মাঝি, নাঁকানাঁকি করে যা বলল, তাতে আশাহত হলাম। এই দুর্যোগের রাতে বেবিট্যাক্সি না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবে রিজার্ভ করে যাওয়ার একটা পথ বাতলে দেয়। লোকটা যেদিক থেকে এসেছে, সেই রাস্তাটা চলে গেছে দোভাষী বাজারের দিকে। ডান দিকের রাস্তাটা দেখিয়ে বলল, 'ওই দিকটায় রাস্তার পাশেই একটা বেবিট্যাক্সি থাকে। আর বেবিট্যাক্সির পেছনের ঘরটাই ড্রাইভারের। ডাকলেই বেরিয়ে আসবে। হয়তো রাতের বেলায় টাকা কয়টা বেশি নিবে।' এ-কথা বলে পথপ্রদর্শক পা বাড়ায় পশ্চিমদিকে। লোকটাকে ধন্যবাদ দেওয়ার সুযোগও পেলাম না, হন্‌হনিয়ে দ্রুত হেঁটে গেল।

মনে মনে কামাল মেম্বারের চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধার করি। ড্রেন উপচে আসা নোংরা পানিতে চামড়ার জুতো ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে গেছে। চপ্ চপ্ করে হেঁটে এগুতে থাকি পাহাড়ের ঢালের পাকা রাস্তায়। খ্রিস্টান মিশনারি হাসপাতালের গেইট পেরিয়ে আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাই। আর আঁধারের ভেতর খুঁজি পার্ক করা বেবিট্যাক্সি। একপাশে ঘুমন্ত বাড়িঘর, অন্য দিকে বনানীর কালোছায়া। এক সময় ধীরে ধীরে আরও গাঢ় অন্ধকার আমাকে গিলে খায়। বাড়িঘরের বালাই নেই, দুপাশটাই বড় বড় গাছপালায় ঠাসাঠাসি। রাস্তার ডান দিক থেকে কড়্ কড়্ মড়মড় শব্দ কানে আসতেই থমকে দাঁড়াই। শব্দটা বেশ্ চেনা মনে হতেই পা টিপে টিপে এগিয়ে যাই। হয়তো রাস্তার পাশে কোন ক্ষুধার্ত কুকুর বা শেয়াল হাড়-গোড় চিবিয়ে খাচ্ছে। নীরব এ রাস্তায় সেই প্রাণীটা আর আমি ছাড়া আর কেউ জেগে নেই। কিছুদূর এগুতেই মনে হলো রাস্তা ঘেঁষে গাছের নীচে একটা রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। রিকশার পেছনটা রাস্তার দিকে, হুড ওঠানো। লজ্জায় ঘোমটা টেনে পল্লীবধু যেমন রাস্তা

ছেড়ে পেছন ফিরে দাঁড়ায় ঠিক তেমনি। তারই ভেতর কড়কড় মড়মড় শব্দ হচ্ছে। হয়তো কোন কুকুর বৃষ্টির জন্য গরুর হাড় মুখে আশ্রয় নিয়েছে এর ভেতর। এখন আরামে বসে বসে চিবুচ্ছে। কাছাকাছি আসতেই শব্দটা মিলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ ফসকে বের হয়ে আসে–'ওখানে কে?' নিচুস্বরটা আরও ক্ষীণ হয়ে তরঙ্গ তোলে বাতাসে। পরক্ষণেই রিকশার ভেতরটা বেশ নড়েচড়ে ওঠে। পর্দা ঠেলে বের হয়ে আসে একটা ছোটখাট মানুষ। চাটগাঁর ভাষায় উত্তর দেয়, 'বাইছাব, আঁই পেঠান আলী।' বলতে বলতে রিকশা থেকে নেমে দাঁড়ায় রাস্তায়। আরও কাছে এসে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে।

'আপনার রিকশায় কাপ্তাই যাওয়া যাবে?' জানতে চেয়ে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকি লোকটার দিকে। মানুষটা ছোটখাট হলেও বেশ পেটা শরীর। মাথা ভর্তি লম্বা চুল। পরনের কুর্তা হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঝুলে আছে।

লোকটার সঙ্গে কথা বলার সময় একটা তীব্র পচা গন্ধ ধাক্কা লাগে নাকে। পেটের ভেতরটা গুলিয়ে আসলেও চেপে রাখি বহু কষ্টে।

'স্যার উইঠ্যা বইঁয়্যেন।' কোন রকম ভণিতা না করে পেঠান আলী ব্যস্ত হয়ে যায়। সামনের পর্দাটা ঠেলে ভাঁজ করে ঢুকিয়ে দেয় রিকশার এক পাশে। যাবার আগ্রহে আগপাছ না ভেবে ক্লান্ত দেহটা কোন রকমে ঠেলে তুলে দিলাম পেঠান আলীর রিকশায়। পা দুটো ভেজা জুতার ভেতর সেদ্ধ হবার জোগাড়। বসে পা মুক্ত করি। সারা দেহ-মনে একটা প্রশান্তির ছোঁয়া দোলা দিয়ে যায়।

ইতিমধ্যে পেঠান আলীর রিকশা ফাঁকা রাস্তায় সাঁ সাঁ করে চলতে থাকে। দুপাশে ঘন নিবিড় বন। কখনও রিকশা চলে পাহাড় ঘেঁষে আবার কখনও দু পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে। এমন ঘুটঘুটে আঁধারের মাঝে পেঠান আলীর রিকশা চালাতে একটুও অসুবিধা হয় না। দিনের আলোতেও এমন নিখুঁতভাবে কেউ চালাতে পারবে কিনা সন্দেহ। দ্রুতগামী রিকশায় চড়ে প্রথমে যেমন হই পুলকিত পরক্ষণেই আবার হতে হলো আতঙ্কিত। আঁকাবাঁকা উঁচুনিচু রাস্তায় পেঠান আলী অবলীলায়

উঠে যায় প্যাডেল মেরে। রিকশা উল্টে পড়ে যাই কিনা সে আতংকে বুক ধড়ফড় করে। দুহাতে রিকশার হুড আঁকড়ে ধরে রাখি, যেন ছিটকে পড়ে না যাই।

ইতিমধ্যে অনেক দূর চলে আসি। একটানা প্যাডেল মেরে পেঠান একটা সরু ব্রীজ পার হয়ে আসে। সামনে একটা বড় চড়াই। তারই গোড়ায় পেঠান রিকশা থেকে নামে রাস্তায়।

'আমি কি নেমে হেঁটে যাব, পেঠান ভাই? খালি রিকশা তুলতেই আপনার কষ্ট হবে যে।' অনেকক্ষণ পর কথা বলার সুযোগ পেলাম। আমার প্রস্তাব শুনে পেঠান কিঞ্চিৎ ফিরে তাকায়।

আমাকে এক পলক দেখে, রিকশা টেনে উপরে উঠে যেতে যেতে বলে, 'তোঁয়ার কোঁন চিন্তাগরার দরহাঁর নাই, তুঁই গমগরি বঁইয়ো।' (তোমার কোন চিন্তা করার দরকার নাই, তুমি ভাল করে বসে থাক)। নাকি সুরে আশ্বস্ত করে আমাকে। তবে তার চোখ দুটো আমাকে আশ্বস্ত করতে পারেনি বরং অস্বস্তির বীজ বুনে দেয় মনে। আঁধারে নিশাচর প্রাণীর মত জ্বলজ্বল করতে আমি স্পষ্ট দেখেছি। তা দেখার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা ধক্ করে ওঠে।

প্রথম দেখার পেঠান আলী আর এ পেঠান আলীর মাঝে বিস্তর ব্যবধান। আমি কি ভুল দেখলাম, না ঠিক দেখলাম তা নিয়ে মনের মাঝে বাধে মহাদ্বন্দ্ব। তবে পেঠান আলী যে কোন আদম সন্তান নয় তা আস্তে আস্তে আমার কাছে পরিষ্কার হতে লাগল। হঠাৎ করে মনে হলো পেছন থেকে কেউ যেন রিকশাটাকে ঠেলে তুলে দিচ্ছে। আস্তে আস্তে ঘাড় ফেরাই পেছনে। তাতেও ভয়, অবাস্তব কিছু যদি চোখে পড়ে! হুডের মাঝখানের ফাঁকা দিয়ে আলোছায়ায় যা দেখলাম তাতে আমার অনুমানই সত্যি। রোগা কালো দুটো হাত ঠেলে দিচ্ছে রিকশাটাকে। অদূরে ব্রীজের গোড়ায় স্থির দাঁড়িয়ে আছে আর এক পেঠান আলী। যার হাত দুটো ধীরে ধীরে রাবারের মত লম্বা হচ্ছে রিকশার পিছু পিছু।

দুপাশে ঘন সেগুন বাগান। বসত বাড়ির কোন চিহ্ন নেই। থাকলে হয়তো রিকশা থেকে লাফিয়ে পড়ে একটা ভোঁ দৌড় দেওয়া যেত। মাথায় এমন অনেক বুদ্ধি উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগল। কিন্তু পরিবেশ

পরিস্থিতি বরাবরই প্রতিকূলে। চড়াইয়ের চূড়ায়. ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক বিদ্যুতের আলো চোখে পড়ে। যেখানে বিদ্যুতের আঁতুড়ঘর সেখানে তো বিদ্যুৎ না থেকে পারে না। মনে মনে ধরে নিই এটাই হয়তো আমার সাধের কাপ্তাই।

রাস্তার নীচে কর্ণফুলীর স্পষ্ট দেখা পেলাম। রাস্তা থেকে নদী অনেক নীচে। বিদ্যুতের আলোয় আঁধার অনেকটা দূর হওয়ায় দেখলাম পেঠান আলীর উল্টো পা। পায়ের পাতা দুটো পেছনের দিকে থাকায় রিকশা চালাতে তার যেন সুবিধাই হচ্ছে।

পাহাড়ের উপরটা বেশ সমতল। ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই কালো হাত দুটো অদৃশ্য হয়ে যায়। পরক্ষণেই একটা প্রচণ্ড বাতাসের ঝাপটা মাথার উপর দিয়ে বয়ে যায় পুব দিকে। সেগুন গাছের অমসৃণ বড় বড় পাতায় সে শব্দ বাজে খস্‌খস্‌ করে। অথচ নদীর ওপারে অথবা বামের পাহাড়ের গাছপালার একটা পাতাও নড়েনি। শুধু রাস্তার উপর দিয়ে একটা সমান্তরাল রেখায় এগিয়ে গেল যেন উষ্ণ বাতাসের গোলা। একটা পিশাচের খপ্‌পর থেকে যখন বাঁচার পথ খুঁজছিলাম তখন আরও একটা পিশাচ পিছু নেয় আমার। ভাবতে গিয়ে গলা শুকিয়ে যায় তৃষ্ণায়। নিষ্কৃতি পাবার পথ খুঁজি আর মনে সাহস সঞ্চয় করি। তবে সে সাহস আবার মনের অজান্তেই উধাও হয়ে যায়। আজ ওদের হাতে কতই না নাস্তানাবুদ হতে হয়, না জানি কত পৈশাচিক খেলা খেলবে। ভাবতেই শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তবে যতদূর শুনেছি ওদের ভেলকিবাজিতে দিশেহারা হলেই নাকি বিপদ। সাহস নিয়ে মোকাবেলা করতে পারলে ওরা পালিয়ে যায়। কিন্তু সে সাহস পাব কোথায়?

কিছুদূর এগুতেই আবার দেখা দিল একটা বিপজ্জনক ঢাল। তরতর করে পেঠান আলী সে ঢালু জায়গাটায় নেমে গেল। পরে জানতে পারলাম সে ঢালু জায়গাটার নাম ব্যাংছড়ির ঢাল। ঢাল বেয়ে নামার পর যখন সমতল রাস্তায় রিকশা চলছিল উল্কা বেগে, তখনই নাক বরাবর একটা জেলে নৌকা চোখে পড়ে। রাস্তাটা একদম নীচে নদীর পাড় ঘেঁষে চলে গেছে আরও পুব দিকে। নৌকায় একটা জোরাল বাতি জ্বলছিল তখন। সঞ্চিত যত সাহস ছিল বুকে, মুহূর্তে সব খালি হয়ে যায়। জেলে

নৌকার কাছাকাছি আসতেই ব্যাগটা সামনে রেখে জোরে ডাইভ দিই নদীর পাড়ের দিকে। রিকশা বা পেঠান আলীর কী হলো, তা আর ফিরে দেখা হলো না। ঘাসের বুকে ব্যাগ ফেলে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে পৌঁছে গেলাম পানির ধারে। তড়িৎগতিতে কাজটা হয়ে যায়। জেলেরা কোন কিছু বোঝার আগেই নৌকাতে লাফিয়ে উঠি।

আমাকে দেখে জেলে তিনজন প্রথমত থতমত খেয়ে যায়। ওদের একজনের হাতে দশ শলাকার টেঁটা। আর নৌকার গলুইয়ে বাঁধা একটা শক্তিশালী হ্যাজাক। যার আলোতে চারপাশটা বেশ পরিষ্কার। নদীর স্বচ্ছ জলে ওরা ছোট বড় মাছ শিকার করে বেড়ায়, এটাই তাদের পেশা।

'আরে, ভাই আপনে করতাছেন কী? কী অইছে আপনার? লোকটা পাগল নাহি?' আরও কত কী তিনজনে মিলে বলতে থাকে। একটা ছোটখাট শোরগোলের সৃষ্টি হয়। তিনজনের প্রশ্নবাণে আমি আরও কাবু হয়ে যাই। তখন মাথায় কোন কিছুই ঢুকছিল না। তবে সে সময়টায় সাহস হারালেও জ্ঞান হারাইনি। পাটাতনের উপর বসে হাঁপাতে হাঁপাতে ওদেরকে হাত দিয়ে দেখালাম পাড়ের সেই জায়গাটা।

শুকনো কণ্ঠে কোনরকমে বোঝালাম আমার বিপদের কথা। আমার পরিচয় পেয়ে যারপরনাই সম্মান দেখায়। সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা পানি পান করতে দেয়।

ওরা ছিল নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার ফকিরাচরের বাসিন্দা। ওই উপজেলার হাজার হাজার মানুষ বাস করে এ কাপ্তাই বাজারের আশপাশে। নৌকায় একজন জেলে ছিল বেশ বয়স্ক, নাম তার ছমির মোল্ল্যা। ঘটনার আদ্যোপান্ত শুনে প্রৌঢ় ছমিরের মুখটা চুপসে যায়। ঘটনার ভয়াবহতা আন্দাজ করে বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ে। আস্তে আস্তে ব্যাখ্যা করে পেঠান আলীর সুপ্ত বাসনার কথা।

'স্যর, আমনে জনমের বাঁচা বাঁচছেন। আমনার উরফে ময়মুরব্বীর বহুত দোয়া আছে। হেইডার জোরেই আইজ পার অইয়া গেলেন। তয় হুনেন–আমনে যেই জায়গাতে রিকশায় উঠছেন হের পুব বগলে (পাশে) অই খ্রিস্টান হাসপাতালের চিতাখোলা। কত রহমের মরা যে এইহানে হেরা পুঁতে হের কোন হিসাব নাই। ওইহানে বহু মানুষ রাইতের বেলায়

ডরাইয়া মরছে। মাডির (মাটির) নীচেতুন মাইনসের পঁচা হাড় মাংস তুইল্যা হেরা সবসময় খায়। হেই খাওনের সময় অই আমনে গিয়া হাজির অইছেন। হেরা ওইহানে রাইত অইলে অই পাহাড়তে নাইম্মা আইয়ে। আর সুযোগ পাইলে মাইনষেরে ডর দেহাইয়া মারে। আমনে যদি এই আশরাফের ঘাডে (ঘাটে) আমাগরে না পাইতেন, তাইলে কাম অইছিল, সার। সব অই আল্লার ইচ্ছা। একটু সামনে গেলে অই পাইতেন হেগর আর এক আড্ডাখানা। এই কাপ্তাই এলাকার যত মরা সব আছে ওইহানে। হেই জায়গায় নিতে পারলেই আমনারে সাইজ করত। তয় সার, এই পর্যন্ত এতকিছু দেইখ্যা আমনে যে সাহস কইরা টিক্কা আচেন এইড্যাঅই বড় কতা।'

তারপর আমাকে আশ্বস্ত করে ফকিরাচরের ছমির মোল্ল্যা ও তার দুই ছেলে। টেঁটা ও হ্যাজাকসহ ওদেরকে নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে যাই রাস্তায়। হ্যাজাকের আলোতে রাস্তার প্রতিটি ধূলিকণাও স্পষ্ট দেখা যায়। রাস্তার পাশে ব্যাগটা তেমনি পড়ে আছে। রিকশাসহ পেঠান আলী কোথায় জানি উধাও হয়ে গেছে। দৃষ্টি সীমায় কোন প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। তবে চারদিকটা বেশ থমথমে। আশপাশে নেই কোন ঝিঁঝি পোকার অথবা রাতচরীর ডাক। ভয়ঙ্কর এক নীরবতা এসে গ্রাস করে দৃশ্যমান প্রকৃতিকে। রিকশায় ফেলে যাওয়া জুতো জোড়া খুঁজে পেলাম রাস্তার ওপাশটায়। সব কুড়িয়ে যখন নৌকায় ফিরি, তখন দূরে সেগুন বাগানে হঠাৎ এক ঝড় ওঠে। মহা আক্রোশে যেন গাছপালা সব ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে প্রবঞ্চক পেঠান আলী।

বিপিন বিহারী

ফটক বন্ধ ছিল

সকাল থেকে মন খারাপ আমার। খুব মন খারাপ। দক্ষিণের জানালা খুলে আকাশের দিকে তাকালাম। এখনও সাদা মেঘ ভেসে যাচ্ছে দিগন্তের দিকে। আরও মন খারাপ হয়ে গেল আমার। মা বিস্কুট আর চা নিয়ে ঢুকল ঘরে। ফিরিয়ে দিলাম তাকে। ভাল লাগছে না আমার। কিচ্ছু ভাল লাগছে না। মাঝে মাঝে আমার কিছুই ভাল লাগে না। হঠাৎ মনে হলো বেড়িয়ে আসি আগামী সপ্তাহে টাঙ্গাইলের মধুপুর থেকে। শীলা আর সেলিম থাকে ওখানে। দাগটানা কাগজ নিয়ে চিঠি লিখতে বসলাম আমি।

প্রিয় শীলা ও সেলিম,

আশা করি ভাল আছিস। ঠিক করেছি আগামী সপ্তাহে তোদের ওখানে বেড়াতে আসব। ২৯ তারিখটাই ভাল হবে আমার জন্য। ওই দিন বিকেলে তোদের দরজায় কড়া নাড়ব আমি। তোরা বাড়িতেই থাকিস। তোদেরকে আমার হিংসে হয়। কী চমৎকার চাকরি পেয়েছিস তোরা। থাকছিস কোন্ আমলের একটা দুর্গে। সত্যি, দুর্গের ভেতরে বাস করা দারুণ রোমাঞ্চকর ব্যাপার। কেমন একটা ভৌতিক ও রহস্যময় পরিবেশ থাকে ওখানে। অবশ্য তোরা দুজনেই তো কোনদিন ভূত বিশ্বাস করিসনি। তো, কেমন লাগছে এখন?

সন্ধ্যার আগেই আশা করি আমি পৌঁছে যাব। মধুপুর তো কোনদিন যাইনি। তাই দিনের আলো থাকতে থাকতেই আমি পথ চিনে তোদের ঐ দুর্গে পৌঁছতে চাই। তোদের পাঠানো মানচিত্র দেখে তো মনে হচ্ছে পথটা বেশ গোলমেলে। শুধু বাঁক আর বাঁক। যেহেতু তোদের সুরঞ্জিত বাবুর পরিবার ২৯ তারিখ সকালে এক মাসের জন্য রাজবাড়ি চলে

যাচ্ছে, আমি ওইদিন বিকেলের মধ্যেই পৌঁছে যাব তোদের দরজায়। ভালো থাকিস। আমার অনেক ভালবাসা নিস।

ইতি

তোদেরই

মৌসুমী

২১ এপ্রিল, ২০০৭

পুরাতন চৌধুরীপাড়া, কুমিল্লা।

মধুপুরের উদ্দেশে কুমিল্লা ছাড়ার সপ্তাহখানেক আগে এই চিঠিটা পোস্ট করা হয়েছিল।

এর আগে কোনদিন টাঙ্গাইল যাইনি আমি। টাঙ্গাইল শহর থেকে মধুপুর বেশ দূর। শীলা ও সেলিম একটা মানচিত্র এঁকে পাঠিয়েছিল আমাকে। ওদের মানচিত্র অনুযায়ী পথচলা সত্ত্বেও কেমন এক গোলক ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলাম। পথ ঠিকমত খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ করেই অন্ধকার নামল। পথটাও ঘন গাছপালায় ঢাকা। আমার প্রাইভেট কারের হেডল্যাম্পটাও সেই ঘন অন্ধকারকে ভেদ করতে পারল না। বিদেশে পড়াশোনা করেছি, গাড়ি চালানোর সাহস আর দক্ষতা দুটোই আমার আছে। কুমিল্লা থেকে আরও আগে রওনা দেয়া উচিত ছিল আমার। ঢাকা আসতে আসতেই তো প্রায় বিকেল হয়ে গিয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে আর কাউকে সঙ্গে নিয়ে এলে ভাল হত। যাহোক পথ হারিয়ে ফেলায় আমি গাড়িটা থামালাম।

হঠাৎ গাছপালার ফাঁক দিয়ে দুর্গটা দেখা গেল। একটা অদ্ভুত শিহরণ বয়ে গেল আমার মেরুদণ্ড বেয়ে। কোনদিন সত্যিকারের দুর্গ দেখিনি আমি। যা দেখেছি সব ছবি ও কল্পনায়। এখন চোখের সামনে সত্যিকারের দুর্গ দেখে মনে হলো যেন রূপকথার পুরী। অনেক উঁচুতে তার গম্বুজ আর ছাদের খাড়া চুড়োগুলো অস্তগামী সূর্যের রক্তিম পটভূমিকায় যেন কালো রঙের একটা রেখাচিত্র। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দেখলাম, অনেক উঁচু একটা গম্বুজের ভেতর থেকে একটা ম্লান কমলা রঙের আলো বেরিয়ে এল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম, ওখানে নিশ্চয় শীলা ও সেলিম রয়েছে। একটা মূর্তি হঠাৎ জানালার পাশ

দিয়ে চলে গেল। পরক্ষণে আবার ফিরে এল। দাঁড়াল এক মুহূর্ত। তারপর মূর্তি ও আলো–দুই-ই অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি চিৎকার করে বললাম, 'আমি আসছি। আলো নিভিও না। ঘুমিয়ে পোড়ো না তোমরা!'

আবার গাড়িতে স্টার্ট দিলাম আমি। আঁকাবাঁকা ছোট পথ ধরে এগিয়ে চললাম। আশা করলাম, ঠিক পথেই চলেছি।

সামনে ফটক দেখে খুশি হয়ে উঠলাম। আরও খুশি হলাম ফটকটা খোলা দেখে। পনেরোফুট উঁচু, বারো ফুট চওড়া, ভারী বাঁকানো লোহার তৈরি ফটক। গ্রানিট পাথরের প্রকাণ্ড চাঁইয়ের সঙ্গে বড় বড় হুক দিয়ে আটকানো। ফটকটা ঝকঝক করছিল আমার গাড়ির হেডলাইটের আলোয়। জোরে গাড়ি চালিয়ে ফটকটা পার হলাম। চিৎকার করে ডাকলাম শীলাকে। ডাকলাম সেলিমকেও। কিন্তু জবাব এল না কোন। জ্বলল না কোন আলো। কেউ সাদর অভ্যর্থনা জানাল না, কিংবা বেরিয়ে এল না কেউ হাসিমুখে। মাত্র নটা বাজে। এখনও সময় হয়নি শোবার। 'শীলা! সেলিম!!' আবার জোরে চিৎকার করে ডাকলাম। কোন সাড়া নেই। সবাই শুয়ে পড়েছে নাকি! বিরক্ত হয়ে গাড়ি থেকে নামলাম। টর্চ জ্বেলে আলো ফেললাম এদিক ওদিক। যা ভেবেছিলাম, বড় দরজাগুলো সব বন্ধ। কিন্তু শীলা ও সেলিম চিঠিতে উল্লেখ করেছিল কোয়ার্টারে যাবার জন্য একটা ছোট দরজার কথা। ওটাও বন্ধ দেখলাম। পাথর বিছানো রাস্তা ধরে শুরু করলাম হাঁটতে। টর্চের আলো ফেললাম জানালায়। জোরে জোরে ডাকতে লাগলাম শীলা ও সেলিমের নাম ধরে। হঠাৎ একটা লম্বা জানালায় আলো পড়তেই ভেতরে যেন কাউকে দৌড়ে যেতে দেখলাম। পরে আলোটা এক জায়গায় স্থির করতেই দেখতে পেলাম শ্বেতপাথরের একটা নগ্ন নারী মূর্তি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে একেবারে কানের কাছে শুনতে পেলাম ইঞ্জিনের বিকট আওয়াজ। চমকে উঠে ঘুরতে গিয়ে হাত থেকে টর্চটা পড়ে গেল। নিভে গেল সাথে সাথেই। ঝুঁকে পড়ে হাতড়ানো শুরু করতেই গাড়িটা থেমে গেল। তার হেডলাইটের আলো বাঁকানো লোহার ফটকের ভেতর দিয়ে সোজা আমার ওপর এসে পড়ল। গাড়ি থেকে নামল একজন

পুরুষ। বড় তালাটা খুলে ফটকটাকে খুলে ফেলল। তারপর গাড়ির দিকে পা বাড়াতেই একটি নারীকণ্ঠ বলে উঠল, 'সেলিম! উঠোনে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে!'

গাড়িটা ভেতরে ঢুকল। দরজা খুলে গাড়ি থেকে নামল শীলা ও সেলিম।

'মৌসুমী, তুই! এখানে—এখানে কী করছিস?' শীলা চেঁচিয়ে বলল।

'চমৎকার অভ্যর্থনা বটে!' আমি বললাম।

'আমি কথাটা ওভাবে বলিনি,' শীলা বলল। 'আর তুই তা ভাল করেই জানিস। তুই জানিস তোকে দেখলে আমরা সব সময় খুশি হই। কিন্তু আমরা যে এখানে থাকি, তা তুই জানলি কী করে? তোকে চিঠি লেখার কথা ভাবছিলাম, কিন্তু এত ব্যস্ত ছিলাম যে একটুও সময় পাইনি। আজ একটু ফ্রি হলাম।'

'তা হলে অন্য কেউ লিখেছে তোদের নামে,' বললাম আমি।

'কী বললে?' সেলিম বলল।

আমি বিরক্ত গলায় বললাম, 'তোমাদের চিঠির কথা বলছি। আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছ এখানে বেড়িয়ে যেতে। লিখেছিলে সুরঞ্জিতবাবুরা চলে গেলে তোমাদের সঙ্গে এখানে এক মাস কাটিয়ে যেতে।'

'হ্যাঁ,' বলল শীলা। 'তোকে একটা চিঠি আমরা লিখেছি বটে, কিন্তু সেটা তো আজকেই লিখেছি। একটু আগে, ফেরার পথে ডাকবাক্সে ফেললাম। যাহোক, তুই যে এসে গেছিস, তাতেই খুশি আমি। কিন্তু এই দুর্গের মালিক সুরঞ্জিত বাবুর নাম তুই জানলি কী করে? সে যে চলে গেছে তাইবা জানলি কী করে?'

'আগে ভেতরে চলো, তারপর আলোচনা কোরো,' সেলিম বলল। 'খুব ঠাণ্ডা এখানে। জমে যাচ্ছি। খিদেও পেয়েছে খুব। শীলা, তুমি গিয়ে কফি বানাও। আমি গাড়িটা তুলে দিয়ে ফটকে আবার তালা মারছি। মাত্র এক মিনিট লাগবে।' আমার লাল রঙের গাড়িটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে গেল সে। খুব অবাক গলায় বলল, 'তুমি ভেতরে ঢুকলে কেমন করে, মৌসুমী?'

'কেন, ফটক দিয়ে!' বললাম আমি। 'ওটা তো খোলাই ছিল। আমি গাড়ি চালিয়ে ভেতরে চলে এলাম!'

শীলা আর সেলিম পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল। মনে হলো আমার কথায় ভড়কে গেছে দু'জনে। এক মুহূর্ত আমরা তিনজনই হতবাক হলাম, দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে।

আমি বিড়বিড় করে বললাম, 'তাই তো! আমি তো তোমাদের ফটক খুলতে দেখলাম। তা হলে আমি হয়তো অন্য কোন ফটক দিয়ে ঢুকেছি।'

'এই ফটক দিয়েই কেবল গাড়ি ঢুকতে পারে,' শীলা বলল। 'অন্যগুলো খুব ছোট, কোন গাড়ি ঢোকার মত না।'

সেলিম বলল, 'খুব ঠাণ্ডা পড়ছে। ভেতরে চলো। শীতে জমে গেলাম।'

চওড়া বারান্দা ধরে হাঁটতে লাগলাম শীলা আর আমি। দেয়াল জুড়ে অয়েল পেন্টিং এবং শুয়োর ও হরিণের পোকা খাওয়া মাথা ঝোলানো।

'বাড়ির অন্যসব লোক কি কালা নাকি?' বললাম আমি। 'এতবার হর্ন বাজালাম, গলা ছিঁড়ে ফেললাম চেঁচাতে চেঁচাতে, মরা মানুষেরই তো জেগে উঠবার কথা।'

'বেশ করেছিস,' শীলা বলল। 'আমরা ছাড়া আর কেউ নেই এখানে।'

'তা হলে গম্বুজের আলো জ্বালল কে?'

'আলো? গম্বুজের? তুই দেখছি এখনও সেই কল্পনাপ্রবণ রয়ে গেছিস। স্কুল থেকেই তো তোকে চিনি আমি। ভয় পাবার মত কিছু না থাকলেও তুই কল্পনায় একটা কিছু আবিষ্কার করে ফেলিস। আয়, এদিকে আয়।'

একটা দরজা খুলল শীলা। সুইচ টিপে আলো জ্বালল। ঝকঝকে তকতকে বিশাল উষ্ণ রান্নাঘর। প্রকাণ্ড একটা ইলেকট্রিক স্টোভের ওপর একটা বড় কেটলিতে পানি ফুটছে। তাক থেকে তিনটা মগ নামাল সে। চামচের টুংটাং শব্দে কফি বানাতে বানাতে বলল, 'বাইরে যাবার আগে কেটলিটা স্টোভের ওপর চাপিয়ে রেখে যাই। সময় বেঁচে যায় এতে।

বাইরে থেকে ফিরে এসেই রেডিমেড কফি। তুই তো জানিস সেলিম কফির জন্য কেমন পাগল হয়ে থাকে। বাইরে থেকে এসে সাথে সাথেই কফি খাওয়া চাই। রান্নাঘরটা খুব সুন্দর, তাই না? আর বেশ বড়।'

'অ্যাঁ?' চমকে উঠলাম আমি। সবুজ আর হলুদ রং করা রান্নাঘরের চারদিকে তাকালাম। কোথাও সাদার চিহ্ন নেই। জিজ্ঞাসু চোখে বললাম, 'কী বললি?'

'কফির কথা বলছি,' বলল শীলা। 'কালো না সাদা?' হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে অন্য কথা বলা শীলার অনেক দিনের স্বভাব।

'ওঃ। সাদাই দে আমাক,' কোটটা খুলতে খুলতে আবার বললাম, 'কিন্তু সত্যি আমি আলো দেখেছি ঘরে। একটা আলো জ্বলছিল। পরে হুট করে নিভে গেল। আর তোদের একটা চিঠিও পেয়েছি আমি। নইলে এখানে এলাম কেমন করে?'

শীলা খুশি খুশি গলায় বলল, 'বুঝতে পারছি না। তবে আজকের আগে আর কোন চিঠি লিখিনি। সেলিমও লেখেনি। তাই না, সেলিম?'

সেলিম একটু আগে ঢুকেছে রান্নাঘরে। মাথা নাড়ল সে। ওর মুখে গরম কফি ভর্তি। তাই 'হ্যাঁ' নাকি 'না' বলল তা স্পষ্ট বোঝা গেল না।

শীলা বলল, 'আমি বা সেলিম কেউ তোকে চিঠি লিখিনি। ব্যাপারটা খুব রহস্যময় লাগছে আমার কাছে, মৌসুমী।'

'চিঠি পেয়ে আমি সেদিনই উত্তর দিয়েছি,' বললাম আমি।

'আমরা তো কোন চিঠি পাইনি তোর,' শীলা বলল।

একথায় হতাশ হলাম খুব। মনে মনে ঠিক করলাম সকাল হলেই ফিরে যাব কুমিল্লা। তাই শুধু রাতে থাকবার মত একটা ব্যবস্থা করে দিতে বললাম শীলাকে। আমার কথা শুনে রাগে ফেটে পড়ল শীলা। 'শুধু রাতটা থাকবি এখানে? কী মনে করেছিস নিজেকে? যখন এসেই পড়েছিস, থেকে যাবি। ঘরের অভাব নেই এখানে। আর আজকের চিঠিতে তোকে আমরা আসতেই লিখেছি।'

সেলিম বলল, 'আচ্ছা, মৌসুমী, ওই চিঠিটা কি তোমার কাছে আছে?'

'অবশ্যই আছে। তুমি যে ম্যাপটা এঁকে পাঠিয়েছ তাও আছে।'

বললাম আমি। ব্যাগ থেকে কাগজপত্তরগুলো বের করে সেলিমের কফির মগের পাশে টেবিলের ওপর রাখলাম। হালকা নীলরঙের কাগজে লেখা দুটো চিঠি। শীলা ও সেলিম দুজনে ঝুঁকে পড়ল চিঠি দুটোর ওপর। একটাতে একটা রাস্তার চিত্র। আর একটা সেলিমের মাকড়সার ঠ্যাং-এর মত হিজিবিজি হাতের লেখায় ঠাসা। তার নীচে শীলার গোটা গোটা হাতে লেখা কয়েকটা শব্দ।

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না,' চিন্তিত স্বরে বলল শীলা। 'আমরা তো ঠিক এই চিঠিটাই তোকে লিখেছি, কিন্তু লিখেছি তো মাত্র আজকে। ডাক বাক্সে ফেললাম সন্ধ্যার পর। আর ওই ম্যাপটাও তো সেলিমের আঁকা!'

'তোরা যে এখানে এসেছিস সে কথা আর কেউ জানে?' প্রশ্ন করলাম আমি। 'মানে, আমাদের কেউ রসিকতা করেনি তো?'

'না। মাত্র গতমাসেই আমরা চাকরিটা পেয়েছি। অল্প সময়ের নোটিশে হাতির পুলের বাসা ছেড়েছিলাম। কাউকে ফোন করারও সুযোগ হয়নি। এখানে এসেও দম ফেলার সময় পাইনি। এখানকার সবাই তখন চলে যাবার জন্য তোড়জোড় করছিল। আমরাও বুঝে নিচ্ছিলাম সবকিছু। কাউকে চিঠি লিখিনি এত দিন। আজই প্রায় সবাইকে লিখলাম। জ্যানেট, টিনা আপা, ইমন, মিষ্টি, ওয়ানাইজা আর তোকে। অবশ্য তোকেই শুধু আসবার জন্য লিখেছি।'

'তোমার সঙ্গে কি খামটা আছে?' সেলিম জিজ্ঞেস করল।

আমি খামটা তার হাতে দিলাম।

'মৌসুমী, তুমি ডাকঘরের সিলটা লক্ষ করেছিলে? আর চিঠির ওপরের তারিখটা দেখেছ?'

'না। কিন্তু কেন বল তো?'

'এই দেখ। চিঠিটার তারিখ ২৯ এপ্রিল, মানে আজ। আর, খামের ওপর পোস্ট অফিসের তারিখ ৩০ এপ্রিল, অর্থাৎ আগামীকাল।'

'এটা তো মনে হচ্ছে রসিকতা,' আমি বললাম।

'আরও দেখো!' শীলা বলল। 'খামটাও তো একই। কারণ পোস্ট অফিসের সিলটা পড়েছে ভুল কোণে। বিকেলেই তোমাকে কথাটা

বলেছিলাম। চিঠির খামগুলোর মধ্যে এই খামটা উল্টো করে রাখা ছিল, আর আমিও ভাল করে না দেখেই টিকিট লাগিয়েছিলাম। খেয়াল হয়েছিল পরে।'

'ভালই তো,' বললাম আমি। 'এরকম পরিবেশে কিছুটা রহস্য থাকবে, এটাই তো স্বাভাবিক। এসব ভুতুড়ে ব্যাপার উপভোগ করার জন্যই তো এখানে আসা।'

'ধ্যাৎ! এ বাড়িতে সে রকম কিছু নেই।' আপত্তি জানাল শীলা। 'বাড়িটা প্রাচীন হলে কী হবে, খুব শান্ত একটা জায়গা এটা। এখানে অদ্ভুত কিছু নেই। ভয় পাবার মতও কিছু নেই। বাড়ির ছবিগুলোও খুব সুন্দর আর নিরীহ। তা, মালপত্র কই তোর?'

'ওহো, ওগুলো সব গাড়িতেই রয়ে গেছে,' আমি বললাম।

'নিয়ে আসছি আমি,' সেলিম বলল। আমার জিনিসপত্র আনতে চলে গেল সে। দীর্ঘপথ গাড়ি চালিয়ে এসে বেশ ক্লান্তি লাগছিল আমার। শুতে ইচ্ছে করছিল খুব। শীলাকে সে কথা বলতেই সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বলল, 'দোতলায় চল। ঘরটা গোছানোই আছে। শুধু বালিশে কভার লাগালেই চলবে। এখন গোসল করবি? নাকি সকালে করবি? তোকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আমি বাথরুমে গরম পানি দিয়ে যাচ্ছি। ঘরটাকে তোর নিজের মনে করিস।'

কিছুটা ক্লান্তিতে, কিছুটা বিভ্রান্তিতে আর শীলার বকবকানিতে মাথা ঘুরতে লাগল আমার। সিঁড়িতে শোনা গেল পায়ের শব্দ। 'সেলিম তোর মালপত্র নিয়ে আসছে,' বলল শীলা।

এত তাড়াতাড়ি! দরজা বন্ধ করার শব্দও তো শুনলাম না! সত্যিই অবাক হলাম আমি।

শীলা দৌড়ে বারান্দায় গেল। 'সেলিম, ওগুলো নিচ্ছি আমি। মৌসুমী কাপড় বদলাচ্ছে।'

সে দাঁড়িয়ে পড়ল। আশ্চর্য! এখানে তো কেউ নেই!

সে সময় হঠাৎ সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল বাইরের দরজা। শোনা গেল সেলিমের পায়ের শব্দ। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে সে। শীলা বলল, 'হায় আল্লাহ, আমিও যেন কী সব শুনতে পাচ্ছি। মৌসুমী, তোর ওইসব

ভুতুড়ে ব্যাপারই ঘটছে বোধহয়। তোর রোগ দেখছি আমাকেও ধরেছে।' ঘরের মধ্যে আমার জিনিসপত্র এনে দিল শীলা। দুটো গরম পানির বোতল নিয়ে এল। চাদর পাল্টে দিল বিছানার। নরম বালিশে নতুন গোলাপি কভার পরানো। ততক্ষণে জামা-কাপড় পরে ফেলেছি আমি। শীলা বাথরুমে গরম পানিও দিল।

রাতে অল্পসময়ের মধ্যে অনেক কিছু রান্না করে ফেলল শীলা। শুঁটকি ভর্তা, আলুভাজি, ফুলকপি দিয়ে শিং মাছ, প্রচুর পেঁয়াজ দিয়ে কইমাছের ঝোল। মনে হলো অনেকদিন এত ভাল রান্না খাইনি। শুতে শুতে রাত দুটো বেজে গেল।

'তুই শান্তি মত ঘুমা,' আমাকে আবার রুমে পৌঁছে দিয়ে বলল শীলা। 'দেখে নে, এটা বেড লাইটের সুইচ। সকালে তাড়াহুড়ো করে বিছানা থেকে ওঠার দরকার নেই। যতক্ষণ ইচ্ছা ঘুমা। এই যে এখানে কম্বল। বেশি শীত লাগলে সোফার ওপর লেপ রাখা আছে, নিয়ে নিস। এ ঘরে কেউ আসবে না। ইচ্ছে করলে ন্যাংটো হয়েও শুয়ে থাকতে পারিস। গুড নাইট।'

চলে গেল শীলা। ক্লান্তি লাগছে খুব। কাপড়-চোপড় সব খুলে কম্বলের নীচে ঢুকলাম। নরম বিছানায় এলিয়ে দিলাম আমার ততোধিক নরম শরীরটাকে। যেন কম্বলের উষ্ণতা নয়, কোন প্রেমিক পুরুষ জড়িয়ে ধরেছে আমাকে। আমার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে দিচ্ছে সে তার প্রেমের উষ্ণতা। আবেশে চোখ বুজলাম আমি। মনে হয় আলোটা না নিভিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কারণ বেশ কিছুক্ষণ পর আধো জাগরণের মধ্যে দেখলাম শীলার মুখটা আমার মুখের ওপর ঝুঁকে আছে; আমার শরীর থেকে কম্বল সরে গিয়েছিল, কম্বলটা টেনে দিল সে, তারপর আলো নিভিয়ে দিয়ে চলে গেল।

ঘুম ভাঙতেই দেয়াল ঘড়িতে দেখি সকাল দশটা বাজে। বাইরে সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে প্রকৃতি। নাম না জানা পাখিদের কলকাকলি শুনতে পেলাম। কম্বল সরিয়ে এক লাফে নামলাম বিছানা থেকে। নিজের নগ্ন সৌন্দর্য দেখে নিজেই মুগ্ধ। দুধে আলতায় মেশানো আমার গায়ের রং। কোমর ছাড়িয়েছে চুল। বাথরুমে ঢুকে ঠাণ্ডা-গরম

পানিতে গোসল করলাম। বেশ ঝরঝরে হয়ে উঠল শরীরটা। মনটাও উৎফুল্ল হয়ে উঠল। টাইট ট্রাউজার পরে, পলো কালারের সাদা নরম সোয়েটার গায়ে দিয়ে, চুলগুলো মোচার মত খোঁপা করে রান্নাঘরে ঢুকলাম।

রান্নায় ভীষণ ব্যস্ত শীলা। হাত দুটো দ্রুত নড়ছে তার। ঘেমে মুখটা ভিজে গেছে। দেখলাম একটা প্লেটে চালের গুঁড়োর রুটি, অন্য প্লেটগুলোতে গরুর মাংস, ডিম ভাজা, আলুভাজা, কাবাব ইত্যাদি। গ্রিলের নীচে ধীরে ধীরে গরম হচ্ছে টোস্ট, আর চা ফুটছে একটা পাত্রে।

আমি হাঁ হাঁ করে উঠলাম, বললাম, 'কী হুলস্থূল করছিস বল তো? এত সব খেতে পারব না আমি।'

'অবশ্যই খেতে পারবি। গ্রামে দ্রুত খিদে পায়। এখানে আসার আগে তো সেলিমের খিদেই লাগত না। এখন তো একেবারে রাক্ষুসে খিদে তার। পারলে আমাকেই খেয়ে ফেলে। ঘুম ভাল হয়েছে তো? এই গ্রিল নিয়ে হয়েছে এক যন্ত্রণা। আচ্ছা, টোস্টটা একদিকে একটু কালচে হলে তোর আপত্তি আছে? এখানে অনেক ছাগলের দুধ পাওয়া যায়। তোকে কিন্তু প্রচুর দুধ খেতে হবে। আর ভাল কথা, এই পোশাকে বাইরে বেরোস না। একেবারে রেপ্‌ড্‌ হয়ে যাবি।'

আমি কোন উত্তর দিলাম না। প্রচুর খেলাম। এত খিদে কোথায় ছিল? খাওয়া দাওয়ার পর প্লেটগুলো ধুতে শীলাকে সাহায্য করলাম আমি। ও যদিও আপত্তি করতে লাগল, কিন্তু আমি শুনলাম না।

'দুর্গটা ঘুরে দেখ,' বলল শীলা। 'তালা মারা ঘরগুলোতে সুরঞ্জিতবাবুরা থাকে। অন্য যে কোন ঘরেই ঢুকতে পারিস তুই।'

'বেশ,' বললাম আমি। 'একটু পরেই ফিরছি। ওঃ, ভাল কথা, কালরাতে আমার গায়ে কম্বল টেনে দেয়া, আর আলোটা নিভিয়ে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।'

'কম্বল টেনে দেয়া? আলো নিভিয়ে দেয়া? কী বলছিস তুই, বুঝতে পারছি না। সেলিম আর আমি যখন ওপরে এলাম তখন তো আলো নেভানোই ছিল। তুই তো ঘুমে একেবারে কাদা হয়ে ছিলি। কয়েকবার ডেকেও সাড়া পাইনি।'

'কিন্তু রাতে একবার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমার,' বললাম আমি। 'তখন তুই ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলি আমার ওপর। আমার গা থেকে কম্বল সরে গিয়েছিল। ঠাণ্ডায় জমে গিয়েছিলাম আমি। তুই আমাকে ভাল করে ঢেকে দিলি, তারপর আলোটা নিভিয়ে দিলি।'

'ওসব কিছুই করিনি আমি,' বলল শীলা। 'নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখেছিস তুই। এখন যা। দুর্গটা ঘুরে দেখ। আজ আর অফিসে যাচ্ছি না। লাঞ্চ তৈরি হলেই তোকে ডাকব।'

আর কিছু বললাম না আমি। কার্পেট মোড়া বারান্দা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। দেয়াল জুড়ে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দৃশ্যের অয়েল পেন্টিং। মুগ্ধ চোখে দেখতে লাগলাম সব কিছু। বাঁ দিকের মোড় ঘুরতেই দেখতে পেলাম একটা লম্বা ও চওড়া হলঘর। ঘরটাতে সাতটা বড় জানালা। ওগুলো দিয়ে ভেতরে এসে পড়েছে সূর্যের আলো। ঘরের অন্যদিকে শ্বেতপাথরের অনেক মূর্তি। গুনে দেখলাম, প্রায় ষাটটা হবে। তারমধ্যে গতরাতে দেখা সেই লাজুক সুন্দরীকে দেখতে পেলাম। একেবারে জীবন্ত মনে হচ্ছে ওটাকে। তার দু'স্তনের মাঝে দ্যুতি ছড়াচ্ছে একটা সাপের মাথার আকৃতির লকেট। আর একটা মূর্তি আমার নজর কাড়ল। এক গ্রিক ক্রীড়াবিদের নগ্ন মূর্তি। চাকতি ছোঁড়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সে। আর তার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে আছে একটা শেয়ালের মূর্তি। শেয়ালের পেছনটা একজন নারীর মত। বিপরীত দিকের জানালাগুলো অয়েল পেন্টিং-এ ভরা।

মূর্তি বোঝাই এ ঘরে কোন দরজা না থাকায় কোন্‌দিকে যাব ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। অবশেষে ঘরের কোণে একটা ভারী দরজা দেখতে পেয়ে সেটা খুলে একটা লাইব্রেরিতে ঢুকে পড়লাম।

কোন অয়েল পেন্টিং নেই এখানে। কিন্তু রয়েছে খোদাই করা নানা রকমের মূর্তি। আলমারি ভর্তি বিখ্যাত লেখকদের বই। বেশ কিছুক্ষণ বই-পত্র ঘাঁটাঘাঁটি করলাম। জ্ঞান সমুদ্রে কিছুক্ষণ কাটানোর পর ভাবলাম, এবার বাড়িটার অন্য অংশগুলো দেখা যাক। আর ঠিক তখুনি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম, পেছনের যে দরজাগুলো আমি খোলা রেখে এসেছিলাম সেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। দরজার কাছে গিয়ে দেখলাম, শুধু

যে পাল্লাগুলো বন্ধ হয়েছে তা নয়, দরজায় তালাও দেয়া হয়েছে। আমি হতভম্ব হয়ে পড়লাম।

দরজা বন্ধ করার কোন শব্দ শুনতে পাইনি আমি। কোনরকম শব্দ করে দরজা বন্ধ হলে অবশ্য তা শুনতে পেতাম। এত নিঃশব্দে দরজাগুলো বন্ধ করল কে? ভয়ে শিউরে উঠলাম।

এবার সামনের দ্বিতীয় দরজা দিয়ে ঢুকলাম। প্রকাণ্ড বৈঠকখানা। দেয়ালগুলো হাল্কা লাল কাগজ দিয়ে মোড়া। ওপরে সুন্দরী মহিলাদের পোর্ট্রেট। এঁরা কারা? এই বাড়ির পূর্ব বাসিন্দারা? এত সুন্দরী মহিলা আমি আমার জীবনে দেখিনি।

বৈঠকখানা প্রাচীন আমলের ভারী চেয়ার-টেবিল দিয়ে সাজানো। চমৎকার নকশা করা। কিছু কাঁচের তৈরি চেয়ারও রয়েছে। শেষ পর্যন্ত সাহস করে একটা ছোট কাঁচের চেয়ারে বসে পড়লাম। অমনি মনে হলো দেয়ালের সুন্দরী মহিলারা আমার দিকে নাক উঁচু করে তাকাল। তাদের কারও হাতে শুকনো গোলাপ আবার কারও হাতে মাকড়সার জালের পাখা নড়ছে!

'আমার দিকে ওভাবে পাখা নাড়বেন না, ম্যাডাম,' হঠাৎ বলে উঠলাম আমি। ছবির সুন্দরী মহিলার হাতের পাখা আবার নড়ে উঠল। দুহাতে চোখ কচলে নিয়ে ভাল করে তাকালাম। কই, নড়ছে না তো! একেবারে স্থির। ছবি কি পাখা নাড়তে পারে? না, পারে না। অবশ্যই না। কিন্তু উনি তো পাখা নাড়লেন। আমি দেখেছি। ঠিক দেখেছি। নাকি আলোর কারসাজি? আবার চেয়ারে বসলাম। আবার প্রতিটি দেয়াল থেকে লম্বা, সুন্দরী মহিলারা আমার দিকে নাক উঁচু করে তাকাল। আবার শুনতে পেলাম নড়াচড়ার শব্দ। কারা যেন ঘুরছে ঘরময়। দ্রুত মাথা ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোথাও নড়াচড়ার চিহ্ন নেই। আর সাহস পেলাম না এ ঘরে থাকতে। ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করতেই ভেতর থেকে যেন স্বস্তির একটা দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলাম।

আবার চলে এলাম মূর্তি-ভর্তি হলঘরের কাছে। এর একেবারে শেষপ্রান্তে একটা চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে। বেশ কিছুটা উঠে একটা অর্ধ বৃত্তাকার চাতাল। সেখানকার একমাত্র জানালাটা একেবারে

অকার্যকর হয়ে আছে মূর্তিগুলোর কারণে। বিভিন্ন রঙের কাঁচের মূর্তি রাখা ওখানে। তাই আলোর পরিবর্তে ওখান থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে নানা ধরনের বিকৃত ছায়া। সিঁড়ির থামগুলো শক্ত আখরোট কাঠের তৈরি। তাতে বিভিন্ন ফুল ও লতাপাতা খোদাই করা। একটা নকশাকে ভাল করে দেখতে উপুড় হতেই এক বিশাল গোলাপের মাঝে একটা মূর্তির চোখে অশ্লীল ভঙ্গি দেখে চমকে উঠলাম। পেছনে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে হাতটা বাড়িয়েই আবার টেনে নিলাম, আঙুলের ডগায় ধারালো দাঁতের কামড় লাগল যেন। আর একটা মূর্তি জিভ বের করে আমাকে অশ্লীল ইঙ্গিত দিচ্ছে। ভয় পাবার জন্য নিজেকে ধমক দিলাম। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম ওপরে। চোদ্দটা ধাপ উঠতেই কে যেন পেছন থেকে আমার কোমর জড়িয়ে ধরল, মুখ ঘষতে লাগল নিতম্বে। আর একটু হলেই আর্তচিৎকার দিয়ে উঠেছিলাম। মুখ ফেরাতেই দেখি সিঁড়ির পাশের একটা মূর্তি ঢলে পড়েছে আমার ওপর। একেবারে জ্যান্ত লাগছে। মূর্তিটাকে ধরে দাঁড় করিয়ে আবার উঠতে শুরু করলাম। আরও ছাব্বিশটা ধাপের মাথায় গিয়ে শেষ হয়েছে সিঁড়িটা। তারপরেই ড্যান্স হল। হলের মেঝে একেবারে ঝকঝকে। দিনের আলোর মত ঝলমল করছে। নাচার পর বিশ্রামের জন্য দেয়াল বরাবর বসেছে এক গাদা সোফা ও চেয়ার। ছাদটা দেখাই যাচ্ছে না অসংখ্য ঝলমলে কাঁচের ঝাড়বাতির জন্য।

'লাঞ্চ!'

ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল আমার। হাঁপাতে লাগলাম। ঢিপ ঢিপ করে কাঁপতে লাগল বুকটা। ঘামে ভিজে গেল সমস্ত শরীর।

'লাঞ্চ রেডি, মৌসুমী। তাড়াতাড়ি আয়।'

মুখ ফেরাতেই দেখতে পেলাম ড্যান্স হলের শেষপ্রান্তে কে যেন বারান্দা পেরিয়ে দ্রুত পা ফেলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। আমি দৌড়ে ওর পিছু নিতেই শীলার সঙ্গে দেখা। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে আসছে সে।

'এই যে মৌসুমী, তাড়াতাড়ি আয়। লাঞ্চ রেডি।'

'জানি। তুই প্রথম যেবার বলেছিস, তখন শুনেছি।'

'প্রথম আবার কখন বললাম! বলছি তো এইমাত্র।'

'এইমাত্র? এর আগেও তো একবার ডাকলি। তাই আমি এদিকেই আসছিলাম। বড় সিঁড়ি দিয়ে না নেমে অনুসরণ করছিলাম তোকে।'

'আমাকে অনুসরণ করছিলি? চাপা মারার জায়গা পাস না! আমি তো এইমাত্র এলাম এখানে। আয়, সেলিম অপেক্ষা করছে। বাব্বাহ! খেতেও পারে মানুষটা।'

লাঞ্চে প্রচুর খাবারের আয়োজন করেছে শীলা। পাখির মাংস, বাগানের টাটকা সবজি, হাঁসের মাংস–খুবই সুস্বাদু লাগল খেতে। টেবিলে আরও রয়েছে গরম রুটি, জইয়ের পিঠে, ফল দেয়া পাউরুটি, বিস্কুট, কেক–আরও কত কী।

'এত অল্প সময়ের মধ্যে তুই এতসব রান্না করলি কী করে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'তিনটে চুলো আমার,' উত্তর দিল শীলা। 'দুটোতে রান্না চড়িয়ে আর একটার আয়োজন সেরে ফেলি। তোকে আরেকটু দিই?'

'কী বললি?'

'বলছি, তোকে আরেকটু হাঁসের মাংস দিই? ফ্রিজে অনেক আছে। গরুর মাংস, খাসির মাংস তো আছেই। হরিণের মাংসও আছে। দুটো ফ্রিজ একদম ঠাসা। রাতে তোকে হরিণের মাংস খাওয়াব।'

'ওঃ,' আমি বললাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর মগ ভরে চা ঢালল শীলা। 'এটা খেয়ে চল একটু বাইরে ঘুরে আসি,' বলল সে। 'তোর একটু খোলা বাতাস দরকার।'

ঠাণ্ডার জন্য ভাল করে উলের চাদর গায়ে দিলাম। পেছনের বাগানটায় পায়চারি করলাম কিছুক্ষণ। তারপর অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে বাগানের ডানদিকে নেমে গেলাম। সেখানে টিলার পাশে তিনটে হ্রদের মত তৈরি হয়েছে। তিন হ্রদের সঙ্গমস্থলে একটা শ্বেত পাথরের নারী মূর্তি। সম্পূর্ণ নগ্ন। মূর্তিটার কোমরের কাছে পানি ছলকে পড়ছে। চমৎকার দৃশ্য। আমি অভিভূত হয়ে দেখতে লাগলাম। হঠাৎ বললাম, 'আচ্ছা, এটা সামনের মেইন রাস্তা থেকে দেখা যায় না, তাই না?'

কোন উত্তর পেলাম না। মুখ ফিরিয়ে দেখি শীলা নেই। হঠাৎ ভয়

করতে লাগল আমার। 'শীলা! 'শীলা!!' চিৎকার করে ডাকলাম। 'কই তুই?'

কোন জবাব নেই। শুধু পানির কলধ্বনি শুনতে পেলাম।

ঠাণ্ডায় কেঁপে উঠলাম আমি। মনে হলো কেউ যেন আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি শক্ত হয়ে গেলাম। ধীরে ধীরে ঘোরালাম মাথাটা। না, কেউ নেই। কাঁপা গলায় ডাকলাম, 'শীলা!'

'এই যে!'

মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ালাম। দেখলাম একগুচ্ছ বুনোফুল হাতে পাশের একটা ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে শীলা। আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'এই তো আমি।'

'এতক্ষণ কোথায় ছিলি তুই?' গলাটা তখনও কাঁপছে আমার।

'একটু ঝোপের মধ্যে ঢুকেছিলাম ফুল তুলতে। খুব সুন্দর, তাই না? কিন্তু তুই এতক্ষণ বলছিস কেন?'

'কতক্ষণ ধরে তোকে ডাকছি! অন্তত তিনবার ডেকেছি। কোন সাড়া নেই তোর। দেখতেও পাইনি তোকে। কোথায় গেলি তাও বুঝতে পারিনি।'

'তোর ডাক আমি শুনিনি। হয়তো উবু হবার জন্য কানদুটো ঝোপে ঢাকা পড়েছিল। তা, কেন ডাকছিলি আমাকে?'

'এমনি।'

'ফিরবি এখন? আমার ঠাণ্ডা লাগছে। তা ছাড়া রাতের খাবারের ব্যবস্থাও করতে হবে। নাকি তুই এখানে আরেকটু থাকবি?'

'না, না আমিও তোর সঙ্গে যাব।' যেন আর্তনাদ করে উঠলাম আমি।

'কী ভীতু মেয়েরে বাবা!' আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল শীলা।

আমার সব কথাকে ও হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে দেখে হঠাৎ রেগে গেলাম আমি। বললাম, 'আমি যা দেখেছি সেসব তুই দেখলে ভয়ে মরে যেতি।'

'ঠিক আছে, মৌসুমী। এনিয়ে মাথা গরম করার কিছু নেই।' হঠাৎ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করল সে। ঘরে পৌঁছানো পর্যন্ত দুজনেই নিঃশব্দে

হাঁটলাম। দরজার কাছে এসে একটু থেমে বললাম, 'আমি দুঃখিত, শীলা। ওভাবে কথাটা বলতে চাইনি আমি। ব্যাপারটা হলো এখানে আসার পর থেকে এমন সব অদ্ভুত কিছু শুনছি আর দেখছি যা তুই একটুও বিশ্বাস করছিস না।'

'আমি বিশ্বাস করি তুই অনেক কিছু শুনছিস আর দেখছিস। কিন্তু এসবই তোর কল্পনা। তুইও সেটা জানিস। এত বড় দুর্গ দেখে তুই কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠেছিস।'

'তা হলে তুই বলতে চাইছিস সবই বানিয়ে বলছি আমি? নাকি ভূতের ওঝা দেখাতে হবে আমাকে?'

'চল, চা খাবি।'

'চা খেলেই বুঝি সব অসুখ সেরে যাবে?'

রান্নাঘরে ঢুকল শীলা। কড়া করে চা বানাল। বড় এক কাপ চা রাখল আমার সামনে। তারপর একটা বক্স থেকে দুটো লাল রঙের ট্যাবলেট বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিল। 'এই নে। ঘুমের ওষুধ দুটো খেয়ে নে।'

'ধন্যবাদ। ঘুমের ওষুধের দরকার নেই আমার,' বললাম আমি।

'মৌসুমী, এটা খেলে তুই রিল্যাক্সড বোধ করবি। মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে তোর। ঘুমের ওষুধ খেলে মনটা শান্ত হবে। এতে শারীরিক কোন ক্ষতি হবে না।'

'ঠিক আছে, তুই যদি খুশি হোস, তা হলে খাচ্ছি।'

রাতে শীলা ও সেলিমের সঙ্গে এক টেবিলে খেলাম। টিভি দেখলাম এক সঙ্গে। চুটিয়ে আড্ডা দিলাম। তবে ভেতরে ভেতরে আমার মনটা থরথর করে কাঁপতেই থাকল।

আমার শোবার ঘরে এলাম আমি। কাপড়-চোপড় খুললাম। তারপর সুইচ টিপে বাতিটা নেভালাম। ঢুকলাম কম্বলের নীচে। হাতটা কম্বলের ভেতরে ঢুকিয়ে নিলাম। হঠাৎ ঘুম ভাঙল আমার। দেখলাম শীলা ঝুঁকে পড়ে বাতিটা নিভিয়ে দিল, আর আমার হাতটাকেও কম্বলের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল।

সকালে নাশতা খাবার সময় এ ব্যাপারে কিছুই বললাম না। নাশতা

শেষ করে দুর্গটার বাকি অংশগুলো দেখতে ওপরে উঠে গেলাম। কেমন যেন ছমছম করতে লাগল শরীরটা। অথচ এরকম একটা দুর্গ দেখা আমার সারা জীবনের শখ। কিন্তু এখানে আসার পর থেকে শুধু ভয়ই পাচ্ছি, কোন কিছুই উপভোগ করতে পারছি না। আসলে মুশকিলটা হচ্ছে, প্রথম দিন সন্ধ্যায় শীলা যখন ভেবেছিল যে সেলিম আমার মালপত্র নিয়ে ওপরে উঠছে তখন তার পায়ের শব্দ ছাড়া আমি আর কিছুই শুনিনি বা দেখিনি। আর আমি ছাড়া অন্য কেউ কিছু শুনছে না বা দেখছে না। তা হলে কি সমস্যা আমারই?

আর তখনই আমার মনে পড়ে গেল ফটকটার কথা। শীলার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে পরে আমিও লক্ষ করেছি, গাড়ি ঢুকতে পারে মাত্র একটি ফটক দিয়ে। কিন্তু অন্য ফটকগুলো দু'ফুটের বেশি চওড়া নয়, গাড়ি ঢোকার প্রশ্নই ওঠে না। তা হলে আমি ভেতরে ঢুকেছিলাম কী করে?

অনেকগুলো পায়ের দৌড়ে যাবার শব্দ শুনতে পেলাম। চমকে উঠলাম আমি। দেখলাম অনেকগুলো অস্পষ্ট মূর্তি আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। তারপর আর একটা, তারপর আরও একটা। হাসছে খিলখিল করে। বারান্দার একটা দরজা খুলে গেল, আবার বন্ধ হয়ে গেল, সশব্দে। তারপর নিস্তব্ধতা।

ভয়ে কাঁপতে লাগলাম আমি। এগোতে লাগলাম দেয়ালের পাশ দিয়ে। পিঠটাকে দেয়ালের দিকে রেখে চলতে লাগলাম। একটা দরজা পেয়ে পাগলের মত হাতল ঘোরালাম। খুলে গেল দরজা। আমি এই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতেই সেটা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝলাম, ভুল দরজা খুলেছি আমি। বারান্দার বদলে পৌঁছে গেছি একটা সরু প্যাঁচানো সিঁড়ির মাথায়। জায়গাটা আবছা অন্ধকার। পাথরের দেয়ালের গায়ের ছোট্ট একটা ফোকর দিয়ে সামান্য আলো আসছে। কিন্তু সেটাও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে মাঝখানে একটা স্তম্ভ থাকায়। ভয়ে পিছু হটলাম। দরজাটা আবার খুলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু খুলল না। চিৎকার দিলাম। গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরোল না। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে গলা। বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করছে। ঠোঁট দুটো সেঁটে আছে

পরস্পরের সাথে। আমি বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এক সময় ভয় কেটে গেল। মনে সাহস সঞ্চয় করে ভাবলাম, যে করে হোক এখান থেকে বেরোতে হবে আমাকে। দরজার হাতল টানলাম। খুলল না। অবশেষে বুকে সাহস এনে অন্ধকার প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগলাম। কী জমাট অন্ধকার! তার মধ্যেই সিঁড়ি ভাঙতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত একটা দরজা দেখতে পেলাম।

দরজাটা খোলার সাহস হলো না আমার। ওপরে একটা বন্ধ দরজা, আর এই প্যাঁচানো সিঁড়ি শেষে এক অজানা জগৎ–এই দুইয়ের মাঝখানে আটকা পড়েছি আমি।

হঠাৎ ওপর থেকে তালা খোলার ক্লিক শব্দ ভেসে এল। একই সঙ্গে শোনা গেল কবজার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ। আমি সামনের দরজার দিকে ছুটে গিয়ে একটা বড় পাথরের ঘরে ঢুকে পড়লাম। শুনতে পেলাম, এইমাত্র যে সিঁড়িটা আমি ছেড়ে এসেছি, কে যেন নীচে নামছে সেই সিঁড়ি বেয়ে। আমি ঘর থেকে বের হবার জন্য ছোটাছুটি করতে লাগলাম। এক কোনায় একজোড়া ভারী দরজা চোখে পড়ল। কিন্তু আড়াআড়ি ভাবে পুরু কাঠ পেতে পেরেক মারা। অন্য কোণে আরেকটা ছোট দরজা দেখতে পেলাম। ছুটে গেলাম সেদিকে। টানলাম, ধাক্কা দিলাম, লাথি মারলাম। সেটাও তালামারা।

প্যাঁচানো সিঁড়ির নীচে একটা ছোট দরজা দেখতে পেলাম। ওখানে একটা পা দেখতে পেয়েই চিৎকার করে উঠলাম।

'মৌসুমী, আমি!' শীলার কণ্ঠ। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল সে। 'তোর দরজা ধাক্কানোর শব্দ শুনে এসেছি। তোকে সাবধান করা হয়নি; এই দরজার লকটা নষ্ট। ঠিক মত কাজ করে না। নতুন তালা লাগাতে হবে। তুই ঠিক আছিস তো?'

'হ্যাঁ,' কোন মতে বললাম আমি। 'এখন ঠিক আছি। কিন্তু আমি দরজা ধাক্কাইনি। তা হলে কী করে শব্দ শুনলি? এতক্ষণ ভয়ে আধমরা হয়ে ছিলাম। এই দরজাটায় লাথি মেরেছি ঠিকই, কিন্তু তুই তখন নীচে নেমে আসছিলি।'

'কী জানি! আমি তো শব্দ শুনলাম ওপর থেকে। লাঞ্চের সময় যখন তোর খোঁজ করছিলাম, তখনও শুনেছিলাম।'

'এখন কোন্ পথে বের হব?' বললাম আমি।

'যে পথে এসেছি। আমিই তো ধাক্কা মেরে দরজা খুলেছি।' উত্তর দিল শীলা।

'ওই পথেই যেতে হবে?'

'হ্যাঁ। ওটাই সোজা পথ।'

'কিন্তু আমরা তিনজন হলে ভাল হত।'

'কেন?'

'আমি তা হলে মাঝখানে থাকতাম।' হাসতে গিয়েও গলা কেঁপে উঠল আমার। 'তুই আগে যা। আমি তোর পিছু পিছু যাব।'

'পা বাড়াল শীলা। আমি ওর পেছন পেছন আসতে লাগলাম। কিন্তু আমার পেছনে পা ফেলার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম আমি। শীলাকে বলতেই হেসে উড়িয়ে দিল সে। বলল এটা নাকি আমার বিভ্রম। কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করলাম কেউ একজন আমার পেছনে ঠিকই আসছে। কিন্তু সাহস হলো না ঘুরে তাকানোর।

এরপর থেকে কয়েকটা দিন আমি শীলার সঙ্গেই থাকলাম।

এক মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করি না তাকে। কিন্তু সেদিন বিকেলে জোর করে সে বাগানে পাঠাল আমাকে বেড়াতে। আমি বাগানে বেড়াতে গেলাম। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম অনেক দূর, প্রায় সিকি মাইল। প্রচণ্ড বাতাস বইতে লাগল। চুল উড়তে লাগল আমার। ওড়নাটা বারবার উড়ে যেতে লাগল। রাস্তার পাশের কলাগাছগুলো যেন ভেঙে পড়তে লাগল একটা আরেকটার ওপর। এমন সময় দুর্গের দিক থেকে একটা অস্পষ্ট চিৎকার ভেসে এল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি একটা মূর্তি দুর্গের ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়ছে আর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে আমার। চিনতে পারলাম ওটা শীলা। এবার ওর চিৎকার শুনতে পেলাম:

'মৌসুমী.... তাড়াতাড়ি.... সেলিমের পা ভেঙেছে...

দৌড়ে ফটকে পৌঁছে গেলাম আমি। হাঁপাতে লাগলাম। শীলাও

উঠন পেরিয়ে দৌড়ে এল আমার দিকে।

'কী হয়েছে, শীলা? সেলিমের পা ভেঙেছে?' হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম।

'কী যা-তা বলছিস, মৌসুমী?'

পরস্পরের দিকে এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম দুজনে। তারপর আমি বললাম, 'তুই তো ছাদ থেকে আমাকে ডাকলি।'

'আমি?' যেন অবাক হলো শীলা, বলল, 'আমি তো শুনলাম তুই আমাকে ডাকছিস।'

'কই, আমি তো ডাকিনি!'

'আমিও তো তোকে ডাকিনি।'

কয়েক মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমরা। অনিশ্চয়তার ঈষৎ ঝিলিক দেখতে পেলাম শীলার চোখে। কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে গেল সে, এমন সময় ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলো সেলিম। 'কী ব্যাপার, কী হয়েছে?' চিৎকার করে বলল ও।

আমরা দুজনে ওর দিকে তাকালাম।

'তুমি ভাল আছ তো, শীলা?' উদ্বিগ্ন গলায় বলল সেলিম। 'আল্লার দোহাই, আমার কথার উত্তর দাও। তোমরা দুজনেই এমনভাবে চিৎকার করছিলে কেন?'

'আমরা মোটেই চিৎকার করিনি,' ফিসফিস করে বলল শীলা।

'হেঁয়ালি কোরো না,' সেলিম বলল। 'আমি নিজের কানে শুনেছি তুমি ছাদের ওপর থেকে চিৎকার করছ, আর মৌসুমী চিৎকার করছে রাস্তার ওপর থেকে। তারপর দুজনেই ডাকতে লাগলে আমাকে। কী হয়েছে, বলো তো?'

'কিচ্ছু হয়নি।'

'আমাকে ডাকলে কেন তা হলে?'

'তোমাকে আমরা কেউ ডাকিনি,' বললাম আমি। 'দুজনেই ছুটে এসেছি একে অপরকে ডাকতে শুনে। কিন্তু এখন জানলাম আমরা কেউ কাউকে ডাকিনি। না তোমাকে, না অন্য কাউকে।'

'আশ্চর্য!' বলল সেলিম। 'কী যে বলছ তোমরা! যাক, ঘরে চলো,

কফি খাবো। নাকি অন্যকিছু খাবে?' আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপল সে। 'ঘরে হুইস্কি আছে।'

'আহ, সেলিম!' বলল শীলা। 'তোমার দরকার হলে তুমি খাবে। আমার বান্ধবী আর আমি কফি খাব। সঙ্গে রুটি-কাবাব। চলো।'

ঘরে ঢুকলাম আমরা। কফির মগে চুমুক দিতে দিতে আমি বললাম, 'আমার বোধহয় কুমিল্লা ফিরে যাওয়া উচিত। এখানে থাকা আর ঠিক হচ্ছে না।'

'কেন?' শীলা বলল।

'আমার জন্যই কেমন সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে!'

'বাজে কথা বোলো না,' সেলিম বলল। 'আসো, আমরা তাস খেলতে বসি।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিবেশ হাল্কা হয়ে উঠল। নানা বিষয় নিয়ে খোশ গল্প জুড়ে দিলাম আমরা। সেই সঙ্গে চলল তাস খেলা। রুটি-কাবাব সাবাড় করেছি আগেই। আরেক দফা রুটি-কাবাব পরিবেশন করল শীলা। সন্ধ্যা হয়ে এল। সেলিম গেল তার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। আমি আর শীলা গল্প করতে লাগলাম।

'আচ্ছা, মৌসুমী,' এক সময় শীলা বলল, 'ভূত সম্পর্কে কী জানিস তুই, বল তো? তোর তো অনেক পড়াশোনা এ ব্যাপারে।'

'অনেক পড়াশোনা করলেও সত্যিই কিছু জানি না আমি। সত্যিকারের কোন অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি। ভেবেছিলাম তোদের এই দুর্গটাকে খুব উপভোগ করব আমি, কিন্তু তার বদলে ভয় পেয়ে গেছি। মনে হচ্ছে তোদের এখানে ভূতের বসবাস। দুর্গ সম্পর্কে যে রহস্য-রোমাঞ্চের কথা পড়েছি, এখানে সেই অনুভূতি খুঁজে পাচ্ছি না। শুধু রক্ত জমাট করা ভয় আর ভয়। তোদের এই প্রাচীন দুর্গটাকে যত ভাল লাগবে বলে ভেবেছিলাম, এখন মোটেই সেরকম লাগছে না।'

'তাই বলে চলে যাবি?' শীলার গলা উৎকণ্ঠিত। চোখে মুখে উদ্বেগ। মায়া হলো আমার। তাড়াতাড়ি বললাম, 'না, না, থাকছি আমি।'

পরের সপ্তাহটা পাশাপাশি থেকে কাটালাম আমরা, শুধু শোবার

সময় যে যার ঘরে চলে যেতাম। কিন্তু সে যে এখনও প্রতিরাতে আমার ঘরে ঢুকে আমার হাতটা কম্বলের নীচে ঢুকিয়ে দেয়, নিভিয়ে দিয়ে যায় ঘরের আলো, এসব কথা কিছুই বলি না শীলাদেরকে। দুজনে মিলে ঘর দোর পরিষ্কার করি, বিছানাপত্র রোদে দিই, থালা-বাসন ধুই, তরকারি কাটি, রান্না করি, যতটা সম্ভব ডুবে থাকি কাজের মধ্যে। একদিন শীলা বলল, 'দেখ, মৌসুমী, তুই তো এখানে কেবল থালাবাসন ধুতে আর রান্না করতে আসিসনি। এসেছিস ছুটি উপভোগ করতে। এখন তো ভয় কেটে গেছে। কোন আওয়াজ-টাওয়াজও শোনা যায় না। কাজেই ছাদে গিয়ে গ্রামের চারদিকের দৃশ্য দেখে আয়। দেখবি, ভাল লাগবে।'

সুতরাং সকালে নাশতা করেই ছাদে উঠলাম। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ শ্যাওলা ঢাকা একটা পাথর আমার চোখে পড়ল। ভাল করে তাকাতেই মনে হলো ওপরে কিছু একটা লেখা আছে। বসলাম ওখানে। নখ দিয়ে শ্যাওলা সরাতেই দেখতে পেলাম, সেখানে লেখা :

অ্যাডাম ম্যাক ভাইকার,

তারিখ-১৮০৯ খ্রিস্টাব্দ।

এখানে হঠাৎ অ্যাডাম ম্যাক ভাইকারের নাম খোদাই করা কেন? সে কি এই দুর্গের কোন কর্মচারী ছিল? দুর্গের মালিকের মেয়ের প্রেমে পড়ে খুন হয়? হঠাৎ মনে পড়ল, শীলা বলেছিল এই দুর্গের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছিল ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে। তা হলে কি অ্যাডাম ম্যাকভাইকার একজন রাজ মিস্ত্রি ছিল? সব রাজ মিস্ত্রির-ই থাকে পাথরে নিজের নাম খোদাই করার বাসনা। হঠাৎ চমকে উঠলাম কারও হেঁটে যাবার শব্দ শুনে। দীর্ঘ পদক্ষেপে হাঁটছে কেউ। আরেকজনের হাঁটার শব্দ শুনলাম, হালকা পদক্ষেপ, ঈষৎ খসখসে শব্দ করে।

ক্রমেই এগিয়ে আসছে পায়ের শব্দ। শোনা যাচ্ছে অস্পষ্ট গুঞ্জন। একজন পুরুষ ও একজন নারীর প্রেমালাপ। চুমুর শব্দও কানে এল। প্রথমে আপত্তি, তারপর খুশির নিঃশ্বাস। পদশব্দ ছাদের কোনার দিকে সরে যেতে লাগল। সাহস সঞ্চয় করে উঠে দাঁড়ালাম আমি। জুতোর গোড়ালিতে ঘষা লেগে শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো ভারী পায়ের শব্দটা আমার দিকে এগিয়ে এল।

'কে?' বলল একটা পুরুষ কণ্ঠ। 'কে ওখানে? বেরিয়ে এসো। কে গোপনে নজর রাখছ আমার ওপর? বেরিয়ে এসো বলছি।' ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাঁটু ভেঙে বসে পড়লাম আমি। পায়ের শব্দ আমার পাশে এসে থামল।

'কী আশ্চর্য!' পুরুষ কণ্ঠটা আবার শুনতে পেলাম। 'কাউকে তো দেখছি না, ধ্যাৎ–।'

পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কোন রকমে ছাদ থেকে নেমে আমি রান্নাঘরের দরজায় পৌঁছেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম।

যখন জ্ঞান ফিরে এল, দেখলাম আমার মুখের ওপর ঝুঁকে আছে শীলা, আস্তে আস্তে চাপড় মারছে আমার মুখে। ভয়ে রক্তশূন্য হয়ে গেছে তার মুখ।

'কী হয়েছেরে, মৌসুমী?'

ছাদের ঘটনা খুলে বললাম আমি। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল শীলা। বলল, 'তা হলে শোন তুই ছাদে ওঠার পর কী ঘটেছে–

'তুই তো ছাদে গেলি। আমি ময়দা মাখতে বসেছি, এমন সময় নিজ থেকে দরজা খুলে গেল। মুখ ফিরিয়ে দেখি কেউ নেই। ভয়ে কেঁপে উঠলাম। শুনতে পেলাম একটা পায়ের শব্দ টেবিলের দিকে আসছে। আমি সরে গেলাম। টেবিলে কিছু রাখার শব্দ হলো। ডিশের আওয়াজ হলো। মেঝের ওপর শুনলাম চেয়ার টানার শব্দ। কে যেন বসল চেয়ারে। ক্যাঁচ করে শব্দ হলো। বুঝতে পারলাম রান্নাঘরে আমি একা না। আরেকজন আছে। অশরীরী। যাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না।

তারপর আর কোন শব্দ নেই। যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে আবার ময়দা মাখতে বসলাম। আর তখনই–তখনই–দেখলাম আরও এক জোড়া হাত ময়দা মাখতে শুরু করেছে। হ্যাঁ, আমি স্পষ্ট দেখলাম। কিন্তু কোন মানুষকে দেখতে পেলাম না। ময়দার তালের ওপর আঙুলের ছাপ দেখলাম। ময়দার তালটাকে ওঠানো-নামানো করতে দেখলাম। কিন্তু মানুষ দেখলাম না। আমি তখন ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলাম তোকে খুঁজতে। দেখি, এখানে পড়ে আছিস তুই। আমি ভয় পেয়েছি, মৌসুমী,

ভীষণ ভয় পেয়েছি।'

একটানা কথা বলে হাঁপাতে লাগল শীলা।

আমি বললাম, 'চল, সেলিমকে ডেকে আনি। সে এলে আমরা দুজনে সাহস পাব।'

শীলাকে টেনে তুললাম আমি। দুজনে পোশাক ঠিক করছি এমন সময় দরজা ঠেলে সেলিম ঢুকল ভেতরে। তাকে দেখে দুজনে চিৎকার করে উঠলাম।

'কী হচ্ছে এসব?' গলা চড়িয়ে বলল সেলিম। 'চুলোয় কী পুড়ছে?'

আমরা কোন জবাব দিলাম না।

'রান্নাঘরের জানালা দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।' আবার বলল সেলিম। 'ব্যাপারটা কী?'

তখনও নিশ্চুপ আমরা। বিরক্ত হয়ে সেলিম আমাদের দুজনকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেল। দরজা খুলতেই মিষ্টি পোড়া গন্ধ নাকে এল, সেই সঙ্গে দম বন্ধ করা ধোঁয়া।

'আমার পুডিং!' চিৎকার করে বলল শীলা। আমরা রান্নাঘরে ছুটে গেলাম।

সবগুলো জানালা খুলে দিল সেলিম। আমি পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগলাম। টেবিলের দিকে আঙুল তুলে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল শীলা। আমাকে জড়িয়ে ধরল। দেখলাম, মাখানো ময়দাটা টেবিলের একপাশে সুন্দর করে সাজানো। বোঝা গেল, একটু আগে টেবিলটা পরিষ্কার করেছে কেউ, ময়দা মাখার গামলাটাও ধুয়ে মুছে রেখেছে। শীলা ও আমি ভূত দেখার মত সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

সেলিম এসবে অবাক হলো না। অবাক হবার কথাও নয়। 'চুলোয় কী?' জিজ্ঞেস করল সে। তারপর বলল, 'পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এখনও ইলেকট্রিক কুকার ব্যবহার করতে শেখনি তুমি?' রেগুলেটারে ৬৫ ডিগ্রি দেখিয়ে হাসতে লাগল।

তাড়াতাড়ি রেগুলেটারের সুইচটা ঘোরাল শীলা। বলল, 'আমি তো কুকার জ্বালাইনি। নিশ্চয়ই ও জ্বালিয়েছে।'

'কে? মৌসুমী?' হেসে বলল সেলিম।' 'ওকে পুডিং বানাতে দেয়া

ঠিক হয়নি তোমার।'

'না, মৌসুমী নয়। ও ছাদে ছিল তখন। আমি বলছি যে ময়দা মাখতে বসেছিল তার কথা।' বলেই কাঁদতে শুরু করল শীলা।

বোকার মত তাকিয়ে রইল সেলিম। আমি তখন সব কিছু খুলে বললাম তাকে। সব শুনে হাসতে লাগল সে।

আমি বললাম, 'শোন, সেলিম, ঠাট্টার কোন বিষয় না। আমি নিজেও ভয় পেয়েছি। কেন এসব হচ্ছে বুঝতে পারছি না। শুধু জানি আমি আসবার পর থেকেই এসব হচ্ছে। তাই আমার চলে যাওয়াই ভাল।'

'না,' বলল সেলিম। 'আমরা চাই না তুমি চলে যাও। কেউ একজন এসব ঘটাচ্ছে। কে সে? তোমাকে দোষ দিচ্ছি না, মৌসুমী। তোমাকে দেখেই বোঝা যায়, কতটা ভয় পেয়েছ তুমি।'

সেদিন রাতেও শীলা এল আমার ঘরে। আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে আলো নিভিয়ে দিল। কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল আমার ঠাণ্ডা হাতটা। সকালে একথা কাউকে বললাম না আমি। কিন্তু সেলিম বেরিয়ে যাবার পরপরই আমাকে উল্টো জিজ্ঞেস করল শীলা, 'রাতে আমাদের বেডরুমে কেন ঢুকেছিলি?' আমি তার দিকে তাকালাম। বললাম, 'আমি তোদের ঘরে যাইনি।'

'অবশ্যই গিয়েছিলি। আমি স্পষ্ট দেখলাম, তুই আমার ওপর ঝুঁকে আছিস, তারপর বাতিটা নিভিয়ে দিলি।'

'ঠিক যেরকম এখানে আসার পর থেকে প্রতিটা রাতে তুই আমার, ওপর ঝুঁকে পড়ে বাতিটা নিভিয়ে দিস?'

'মানে?'

'তোর নিশ্চয় মনে আছে, যেদিন প্রথম তোদের এখানে এলাম, সকালে তোকে বলেছিলাম। তারপর থেকে প্রতি রাতেই এটা ঘটছে। কিন্তু তোকে বলিনি, কারণ তুই বা সেলিম বিশ্বাস করবি না। তা ছাড়া তোকে ভয় দেখাতে চাইনি। বিশ্বাস কর, তোদের ঘরে কাল রাতে আমি যাইনি।'

এরপর দুজনে থালাবাসন ধুয়ে ফেললাম। শীলা রান্নায় মন দিল, আমিও উঠে গেলাম ওপরে। আমার ঘরটা ঝাড় দিলাম, তারপর কাগজ

কলম নিয়ে বসলাম চিঠি লিখতে।

বেশ কিছু চিঠি লিখলাম। প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল। নীচে নামলাম শীলাকে দেখতে। রান্নাঘরে ঢুকতেই দেখলাম শীলা মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ময়দা, ডিম সব চারদিকে ছড়ানো।

শীলার চোখে মুখে পানি ছিটোলাম। ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল তার। চোখের পাতা খুলল, কিন্তু চিনতে পারল না আমাকে। বরং জোরে কাঁদতে লাগল। তারপর ক্ষীণস্বরে ডাকতে লাগল সেলিমকে। তাকে শান্ত করতে গালে চড় মারলাম। কান্না থামাল শীলা। বলল, 'সেলিম, আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো।'

'শীলা, কী হয়েছে?' শীলার কাঁধ দুটো ঝাঁকালাম আমি।

'আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো, সেলিম। এখানে থাকতে চাই না আমি।' শীলা হিস্টিরিয়ার মত শুধু এক কথাই বলে যেতে লাগল।

সেলিমকে খুঁজতে বেরোলাম আমি। অফিসে পেলাম না। বাড়িতে শীলা একা। কী করব বুঝতে না পেরে বাগানের এক কোণে দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ একটা ঘন ঝোপের আড়াল থেকে চাপা ফোঁপানির আওয়াজ কানে এল। ঝোপটার কাছে গিয়ে সবিস্ময়ে দেখলাম, ভয়ার্ত শিশুর মত কাঁদতে কাঁদতে সেলিম অন্ধের মত ঝোপটাকে হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

'সেলিম!' ওর নাম ধরে ডাকলাম আমি। ও চোখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখেই চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল। দেখলাম জ্ঞান হারিয়েছে। কী করব বুঝতে পারছি না। কয়েক মিনিট ধরে সেলিমের জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলাম। কোন লাভ হলো না। তাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বাধ্য হয়ে দুর্গে ফিরে গিয়ে গ্রামের ডাক্তারকে ফোন করলাম।

খুব দ্রুত চলে এলেন ডা. আব্দুল্লাহ শাহরিয়ার। সেলিমকে পাঁজা-কোলা করে ঘরে নিয়ে এলেন। শীলা তখনও রান্নাঘরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে, আর বিড় বিড় করে বলছে তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে। শীলাকে ঘরে আনা হলো।

'এবার বলুন, ওদের কী হয়েছিল?' আমার কাছে জানতে চাইলেন

ডা. শাহরিয়ার।

'আমি কিছুই জানি না,' বললাম আমি। 'আপনি এসে যে রকম দেখেছেন, আমিও সেভাবে পেয়েছি।'

'আপনার কী ধারণা?'

তাকে গত কয়েক দিনের ঘটনাগুলো বললাম। শুনতে শুনতে ডা. শাহরিয়ারের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'সত্যিই অদ্ভুত। এ দুর্গে এর আগে কখনও এমন ঘটনা ঘটেনি। দুর্গটা বহু প্রাচীন হলেও একে ঘিরে কোন গল্প শোনা যায়নি। যদি কোন ভৌতিক ব্যাপার থাকত, তা হলে এখানে কেউ চাকরি নিয়ে আসত না।'

'কিন্তু, শাহরিয়ার সাহেব, এখানে যে কিছু অদ্ভুত জিনিস আছে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন অলৌকিক কিছু দেখে ওরা ভয় পেয়েছে?'

'তা ছাড়া আর কী?'

'আপনি নিজেই কি অলৌকিকে বিশ্বাস করেন?'

'অন্তত এখানে আসার পর থেকে বিশ্বাস করছি। এতসব অদ্ভুত কাণ্ড ঘটছে, বিশ্বাস না করে উপায় কী?'

'মি. সেলিম আর মিসেস শীলাও কি এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে এক মত?'

'প্রথমে একমত ছিল না। আমার কথা শুনে ওরা হাসত। বলত, এসব আমার কল্পনা। কিন্তু পরে যখন নিজেরা এসব দেখতে লাগল, তখন নিশ্চয় ধরে নিয়েছে কিছু একটা আছে এখানে।'

'আচ্ছা। যা হোক খুব ভয় পেয়েছে এরা। তবে হাসপাতালে নেয়ার দরকার নেই। একটা নার্স পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে-ই দেখাশোনা করবে এদের। দুজনকেই ইনজেকশন দিয়েছি। কাল সকালে এসে আবার দেখে যাব।'

সকালের দিকে অনেকটা ভাল হয়ে উঠল শীলা। কিন্তু সেলিমের অবস্থা আরও খারাপ হলো। সে শুধু কাঁদছে। ডা. শাহরিয়ার এসে সেলিমকে পরীক্ষা করে দেখলেন। বললেন, 'মিস মৌসুমী, একে

হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। আমি ব্যবস্থা করছি। আপনি মিসেস শীলার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করুন কী ঘটেছিল!'

সেলিমকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেলেন ডা. শাহরিয়ার। আমি শীলার পাশে গিয়ে বসলাম।

'সব কথা খুলে বল আমাকে,' শীলাকে বললাম আমি। 'কিছুই বাদ দিবি না।'

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল শীলা। তারপর বলতে শুরু করল: 'আমাকে তো রান্নাঘরে রেখে বেরিয়ে গেলি তুই। আমি ট্রে বের করার জন্য সবে উবু হয়েছি, অমনি পেছনে একটা ঢোক গেলার শব্দ শুনলাম। চমকে উঠে ফিরে তাকিয়ে দেখি এক মহিলা হাঁ করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তারপর আরও অনেককে দেখলাম। সবাই ঘিরে দাঁড়াল আমাকে। এর মধ্যে একজন চোদ্দ-পনেরো বছরের কিশোরী ছিল। সে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বলল—আপনি ঠিকই বলেছেন মিসেস ম্যাকভাইকার, এটা একটা ভূত।

'ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল তিনজন পুরুষ। সবার পরনে গাঢ় সবুজ রঙের পোশাক, সোনালি কুঁচি দেয়া। আমাকে দেখে তারা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারপর তাদের মধ্যে একজন এসে জড়িয়ে ধরতে গেল আমাকে, হঠাৎ সে পিছিয়ে গিয়ে আর্তনাদ করে উঠল। বলল—এ তো ভূত!

'কী করব বুঝে উঠতে পারলাম না। এখান থেকে বেরোতে হলে ওদের মাঝ দিয়েই যেতে হবে। সাহস পেলাম না। কিন্তু আর সহ্য হলো না আমার। ডিমের বাক্সটা টেনে নিয়ে একটার পর একটা ডিম ছুঁড়তে লাগলাম ওদের দিকে। কিন্তু সবগুলো ডিম ওদের শরীর ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। এরপর কাপ, প্লেট—হাতের কাছে যা পেলাম তা-ই ছুঁড়তে লাগলাম। সব কিছুই ওদের শরীর ফুঁড়ে বের হয়ে যেতে লাগল। ওরা এবার আমাকে একে একে ঘিরে ফেলল। ক্রমে ছোট হতে লাগল বৃত্ত। সবাই হাত বোলাতে লাগল আমার শরীরে। আমি আর্তনাদ করে উঠলাম। সে এক ভয়ংকর অবস্থা। মনে হলো আমি বুঝি পাগল হয়ে যাচ্ছি। আর তারপরই আমি জ্ঞান হারালাম।

'মৌসুমী, আর সহ্য করতে পারছি না আমি। এখানে আর একটা দিন থাকলেই আমি পাগল হয়ে যাব। ঢাকা ফিরে যেতে চাই। এখানে আর এক মুহূর্তও থাকব না।'

ডা. শাহরিয়ারকে এসব কিছুই বললাম আমি। সব শুনে তিনি বললেন, 'মিস মৌসুমী, প্রেততত্ত্ব নিয়ে আমি পড়াশোনা করেছি অনেক। ভূতের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি। ভূতেরা সব অতৃপ্ত আত্মা। যে যেখানে মারা যায়, সেখানেই তারা বাঁধা পড়ে কোন না কোন সূত্রে। সেই বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য তারা ছটফট করে।'

'কিন্তু ডা. শাহরিয়ার,' বাধা দিয়ে বলল শীলা, 'এত দীর্ঘ দিন এ দুর্গের কোথাও তাদের দেখা যায়নি কেন? মৌসুমী আসার পর থেকেই কেন শুরু হলো?'

'মিসেস শীলা,' বললেন ডা, শাহরিয়ার, 'আমার ধারণা, নতুন করে তাদের আবির্ভাবের কারণ হয়তো এ দুর্গের পরিবেশের কোন পরিবর্তন। হয়তো এমন কিছু ঘটেছে যা আমরা জানি না, কিন্তু তারা নিজেদের শক্তি ফিরে পেয়েছে।'

'কিন্তু এমন কী ঘটল–' আমি বললাম।

আমাকে বাধা দিয়ে ডা. শাহরিয়ার বললেন, 'সেটা কী তা আমরা কেউই জানি না। তবে যতটুকু আমি জানি তা হচ্ছে, কোন প্রেতাত্মা দীর্ঘদিন ধরে কোথাও আটকা পড়ে থাকলে যদি সেখানে নতুন প্রেত আবির্ভূত হয় তা হলে ওই আটকে পড়া প্রেতাত্মা মুক্তি লাভের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে।'

দেখলাম শীলার ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠল। আর ঠিক তখন ডাক পিয়ন এক গাদা চিঠি নিয়ে ঘরে ঢুকল।

লোকটা চলে গেলে চিঠিগুলো টেনে নিল শীলা। খামগুলোর ওপর চোখ বোলাতে লাগল। হঠাৎ একটা খাম খুলে পড়তে শুরু করল। তার চোখে মুখে ফুটে উঠল বিস্ময় আর আতঙ্ক। আমার দিকে সে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে চিঠিটা পড়ে গেল। আমি তার দিকে এগোতেই চিৎকার করে জ্ঞান হারাল সে।

ডা. শাহরিয়ার চিঠিখানা তুললেন। তারপর পড়তে পড়তে বললেন,

'যা ভেবেছি ঠিক তাই!' দেখলাম তাঁর মুখ সাদা হয়ে গেছে। আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে চিঠিটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি। আমি চিঠিটা নেবার পরও তাঁর হাত দুটো কাঁপতে থাকল।

চিঠির হাতের লেখা খুব পরিচিত মনে হলেও প্রথমে আমি ধরতে পারিনি। আমি ওটা পড়তে শুরু করলাম:

"প্রিয় শীলা ও সেলিম,

মৌসুমী যে তোমাদের কাছে পৌঁছাতে পারেনি, এবং আর কখনোই পৌঁছাবে না তার কারণ জানাতে দেরি হয়ে গেল বলে আমি দুঃখিত–"

অবাক হলাম আমি এটুকু পড়ে। পৌঁছাতে পারিনি মানে? আমি তো দিব্যি এখানে। হঠাৎ বুঝতে পারলাম হাতের লেখাটা আমার মায়ের। ডা. শাহরিয়ারের দিকে একবার তাকিয়ে আবার আমি চিঠিটা পড়তে লাগলাম:

"মৌসুমী তোমাদের আগেই চিঠি লিখে জানিয়েছিল সে বেড়াতে যাবে তোমাদের ওখানে। তোমাদের সঙ্গে ছুটি কাটানোর সাধ তার অনেক দিনের। আমি ওকে গাড়ি নিয়ে যেতে নিষেধ করেছিলাম। বলেছিলাম বাসে যেতে। আমার কথা কখনওই পাত্তা দেয় না সে। যা হোক, গাড়ি চালাতে চালাতে কালিয়াকৈর এসে একটা খাদের মধ্যে পড়ে যায়। পুলিশ উদ্ধার করে তাকে। মৌসুমীর ঘাড়টা ভেঙে গিয়েছিল, আর মাথাটা একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল। গাড়ির নাম্বার প্লেট দেখে তাকে শনাক্ত করা গেছে।

চিঠিটা আমার আগেই লেখা উচিত ছিল, কিন্তু মানসিক ভাবে শক্তি পাইনি। একটাই মাত্র মেয়ে আমার, দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল। তোমাদের খুব ভালবাসত ও। ওর জন্য তোমরা দোয়া কোরো।

ইতি–
মৌসুমীর মা
কুমিল্লা।

ডা. শাহরিয়ার তখনও বিড় বিড় করে কী যেন বলছেন...

[মরাগ গ্রির-এর দ্য গেটস ওয়্যার লকড অবলম্বনে]

মিজানুর রহমান কল্লোল

ছায়াসঙ্গী

এক

আসাদের কথা শুনে খুব একটা অবাক হন না হলের প্রভোস্ট করিম সাহেব। তবুও ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে থাকেন নিজের বিরক্তি প্রকাশের জন্যে। 'ভাল করে বলো, পিয়ালের বিরুদ্ধে তোমার কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ আছে? সে খারাপ কিছু করে রুমে? মদ-গাঁজা খায়, পড়াশোনায় ডিসটার্ব করে?'

'না, সার।'

'তা হলে? অন্য কিছু করে? আমাকে ফ্রাঙ্কলি বলো, আসাদ। না বললে সমস্যা আমি বুঝব কী করে?'

'পিয়াল ভাইকে কোন সমস্যা নাই, সার। উনি খুব ভাল মানুষ। কারও সাথে খুব একটা মেলামেশা করেন না। আড্ডাবাজির অভ্যাসও নাই।'

'ছাত্র কেমন?'

'খুব ভাল ছাত্র। সারাদিন পড়াশোনা নিয়ে থাকেন। প্রচুর বই পড়েন। পৃথিবীতে এমন জিনিস খুব কম আছে, যেটা পিয়াল ভাই জানেন না।'

'এটা তো ভাল কথা। এমন মানুষের সাথে থাকলে অনেক কিছু শিখতে পারবে জীবনে।'

জবাবে মাথা নিচু করে বসে থাকে আসাদ। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে প্রভোস্ট সারের সাথে একমত নয় সে।

একটু যেন ভাবেন করিম সাহেব, 'বেশি পড়ুয়া মানুষের অনেক সময় কিছু মানসিক সমস্যা থাকে। পিয়ালের কি সেরকম কোন সমস্যা আছে?'

'ন্না...না, সার। সেরকম কোন ব্যাপার না। পিয়াল ভাই খুব ভাল মানুষ। একবার আমার খুব জ্বর হলো, সব কিছু বাদ দিয়ে দিনরাত উনি আমার সেবা করেছেন। নিজের ভাই হলেও এতটা করত না।'

'তা হলে সমস্যাটা কী?' এবার রেগেই যান করিম সাহেব। 'কেন পিয়ালের সাথে থাকবে না, সে ব্যপারে তো আমাকে কোন কারণ দেখাতে পারছ না তুমি।'

'আমার কাছে কোন কারণ নেই। কোন কারণ দেখাতে পারব না আমি।' গোঁয়ারের মত জেদ করে আসাদের মত নেহাত সাদাসিধে ছেলেটা। 'আপনি শুধু আমাকে অন্য কোন রুমে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। যে কোন রুমে। কিন্তু ওই রুমে আমি থাকব না। দরকার হলে লেখাপড়া ছেড়ে বাড়িতে ফেরত চলে যাব।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন হল প্রভোস্ট। কেননা পিয়াল সম্পর্কে অভিযোগ এই প্রথম নয়। দুবছর হলো নতুন হলটা হয়েছে, আর এরই মাঝে পাঁচ জন রুমমেট দিয়েছেন পিয়ালকে। এবং তাদের একজনও থাকতে পারেনি।

একজনও না!

পিয়ালের বিরুদ্ধে কারও সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ নেই, অথচ সবারই এক কথা–থাকতে পারব না। কোন ভাবেই না। এর মাঝে একজন ভার্সিটি ছেড়েই চলে গেছে। আর একটা ছেলে ছিল–স্বাধীন নাম। ছেলেটার নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। লোকে তো কানাঘুষা করে যে রুম বদলে দিতে দেরি হচ্ছিল বলেই নাকি ওই অবস্থা।

আসাদ কি ওরকম কিছু শুনেই চলে যেতে চাইছে? কে জানে, হবে হয়তো!

তবে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন করিম সাহেব–এবার কিছু একটা করতেই হবে। এভাবে আর চলতে দেয়া যায় না।

'তোমাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে, আসাদ। এসে রুম চাইলেই তো আর দিয়ে দেয়া যায় না। দেখি আমি কতদূর কী করতে পারি।'

'প্লিজ, সার, তাড়াতাড়ি করেন। প্লিজ!!'

'প্লিজ বললেই তো আর হবে না। সবকিছুরই একটা সিস্টেম

আছে। তা ছাড়া তুমি তো আমাকে ঠিক করে কিছুই বলছ না। এটা পর্যন্ত বলছ না যে তোমার রুম ছাড়ার কারণটা কী।'

আবার মাথা নিচু করে বসে থাকে আসাদ, 'আমি বললে হয়তো আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন না।'

'কেন করব না? আমার সাথে মিথ্যা বলে তো আর তোমার ফায়দা নেই।'

'আমার...আমার ভয় করে, সার, পিয়াল ভাইয়ের সাথে!'

'ভয় করে মানে কী? ও তোমাকে ভয় ভীতি প্রদর্শন করে? হুমকি-টুমকি দেয় ?'

'ঠিক সেই রকম ভয় না, সার। অন্যরকম।'

'অন্যরকম মানে কী?'

'অন্যরকম মানে...পিয়াল ভাইয়ের সাথে কী যেন একটা থাকে, সার। রাতের বেলা ঘুম ভাঙলে দেখা যায় ওনার পাশে শুয়ে আছে জিনিসটা।'

'জিনিস মানে কী?? ইউ মীন জিন-ভূত?'

'সেরকমই কিছু একটা হবে।...আমি ঠিক জানি না, সার। জানতে চাই-ও না।'

'দেখো...এসব জাস্ট তোমার মনের কল্পনা...'

'হতে পারে। কিন্তু পিয়াল ভাইয়ের সাথে আমি থাকতে পারব না।'

আসাদকে কিছু অভয়ের কথা শুনিয়ে আর নতুন রুমের আশ্বাস দিয়ে বিদায় করার পর গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন করিম সাহেব। হতাশার দীর্ঘশ্বাস।

গত পাঁচ বারেও এই একই অভিযোগ শুনতে হয়েছে তাঁকে। ঠিক এই একই অভিযোগ।

কে যেন ঘুমায় পিয়ালের পাশে শুয়ে...এবং সে মানুষ নয়।

অন্য ভুবনের কোন প্রাণী!!

দুই

কয়েকটা দিন থাকতেই হবে। অন্য কোন উপায় নেই। পরীক্ষা চলছে, কদিনের জন্যে বাড়িতে চলে যাওয়াও সম্ভব নয় এখন।

এতগুলো দিন যখন পেরেছে, আর কয়টা দিনও পারবে–মনে মনে নিজেকে সাহস দেয় আসাদ। পিয়াল ভাইয়ের পরীক্ষা শেষ, তবু গোসল-টোসল করে তৈরি রাতের জন্যে। টেবিলের ওপর পা জোড়া তুলে দিয়ে আরাম করে বই পড়ছেন।

এ লক্ষণ শুভ। অত্যন্ত শুভ।

এর মানে হচ্ছে তিনি সারারাত বই পড়বেন। আসাদ ঘুমাতে যাওয়ার আগে দেখবে তাঁকে বই পড়তে, ঘুম থেকে উঠেও দেখবে এই অবস্থা।

খুব সন্তর্পণে বুকের মাঝে জমে থাকা নিঃশ্বাসটা ছাড়ে পিয়ালের রুমমেট। সারারাত বই পড়ার অর্থ হলো রাতভর আলো জ্বেলে রাখা। এবং আসাদ লক্ষ করেছে যে রাতের বেলা আলো জ্বালা থাকলে তার ঘুমও ভাঙে না অসময়ে, এবং দৃশ্যটাও দেখতে হয় না।

'কী পড়ছেন, পিয়াল ভাই?'

মোটা চশমার অপর প্রান্ত থেকে হাসে পিয়ালের পড়ুয়া চোখগুলো।

'বইটার নাম দ্যা ডা ভিনচি কোড। খুব বিখ্যাত বই! সারা পৃথিবীতে আশি মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়েছে।'

'মজার বই?'

'অবশ্যই মজার। এই বইতে লেখক বাস্তব তথ্য-প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে যীশু খ্রিস্ট ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন না। সেই ধর্ম প্রচারক মানুষটাকে নিজেদের স্বার্থে ধর্মব্যবসায়ীরা ঈশ্বরের পুত্রে রূপান্তর করেছে। তাও তাঁর মৃত্যুর পরে। এমনকী ধর্মব্যবসায়ীরা বারবার নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছে তাঁর বংশকে পর্যন্ত।'

'বংশ?? যীশু খ্রিস্টের বংশ?'

'অবশ্যই! ধর্ম প্রচারক ছিলেন বলে কী তিনি মানুষ নন? যীশু ম্যারি ম্যাগদালিন নামে এক নারীকে বিয়ে করেছিলেন। এ বই সেই ম্যারিকে নিয়ে, তাঁর দেহাবশেষের খোঁজ নিয়ে। কারণ যীশু মারা যাওয়ার সময় তাঁর গর্ভে ছিল যীশুর সন্তান...'

কাহিনির এ পর্যায়ে উৎসাহ হারিয়ে হাই তুলতে শুরু করে আসাদ...লজ্জিত মনে হয় পিয়ালকে।

'আমি মনে হয় তোমার ঘুমের অসুবিধা করছি, ভাই! দাঁড়াও, টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে নিচ্ছি...'

'আরে না না! আপনি পড়েন। লাইট জ্বালিয়ে রাখা ভাল। আপনি না জ্বালালেও আমি জ্বালিয়ে রাখব এখন থেকে। রাতের বেলা কেমন জানি ভয় ভয় করে।'

সত্যটুকুন অনুভব করতে না পেরে হাসে পিয়াল। ভাবে তার কারণেই আসাদ এমনটা বলছে।

'তুমি ভাল ছেলে। খুব ভাল একটা ছেলে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বোজে আসাদ। ঘুমাবার চেষ্টা করে। সে ঠিকই ভেবেছিল, পিয়াল ভাইয়ের কোন রকম ধারণাই নেই যে তার সাথে কী ঘটছে।

এই বোকাসোকা মানুষটা নিজের বইয়ের জগতেই ডুবে আছেন সারাক্ষণ। অন্য ভুবনের একটা প্রাণী যে তার পাশেই শুয়ে থাকে প্রতিরাতে, এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না তিনি। কিচ্ছু না!

তিন

ঘুমটা ভাঙে আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে।

মাত্র বুঝি ঘুমটা এসেছিল, চোখ খোলার পরেও তাই অন্ধকার একটা পর্দা সামনে ঝুলে থাকে দীর্ঘসময়। চোখ পিটপিট করে অন্ধকারটা দূর করার চেষ্টা করে আসাদ, হাতড়ে হাতড়ে খোঁজে মাথার

কাছে রাখা পানির গ্লাসটা।

...না ঘুমের কারণে অন্ধকার ঠেকছে না। ঘরটা আসলেই অন্ধকার...

কে যেন নিভিয়ে দিয়েছে বাতি!!!

ঘর জুড়ে অদ্ভুত এক রকমের ঘ্রাণ। অনেকটা যেন ফুলের গন্ধ কোন...হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফুলের গন্ধই। হাসনাহেনা! জিনিসটা ঘরে থাকলে সবসময়ই কোন একটা ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়...

শরীরটা হিম হয়ে আসতে থাকে, একটা কাঠের তক্তার মত বিছানায় পড়ে থাকে আসাদ। বারবার প্রতিজ্ঞা করে না তাকানোর, কিন্তু' দৃষ্টি ঠিকই যায় পিয়ালের বিছানার দিকে। যেতে বাধ্য হয়।

ওই তো শুয়ে আছে জিনিসটা! আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে টানটান হয়ে শুয়ে আছে বিছানায়, পিয়াল ভাইয়ের ঠিক পাশেই। যেন...

যেন কাফনে মোড়ানো কোন লাশ!

চাঁদের অপার্থিব আলোতে একদম পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মানুষের কাঠামোর মত জিনিসটাকে। শুয়ে আছে পিয়াল ভাইয়ের শরীর ঘেঁষে...

কাঁপতে থাকা হাতটা হাতড়ে হাতড়ে পানির গ্লাস খুঁজে তো পায় ঠিকই, কিন্তু মুঠোবন্দী করার বদলে পানিসুদ্ধ আছড়ে ফেলে মেঝের ওপর। ঝনঝন শব্দে গুঁড়োগুঁড়ো হয় পাতলা কাঁচের গ্লাসটা।

আর তখনই ঘটতে শুরু করে সেই ঘটনা...

যা আগে কখনও ঘটেনি। এবং যে একটা ঘটনা হয়তো আজীবনের জন্যে বদলে দেয় সবকিছু।

গ্লাসটা ভাঙে ভাঙনের ঝংকারময় আওয়াজ তুলে। এবং খুব ধীরে ধীরে...

খুব ধীরে ধীরে উঠে বসতে শুরু করে চাদরে মোড়ানো সেই জিনিসটা। খুব ধীরে, খুব সন্তর্পণে–আগাগোড়া মোড়ানো চাদরটা সহই। পুরোপুরি উঠে বসলেই খসে যাবে চাদরটা তার শরীর থেকে, দেখা যাবে মুখ।

পুরোপুরি উঠে বসা মাত্র উন্মোচিত হবে সেই চেহারা।

একটু...আর একটু! উঠে বসছে সে...

কী আছে সাদা ওই চাদরের আড়ালে? কী আছে? নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করে আসাদ চরম সেই দৃশ্য দেখার অপেক্ষায়...আর নিজের অজান্তেই গলা চিরে বেরিয়ে আসে চিৎকার!

লাফিয়ে ঘুম থেকে উঠে বসেন পিয়াল ভাই...

...বেড সুইচে চাপ দিয়ে চট করে আলো জ্বেলে দেন...

...ব্যাকুল হয়ে ওঠেন আসাদের জন্যে...

'...কী আশ্চর্য!! আমি তো লাইট জ্বালিয়ে রেখেই ঘুমিয়েছিলাম!!!' বিড়বিড় করেন আপন মনেই।

চার

চলে যাচ্ছেন পিয়াল ভাই রুম ছেড়ে। এবং সত্যি বলতে কী, আসাদের ভাল লাগছে না একটুও। নিজেকে স্বার্থপর মনে হচ্ছে...

মনে হচ্ছে পিয়াল ভাইয়ের বদলে সে নিজে গেলেই বোধহয় ভাল হত। যত যাই হোক না কেন, হলটা তৈরি হবার পর থেকে পিয়াল ভাই এখানে আছেন।

কিন্তু কিছু করার নেই। এবং সবকিছুর জন্যে সে নিজেই যে পুরোপুরি দায়ী–ব্যাপারটা সেরকমও নয়। রাতের বেলা তার চিৎকার শুনে পুরো হল এ রুমে এসেছিল ঠিকই, তবে পিয়াল ভাইকে হল ছাড়তে বলার পেছনে সেটাই একমাত্র কারণ নয়। করিম সার বলেছেন, এর আগে আরও পাঁচজন নাকি এই একই অভিযোগ করেছে।

তবু খারাপ লাগছিল!

সবচাইতে বেশি এই কারণে যে সাদাসিধা মানুষটা একটু প্রতিবাদ পর্যন্ত করেননি। অভিযোগের কথা শোনার পর বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থেকেছেন খানিকক্ষণ, তারপর জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করেছেন।

সকালের আলো ফুটেছে অনেকটা সময়, শান্ত ভঙ্গিতে বইগুলোর একটা গতি করার চেষ্টা করছেন তিনি।

আরও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আসাদ। 'বইগুলো আজকেই নিতে

হবে এমন কোন কথা নাই। আপনি রেখে যেতে পারেন। আমি যত্ন করে রাখব। পরে এক সময় এসে না হয় নিয়ে যাবেন। ঠিকানা দিলে আমি পাঠিয়েও দিতে পারি।'

ছোট মানুষের মত হাসেন পিয়াল ভাই। 'তুমি রাখবে বইগুলো? আমার জান বাঁচালে রে, ভাই!...এত বই নিয়ে কই যাব বুঝতে পারছিলাম না। থ্যাংকস এ লট!'

এসে কাজে হাত লাগায় আসাদ। 'আমাকে থ্যাংকস বলছেন? আজ যে আপনাকে হল ছেড়ে যেতে হচ্ছে, এজন্যেও তো আমি দায়ী। বোকার মত ভয় পেয়ে একটা সিন ক্রিয়েট করে ফেলেছি...'

আবারও হাসেন পিয়াল ভাই। 'শুধু তুমি তো না, আমার আগের রুমমেটরাও একই কমপ্লেইন করেছে। কিন্তু ওরা যদি কেউ আমাকে ব্যাপারটা জানাত!'

'পিয়াল ভাই...আই অ্যাম সো স্যরি!! ব্যাপারটা আসলে আমার মনের কল্পনা, এখন বুঝতে পারছি...'

'না রে, ভাই। মোটেও তোমার মনের কল্পনা না। আমি জানি ব্যাপারটা। আমার বাসায় সবাই জানে। মা অনেক তাবিজ-কবচ করিয়েছিলেন। হুজুর বলেছিলেন বাড়ি থেকে দূরে থাকলে ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যাবে।'

'এই জন্যেই আপনি বাড়িতে যেতে চান না? গেলেও রাতে থাকেন না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি কিছুই টের পাই না কখনও। আমার মা আর বোন নাকি বেশ কয়েকবার দেখেছে, আমি কখনও দেখিনি।'

'কারণ আপনার ঘুম ভাঙার সাথে সাথে ওইটা গায়েব হয়ে যায়...' বিড়বিড় করে আসাদ। তবে কান এড়ায় না পিয়ালের।

'এইসব হাবিজাবি আমি বিশ্বাস করি না। বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে এই সব বিশ্বাস করা পাপ। কিন্তু নিজের সাথে যা হচ্ছে, সেটা অস্বীকারও তো করতে পারছি না।'

'কোথায় যাবেন? কোন মেসে?'

'সোজা বাড়িতে যাব। আম্মার কাছে।'

'সেটাই ভাল, একা একা থাকা উচিত হবে না। আচ্ছা, কবে থেকে এই সমস্যাটা হচ্ছে আপনার?'

'ঠিক জানি না...ভার্সিটিতে ভর্তি হবার পর একবার বাসার সবাই মিলে কক্সবাজার গেলাম, সেই বার আম্মা প্রথম দেখেছিল।'

'থাক, ভুলে যান। সব ঠিক হয়ে যাবে...'

'কাগজ দ্যাও, আমার ঠিকানা দিয়ে যাই...'

'আমার উপর রাগ রাইখেন না, পিয়াল ভাই...'

পিয়ালের সাথে আগামী ছয় বছরের জন্যে সেটাই ছিল আসাদের শেষ দেখা।

পাঁচ

ছয় বছর পর। আসাদের বিবাহোত্তর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।

জীবন অনেক বদলে গেছে। আসাদ এখন বড় কোম্পানীতে কেমিস্ট হিসাবে কর্মরত, বিয়েও করছে এক কলিগকেই। প্রেমের বিয়ে। আসাদ আজ রাতে এই গ্রহের সবচাইতে সুখী মানুষ।

তবে ভার্সিটি জীবনের বন্ধুদের দাওয়াত করতে ভুল করেনি। মনে করে করে সবাইকে ডেকেছে নিজের আনন্দের অংশীদার করতে। এসেছেন পিয়াল ভাইও।

যা ভেবেছিল, ঠিক তাই-ই হয়েছে। পিয়াল এখন নামকরা ভার্সিটির গণ্যমান্য প্রফেসর। তবে বদলাননি বিশেষ। আগের মতই আছেন–সোজা সরল।

'পিয়াল ভাই!! আমাকে মাফ করেছেন তো?' একটু একা হতেই পুরানো কথা না তুলে পারে না আসাদ।

'মাফ আবার কেন...ওহ হো, সেই হলের ঘটনা?'

'আপনার কোন দোষ ছিল না, ভাই। ওই রুমটারই কোন সমস্যা আছে। আপনি যাওয়ার পরেও নতুন কেউ থাকতে চাইত না।'

'তুমি তো থেকেছ।'

'আরে ধুর!! না থেকে যেতাম কই বলেন? আর...আপনি চলে যাওয়ার পর ভয়টাও কেন জানি চলে গেছিল।'

'একটা কথা কি জানো?' ষড়যন্ত্রকারীদের মত কণ্ঠ নিচু করে ফেলেন পিয়াল ভাই। 'বাড়িতে চলে যাওয়ার পর থেকে আমার সেই অসুখটা একদম সেরে গেছে।'

'সত্যি? আর কখনও আপনার বাসার কেউ দেখেনি ওটাকে?'

'নাহ। কখনোই না।'

'আসলে হয়েছিলটা কী? ওটা কই তা হলে?'

'ব্যাপারটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি, আসাদ। কিন্তু আজকের আগে কখনওই বুঝতে পারিনি যে কী হয়েছে... আজ বুঝতে পারছি!!'

'কী বুঝতে পারছেন?'

জবাবে হাসেন পিয়াল ভাই। 'তুমি কি জানো, তোমার শরীর থেকে তীব্র ফুলের গন্ধ বের হচ্ছে?'

কেন যেন একটু চমকে যায় আসাদ। তবু বিব্রত ভঙ্গিতে বলে, 'আর বইলেন না, ফুলের মালা গলায় দিয়ে-টিয়ে বিশ্রী কাণ্ড...'

'আমি সেই কথা বলছি না...আমার মনে হয় জিনিসটা এখন তোমার সাথে আছে!'

'ধুর, পিয়াল ভাই...'

'আমি জানতাম তুমি বিশ্বাস করবে না। কিন্তু, আসাদ, কখনও কি ভেবে দেখেছ আমি চলে আসার পরে অন্য কোন রুমমেট পাওনি কেন তুমি?'

জবাব দেয় না আসাদ। ফুলের তীব্র গন্ধে মাথাটা ঝিমঝিম করতে শুরু করেছে।

সত্যি কি তার শরীর থেকে বের হচ্ছে এই গন্ধ??

পরিশিষ্ট

বাসর ঘরের ফুলের তীব্র সৌরভে ঘুমটা ভেঙে যায় নওরিনের।

অন্ধকার ঘরে এ.সি. চলছে। এ' কারণেই হয়তো গন্ধটা অসহ্য লাগছে, মনে হচ্ছে দম বন্ধ হয়ে যাবে।

আসাদকে না জাগিয়েই উঠে এসে জানালাগুলো খুলে দেয় নওরিন। এক ঝলক ঠাণ্ডা এসে ঢোকে ভেতরে, তবু কম হয় না গন্ধের তীব্রতা। বেলী ফুলের অসহ্য, তীব্র সৌরভ।

কিন্তু বেলী ফুল কি আছে বাসর সজ্জার ফুলের মাঝে? মনে তো হয় না...

আকাশে বিশাল একটা চাঁদ, প্রবল জোছনার আলো চারপাশে। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ঘুমাচ্ছে আসাদ। তবু স্বামীকে আলতো স্বরে ডাকে নওরিন, এত সুন্দর জোছনা থেকে নজর ফেরানো যাচ্ছে না।

'আসাদ...এই যে, কুম্ভকর্ণ সাহেব !!!...'

'উ...' ঘুমের মাঝেই জবাব দেয় আসাদ। জানালার কাছে দাঁড়ানো. নওরিন শুনতে পায় স্বামীর পাশ ফেরার মৃদু আওয়াজও।

হেসে ফেলে সদ্য পরিণীতা মেয়ে। মনে হচ্ছে কাছে গিয়ে উত্যক্ত না করলে জাগবে না এই কুম্ভকর্ণ...

হঠাৎই যেন কী হয়ে যায়, ঘাড়ের কাছে শিরশিরে একটা অনুভব সতর্ক করে তোলে অবচেতন মনটাকে।

পেছনে দেখার সাহস হয় না সহসা । কেন যেন মনে হয় ভীষণ ভয়ংকর কিছু আছে তার প্রতীক্ষায়। একবার তাকালেই...

তবু তাকায় নওরিন। তাকাতে বাধ্য হয়।

...এটা কী??...এটা কে???...

তার স্বামীর পাশে সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে কে যেন!!...কিংবা কী!!! নওরিনকে বলে দিতে হয় না, তার অবচেতন মনই বলে দেয় যে অবয়বটা এই পৃথিবীর কোন কিছু নয় অবশ্যই...

অসাড় মন থেকে চাপা একটা চিৎকারই আসে কেবল। কিন্তু তাতে ভাঙে না আসাদের গাঢ় ঘুম। বরং...

খুব ধীরে ধীরে উঠে বসতে শুরু করে কাফনে মোড়ানো লাশটা। ধীরে...খুব ধীরে!!!

কীভাবে যেন নওরিন বুঝতে পারে সে মুহূর্তেই–তার জীবনের দুঃস্বপ্নময় অধ্যায়টা শুরু হলো মাত্র!!!

রুমানা বৈশাখী

পৈশাচিক

মুড়ির টিন মার্কা বাসটা থামতেই লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ল কয়েকটা ছেলে। সেমিস্টার ফাইনালের আগে পাওয়া পি.এল. এর বন্ধে লেখাপড়া বাদ দিয়ে ঘুরতে আসাটা যদিও কোন ব্যাকরণের পর্যায়ে পড়ে না তারপরও 'সারা জীবনই তো পড়লাম, আর কত? এখন ভার্সিটিতে পড়ি' টাইপের ভাবভঙ্গি নিয়ে সোজা জঙ্গলে এসে পড়ল ছেলেগুলো, ক্যাম্পিং করতে। হৈ-হুল্লোড়, লাফালাফি আর টপ ভলিউমে মিউজিকের শব্দ শুনলে কে বলবে এদের সামনের সপ্তাহে সেমিস্টার ফাইনাল। অবশ্য আমার উদ্দেশ্যটা একটু অন্যরকম। আর সেটা হলো 'ভূত'। হ্যাঁ, 'ভূত'। গাজীপুরের ভিতর যে পিকনিক স্পটগুলো আছে তার একটা হলো সফিপুর। এই সফিপুরের জঙ্গলে কোন এক পুরানো কালীমন্দিরে সেই ভূত বাবাজীর অবস্থান। তার দর্শনেই আসা এই মহাপুরুষদের। অবশ্য এই ভূত দেখতে আসার পরিণতিটা আরেকটু আগে জানতে পারলে বোধহয় ক্যাম্পিঙে এসে রিচার্জড হয়ে সেমিস্টার ফাইনালের জন্য পড়ার টেবিলে বসার প্ল্যানটা প্ল্যানই থেকে যেত।

'কিরে, ঘাড়টা তো আমার ব্যাঁকাই হয়া গেল। কী ভয়াবহ গ্যাদারিং বাসের মধ্যে।' ঘাড় ডলতে ডলতে বলল আদনান।

'আমরার য্যান আর কষ্ট হয় নাই। তুই একলাই ঘাড় ব্যাঁকা করসস,' পাশ থেকে বলে উঠল রোহান।

'বুঝতে হবে, আমরা ট্রাভেলার। একটু কষ্ট না করলে ভূত দেখব কীভাবে?' কেডসের ফিতা বাঁধতে বাঁধতে শাওন বলল।

'আবসারাব। কোন মানে হয় পরীক্ষার পড়া বাদ দিয়ে এখানে মরতে আসার?' নিজের মনেই গজগজ করল আনাস।

'হইসে। এখন আর পরীক্ষার কথা মনে করাইস না। তাইলে ঠিকমত ভূত দেখন যাইব না।'

'আরে খাইসে এই জঙ্গলের ভেতর ঢোকন লাগব। হাঁটমু কেমনে?'

'হাঁটন লাগব না। দৌড়া।' বাস থেকে নামার পর এই প্রথম কথা বলল মিশুক। 'অ্যাই, রবিন, আমাদের খাবারের ব্যাগটা তোমার কাছে না? সাবধানে রাইখো। ওইটা হারাইলে কিন্তু আজকে সারাদিন উপাস।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার কাছে, চল।'

রাস্তা থেকে নেমে ঘন জঙ্গল আর ঝোপঝাড় ভেঙে হাঁটতে শুরু করল ছয়জন। শাওন, রোহান, আনাম, আদনান, মিশুক আর রবিন। শাল আর গজারি গাছের জঙ্গল। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে। অভিজ্ঞতা যার নেই তার জন্য বোঝা কঠিন ব্যাপারটা কত কষ্টকর। সবচেয়ে কঠিন ব্যালান্স ঠিক রাখা। বিশাল শরীর নিয়ে শাওন তো হাঁটতে হাঁটতে চিৎপটাং।

'ইয়াঃ হাঃ হাঃ হা। শাওন, পইরা গেলি রে।'

'ব্যাটা, হাসতেছিস। তুই পড়লে বুঝতি।'

'ওই, আদনান। তুই এমনে হাসস কেন? আমি তো মনে করসিলাম ভূত বুঝি আইসাই পড়সে।'

'ভূত আসলেও সমস্যা নাই। ঝধু ধরো আমাদের ধরতে ভূতটা আসতেসে এমন সময় আদনান একটা হাসি দিল ইয়া হা ইয়া হা হু হু হু। ভূতটা মনে করবে ওর চেয়েও একটা বড় ভূত আইসা পড়সে। তখন আমাদের ধরবে কী? উল্টা গাট্টিবোঁচকা নিয়া দে চম্পট।'

'আবসারাব। মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে ফাইলিং করতেও আমাদের এত কষ্ট করতে হয় নাই।'

'কীরে, শাওন, ব্যথা পাইছস।' শাওনকে ধরতে এগিয়ে গেল রোহান।

'না দোস্ত। ঠিক আছে।' উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল শাওন। 'উউফ', উঠতে গিয়ে গোড়ালি চেপে আবার বসে পড়ল।

'হায় হায়, শাওন। তুই লেংড়া হয়া গেলে তো বিপদ। ভূত অ্যাটাক করলে দৌড়াবি কেমনে?'

'মোটু, আদনান। কথা কম বল। দেখতেছিস একটা ফ্যাসাদে পড়সি এর মধ্যে আবার মস্করা।' ধমকে উঠল মিশুক।

এর মধ্যে রোহান আর আনাসের হাত ধরে কোন রকমে উঠে দাঁড়াল শাওন। মুখ চোখ ব্যথায় কুঁচকে গেছে। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করছে। ওর দিকে এগিয়ে গেল মিশুক। শাওনের কাছে গিয়ে বসে

হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখার চেষ্টা করল কোথায় ব্যথা পেয়েছে।

'আউ-উ-উফ' ব্যথায় কাতরে উঠল শাওন। 'চাপ দিস না, মিশুক, ব্যথা লাগে।'

'বুঝছি। এই ল্যাংড়াটারে এখন ধইরা ধইরা নিয়া যাইতে হইব।'

'তার চেয়ে বরং চলো ফিরে যাই, মিশুক।' অসহায় দৃষ্টিতে মিশুকের দিকে তাকাল রবিন। 'সন্ধ্যা হয়ে আসছে। চারদিকের পরিস্থিতি আমার একদমই ভাল লাগছে না। কেমন যেন একটা গা ছমছম করা থমথমে বদ্ধ অবস্থা। সামনে আর এগোনো কি ঠিক হবে?'

রবিনের কথায় এবার সবাই চারপাশে তাকাল। বাস থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে সূর্য ডুবে গেছে কেউ খেয়ালও করেনি। চারদিকে গোধূলির ম্লান আলো। তাও আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসছে। রবিনের কথায় আর পরিবেশের নিস্তব্ধতায় কয়েকটা মুহূর্ত একদম নীরব কাটল ছেলেদের। হঠাৎ সম্বিত ফিরল আদনানের অট্টহাসিতে।

'ইয়া হাঃ হাঃ হা। শাওন ল্যাংড়া হইতে না হইতেই তোরা এমন চুপসায়া গেছস। ভূত দেখলে তো প্যান্ট নষ্ট কইরা দিবি। এতদূর আসছি কি ল্যাংড়া শাওনরে ক্যারি কইরা ফিরা যাইতে? চল, ব্যাটা।'

'আদনান, টেইক ইট সিরিয়াসলি। তোরা সবাই কী বলিস? ফিরে যাব?'

'এহন ফিরবার পারবি নাকি? যেই রাস্তা দিয়া আইসি ওইটা দিনের আলো ছাড়া চিনবার পারুম না। এহন ফিরতে গেলে দেখবি রাস্তা হারায় ফালাইছস।'

'তা হলে?'

'চল, মিশুক। তার চেয়ে বরং মন্দিরটা খুঁজে বের করি। কোন রকমে রাতটা কাটিয়ে কালকে সকালে ব্যাক করব। ক্যাম্পিং করতেই তো এসেছিলাম। ক্যাম্পিংটাও হবে।'

অতএব আবার হাঁটা শুরু করল ছেলেরা। এরমধ্যে রাত নেমে এসেছে। ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস বইছে। শাওনকে ধরে হাঁটতে হচ্ছে বলে হাঁটার গতি কমে গেছে পুরো দলটারই। 'আবসারাব! এই ভূতের ব্যাপারটা কী? ডিটেইল বল তো, মিশুক।' হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল আনাস।

'তুই জানিস না?'

‘কেউই তো মনে হয় জানে না। তোরা কেউ জানিস?’

‘না, জানি না। ভূত দেখতে ক্যাম্পিং-এ যাবি বললি তাই এলাম। ভূত কি সত্যি সত্যিই আছে নাকি?’

‘দেখ, সত্যি সত্যিই ভূত আছে কি না এখানে তা আমি নিজেও জানি না।’ শুরু করল মিশুক। ‘তবে আমার জীবনে আমি বেশ কয়েকবার এমন ব্যাখ্যাতীত কিছু ঘটনা ঘটতে দেখেছি যে এখন কোন কিছুই আমার কাছে আর অবিশ্বাস্য মনে হয় না। এখনও আমার মনে পড়ে সেই খাগড়াছড়িতে শামীম ভাইয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু কিংবা সিলেটে গিয়ে সেই পোড়া লাশগুলোর হাতে পড়া। একদম চোখের সামনে ভাসে। যাক সে কথা। এখনকার কথায় আসি। যতটুকু শুনেছি, এই সফিপুরে যে হিন্দু জমিদার বাড়ি ছিল গল্পটা কিংবা ঘটনাটা একে কেন্দ্র করেই। জমিদার সাহেবের প্রথম পক্ষের শ্যালক কী যেন নামটা, যাক বাদ দে, নামটা ভুলে গেছি, তার স্বভাব চরিত্র খুব একটা ভাল ছিল না। খুব একটা ভাল ছিল না বললে ভুল বলা হবে। বলা যায় ব্যাটা ছিল আস্ত একটা লম্পট। সারাদিন মদ, গাঁজা, তাস, জুয়া এসব নিয়েই পড়ে থাকত। আর মেয়েমানুষ তো ছিলই। কত মেয়েকে যে তার খপ্পরে পড়তে হয়েছে তার আর হিসেব নেই। জমিদার সাহেব ছিলেন এক কথায় দিল দরিয়া মাটির মানুষ। এলাকার মানুষের সুখ-শান্তির জন্য যথেষ্ট কাজ করেছেন তিনি। তাঁর স্ত্রীও ছিলেন সেরকম। কিন্তু এই একমাত্র শ্যালকটি একদমই উল্টো। যাই হোক, আকস্মিক এক দুর্ঘটনায় ছাদ থেকে পড়ে মারা যান জমিদার সাহেবের স্ত্রী। এর কিছুদিন পর আবার বিয়ে করেন জমিদার সাহেব। শ্যালকটি তখনও থাকত ওই জমিদার বাড়িতে। জমিদারের নতুন স্ত্রীর উপর তার নজর পড়ে। একদিন একটা অঘটন ঘটিয়েও ফেলে সে। এবং ধরাও পড়ে যায়। বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় জমিদারের শ্যালকটি। কিন্তু বৌটা? সে যাবে কোথায়? সব রোষ গিয়ে পড়ে তার উপর। রেগে আগুন হয়ে যান জমিদার সাহেব। দেয়ালে ঝোলানো চাবুক নামিয়ে এলোপাতাড়ি পেটাতে থাকেন কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে। একসময় মারা যায় সে। ঘটনা ঘটতে শুরু করে এরপর থেকেই।’

‘মানে?’

'মানে এরপর থেকেই একটার পর একটা পৈশাচিক ঘটনা ঘটতে থাকে। জমিদার সাহেবের স্ত্রী মারা যাওয়ার একমাস পেরোতে না পেরোতেই বাড়ির সিঁড়ির গোড়ায় একদিন মরে পড়ে থাকতে দেখা যায় তার প্রথম পক্ষের ছেলেটিকে। রক্তাক্ত, সারা শরীর থেঁতলানো মাংসপিণ্ডের মত। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো শরীরে একটাও হাড় নেই। সবগুলো হাড় কোন বিশেষ উপায়ে শরীর থেকে বের করে নেয়া হয়েছে। হাড়গুলো অবশ্য বাড়ি থেকে একটু দূরে পাওয়া গেল। বনের ভিতর একটা গাছের গোড়ায়। কিন্তু হাড়গুলো থেঁতলানো। দেখলে মনে হয় বাড়ি থেকে জমিদার সাহেবের ছেলের শরীরের হাড়গুলো বের করে এনে কেউ এই গাছতলায় বসে চিবিয়ে খেয়েছে।

'বাবা গো। কী ভয়াবহ!' অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল আদনান।

'আবসারাব! এসব গল্প কোত্থেকে যে মানুষ বানায়? বললেই হইল শরীর থাইকা হাড্ডি বাইর কইরা চিবায়া খাইছে।' রাগে গজগজ করতে করতে বলল আনাস। আজকের দিনে যে একদমই পড়া হলো না এই শোক সে এখনও ভুলতে পারছে না।

'আমি যা জানি তা বলতেসি। গল্প কে বানাইসে, কেন বানাইসে, কীভাবে বানাইসে, আদৌ বানাইসে কি না, তা আমি কীভাবে বলব?' বিরক্ত স্বরে বলল মিশুক।

'হ্যাঁ, মিশুক, তারপর কী হলো বলো।' তর সইছে না রবিনের।

'আমরা বোধহয় এসে পড়সি। ওই যে সামনে গাছপালার আড়ালে মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে। বাকিটা ওখানে গিয়ে বলি।'

হাঁটতে হাঁটতে কখন যে ছেলেরা মন্দিরটার কাছে এসে পড়েছে কেউই খেয়াল করেনি। অনেকটা পথ হাঁটতে হলো। সবাই পরিশ্রান্ত। তার ওপর শাওনকে ধরে হাঁটতে হয়েছে বলে রোহান আর রবিনের অবস্থা আরও করুণ। পুরানো জীর্ণ সেই মন্দিরটার কাছে এসে ধপ করে বসে পড়ল সবাই। বেশ কয়েকটা মুহূর্ত কাটল চুপচাপ, একদম নীরব। সবাই একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে মন্দিরের দিকে। পুরানো আমলের কালীমন্দির। মন্দির বললে ভুল হবে। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। দেয়াল ধসে পড়েছে। যেসব জায়গায় এখনও দেয়াল অক্ষত আছে সেসব জায়গায়ও জরাজীর্ণতার চিহ্ন স্পষ্ট। মন্দিরের চারপাশে গাছপালা জন্মে

পরিবেশটাকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। হঠাৎ করে চোখ পড়লে মনে হয় শূন্য চোখে কোন মড়ার মাথার খুলি চেয়ে আছে তাকে দেখতে আসা আগন্তুকদের দিকে।

'কাঠগুলো জড়ো করো, রবিন, আগুন জ্বালব।' নিস্তব্ধতা ভেঙে হঠাৎ বলে উঠল মিশুক।

মন্দিরের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এবার সবাই কাজে হাত লাগাল। কাঠ জড়ো করা হলো। আগুন জ্বালানো হলো। খাবারের ব্যাগ থেকে খাবার বের করতে শুরু করল আদনান। তারপর আগুনের চারপাশে বসে হটডগ আর ম্যাংগো জুস খেতে খেতে আবার শুরু হলো গল্প। সবাই ফিরে গেল দু'শো বছর আগের সেই জমিদার বাড়িতে।

'ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল সবাই।' আবার শুরু করল মিশুক। 'এরকমভাবে কে হত্যা করল জমিদার সাহেবের ছেলেকে?' নানা গুঞ্জন উঠল চারদিকে। কিন্তু কেউই কোন কিনারা করতে পারল না রহস্যের। কোন জানোয়ারের পক্ষে এভাবে ঘরে ঢুকে মানুষ হত্যা করা সম্ভব নয়। আর তা ছাড়া এমন কোন্ জানোয়ারই বা আছে যে শরীরের মাংস বাদ দিয়ে শিকারের হাড়গুলো নিয়েই শুধু সন্তুষ্ট থাকবে? চাপা গুঞ্জন থেকে একটা নামই ভেসে এল, মালতী, জমিদার সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রী। এর একদিন পর একইভাবে খুন হলো জমিদার সাহেবের বিধবা বোন। সেই থেঁতলানো শরীর। সেই জঙ্গলের মধ্যে পড়ে থাকা রক্তাক্ত হাড়, এভাবে প্রতি রাতেই একজন করে মরতে থাকল। সন্দেহ ঘনীভূত হতে থাকল আস্তে আস্তে। কিন্তু একরাতে সন্দেহ আর সন্দেহ রইল না। চাক্ষুষ প্রমাণ পেলেন জমিদার সাহেব। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে দোতলার বারান্দায় পায়চারি করছিলেন তিনি। হঠাৎ অন্ধকারে অদূরে জঙ্গলে একটা ছায়া নড়তে দেখলেন। সচকিত হয়ে উঠলেন তিনি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বনের মধ্যে খুঁজতে লাগল ছায়াটিকে। একটু পর আরও স্পষ্ট হলো ছায়ামূর্তি। আবছা অবয়বে একটি নারীমূর্তি বেরিয়ে আসছে জঙ্গলের ভিতর থেকে। শীর্ণ দেহ, হাতগুলো আরও শীর্ণ আর অস্বাভাবিক লম্বা। ছায়ামূর্তি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল জমিদারবাড়ির সামনে। তারপর এগিয়ে গেল দাসদাসীদের ঘরগুলোর দিকে। একটু পরই শোনা গেল এক দাসীর গগনবিদারী চিৎকার। ততক্ষণে সম্বিত ফিরে পেলেন জমিদার

সাহেব। চিৎকার করে তাঁর ভৃত্যদের ডেকে লাঠি-সোটা, বন্দুক নিয়ে ছুটলেন ওই দাসীর ঘরের দিকে। ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। মালতীর প্রেতাত্মা দাসীটাকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে গেছে। দলবল নিয়ে সারা জঙ্গল চষে ফেললেন জমিদার সাহেব। একসময় পাওয়া গেল লাশ। কিন্তু সেই হাড়শূন্য অবস্থায়।

বাধ্য হয়ে জমিদারসাহেব গ্রামের পুরোহিতকে ডাকলেন। পুরোহিত এলেন। সবকিছু দেখে শুনে বললেন, পাপের শাস্তি সবাইকেই ভোগ করতে হয়। জমিদারসাহেব যে পাপ করেছেন, যেভাবে নিরপরাধ একটা মেয়েকে হত্যা করেছেন এর জন্য মাশুল তো তাঁকে দিতেই হবে। তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করবেন তবে সফলতার সম্ভাবনা খুবই কম। জমিদার বাড়ির চারপাশে অনেক বড় করে বৃত্ত আঁকলেন পুরোহিত। তারপর এক এক করে জমিদারবাড়ির ঘরগুলো দেখতে শুরু করলেন। একতলা দু'তলার সবগুলো ঘর দেখা শেষ করে হতাশ হয়ে পুরোহিত বললেন, ব্যাপার খুব গোলমেলে। তিনি ভেবেছিলেন সেই অশুভ আত্মা জমিদার বাড়িতেই কোথাও লুকিয়ে আছে। কিন্তু এখন দেখছেন তা নয়। তিনি জানতে চাইলেন জমিদারবাড়িতে আর কোন ঘর আছে কি না। জমিদার সাহেব জানালেন তাঁর বাড়ির পেছন দিকে একটা কালীমন্দির আছে। তার পূর্বপুরুষরা সেখানে নরবলি দিত।

পুরোহিতের চোখ জ্বলে উঠল। তিনি মন্দিরে কালীমূর্তিটা আছে কিনা জানতে চাইলেন। জমিদার সাহেব জানালেন যে কালীমূর্তি আছে। পুরোহিত তখন জমিদার সাহেবকে তাঁর শরীরের কিছু তাজা রক্ত দিতে বললেন। তারপর চললেন সেই কালী মন্দিরের দিকে। প্রায় দু'দিন দু'রাত ধরে নানা যজ্ঞ করে মালতীর অতৃপ্ত আত্মাকে ঢুকিয়ে দিলেন সেই কালীমূর্তির ভিতর। তারপর বের হয়ে এলেন মন্দিরের বাইরে বিধ্বস্ত অবস্থায়। কালী মন্দিরের বাইরে জমিদার সাহেব অপেক্ষা করছিলেন সবাইকে নিয়ে। ভিতরে যে তাণ্ডব চলছিল পুরোহিতের সাথে মালতীর অশুভ আত্মার তা বেশ ভালই উপলব্ধি করতে পারছিলেন তাঁরা বাইরে থেকে। পুরোহিত বাইরে এসে জানালেন আর ভয় নেই। কালীমূর্তির ভিতরে তিনি আত্মাটাকে ভরে ফেলেছেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সবাই।

কিন্তু দিন দশেক পর এক অমাবস্যার রাতে স্বয়ং পুরোহিতকেই

একইভাবে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল তাঁর ঘরে। আঁতকে উঠল সবাই। আতঙ্কগ্রস্ত, দিশেহারা হয়ে পড়লেন জমিদার সাহেব। একী হলো? ছুটে গেলেন কালীমন্দিরে। দেখলেন কালীমূর্তি হাওয়া। এখন কী হবে? এরপর থেকে প্রতি অমাবস্যার রাতে জমিদারবাড়ি থেকে একজন একজন করে মারা যেতে থাকল। আরও একজন পুরোহিতকে ডাকলেন জমিদার সাহেব। পুরোহিত সবশুনে বললেন, তাঁর আগে যে পুরোহিত মালতীর আত্মাকে কালী মূর্তির ভিতর বন্দি করেছিলেন তিনি মূর্তির ভিতর থেকে আত্মার বের হওয়ার রাস্তা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন। ফলে এখন মালতীর আত্মার নিজস্ব শক্তির সাথে যোগ হয়েছে দেবী কালীর শক্তি। এখন আরও অপ্রতিরোধ্য শক্তি ধারণ করেছে মালতী। একে থামানোর শক্তি তাঁর নেই। বাধ্য হয়ে জমিদার সাহেব জমিদারি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু ওই রাতেই খুন হলেন তিনি। তাঁর মৃত্যু নাকি ছিল আরও বীভৎস। সকালবেলা চাকর এসে ঘরে ঢুকে দেখেছিল জমিদার সাহেবের কঙ্কালটা বিছানার বালিশে মাথা রেখে শোয়া আর পাশের বালিশে তাঁর হাড়শূন্য শরীরটা। অবশ্য এরপর মালতীর আত্মা আর কোন উৎপাত করেনি। কিন্তু এরপর থেকে প্রতি অমাবস্যার রাতে প্রায়ই তার কান্না শুনতে পায় মানুষ।'

'কান্না শুনতে পায় কেন?' মিশুক গল্প শুরু করার পর এই প্রথম কেউ কথা বলল। এতক্ষণ হটডগ খাওয়া বাদ দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে যাচ্ছিল সবাই।

'শোনা যায় এক জ্যোতিষী নাকি একবার মালতীর হাত দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তার নাকি প্রথম সন্তানটি ছাড়া বাকি সন্তানগুলো জন্মাবার আগেই মারা যাবে। জমিদার সাহেব যখন তাকে পেটাচ্ছিলেন তখন মালতী ছিল অন্তঃসত্ত্বা। জমিদার সাহেবের সন্তানই ছিল তার গর্ভে। জমিদার সাহেবকে সে বার বার মিনতি করছিল তাকে যাই করা হোক তার সন্তানটিকে যেন শাস্তি দেয়া না হয়। তার সন্তানটি যেন পৃথিবীর মুখ দেখতে পারে। ক্রুদ্ধ জমিদার সাহেব সেটা শোনেননি। ফলে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মারা যাওয়ায় তার সন্তানটিও বাঁচেনি। এই দুঃখেই সে কাঁদে।'

'কিন্তু প্রতি অমাবস্যার রাতে কেন?'

'প্রতি অমাবস্যার রাতে সেই আত্মা জেগে ওঠে। আমাদের পেছনে যে মন্দিরটা দেখছিস এটাই সেই কালীমন্দির। জমিদারবাড়ির বাকি ঘরগুলো সব ধুলায় মিশে গেছে। আজকেও অমাবস্যা। আমি দেখতে চাই সত্যিই এরকম কিছু হয় কি না।'

নিবিষ্ট মনে সবাই মিশুকের কথা শুনছিল। একদম পিন-পতন নীরবতা চারদিকে। মাঝরাত পার হয়ে গেছে। হটডগ আর জুস সাবাড়। হাই ভলিউমে গান ছেড়ে সবাই আবার আড্ডায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কীসের মালতী, কীসের জমিদারবাড়ি আর কীসের ভূত? হৈ হুল্লোড়ে নিমিষের মধ্যে কোথায় সব ভ্যানিশ হয়ে গেল। চারদিকে থমথমে পরিস্থিতিও আর থমথমে থাকল না।

রাত শেষ হব হব করছে। ঘুম ঘুম চোখে শাওন তার স্কুল লাইফের হেডমাস্টারের সবার সামনে কলার খোসায় আছাড় খাওয়ার গল্প করছিল। 'বুঝলি, দোস্ত, আমি তখন ক্লাস ফোরে। একদিন স্কুলে ইংলিশ হোমওয়ার্ক খাতা নিতে ভুইলা গেসি। আমাদের আবার ইংলিশ ক্লাস নিত হেড মফিজ। ওঁনার অভ্যাস হইল...' মাঝপথে থেমে গেল শাওন। চোখ বিস্ফারিত। চোখ থেকে ঘুম পালিয়ে গেছে।

'কী হইল? থামলি কেন? ক, কী হইসে তারপর?'

শাওন কী যেন একটা বলার চেষ্টা করল। ঠোঁট নড়ল একটু কিন্তু কোন আওয়াজ বেরোল না। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল সবাই। সঙ্গে সঙ্গে বাকি সবাইও হতবাক হয়ে গেল। ভাঙা চোরা মন্দিরটা থেকে আবছা অবয়বে ধীরে ধীরে একটা ছায়ামূর্তি বের হয়ে আসছে। ঘোমটা টানা নারীমূর্তি, লম্বা, শীর্ণ শরীর, হাতগুলো অস্বাভাবিক লম্বা। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। সবাই নির্বাক, ভয়ে জমে গেছে একদম। আস্তে আস্তে বের হয়ে এসে ওদের পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়ে বনের ভিতর ঢুকে বসে পড়ে মিহি সুরে কাঁদতে শুরু করল। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল সবাই। সম্বিত ফিরল রবিনের কথায়, 'কী দেখছিস তোরা, চল পালাই।'

মুহূর্তের মধ্যে উঠে দৌড় দিল প্রত্যেকে। ভুলেই গেল শাওন যে দৌড়াতে পারবে না। তারস্বরে চিৎকার করে উঠল শাওন, 'তোরা আমারে ফালায় যাইস না।' সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সেই ছায়ামূর্তি।

‘ওই তোরা কই যাস? এত ভীতু তোরা আমারেই চিনলি না।’

ঘুরে দাঁড়াল সবাই। ছায়ামূর্তি জঙ্গল থেকে বের হয়ে ঘোমটা খুলে ফেলেছে ততক্ষণে।

‘আরে এ তো রোহান। ওই শালা, এইসব কী?’

‘আবসারাব। এমনেই ভয়ে বাঁচি না তারওপর আবার তুই এমন করস।’

‘কী করমু? মিশুক ভূত দেখাইতে আনল। সারা রাইত বয়া থাইকাও যখন ভূত দেখবার পারলাম না তখন ভাবলাম আমিই ভূত হইয়া যাই। দেখি তোগো রে ভয় দেখাইবার পারি কি না।’

‘তুই তো আমাদের সাথেই বইসা ছিলি। উইঠা গেলি কখন?’

‘দেখলাম তোরা সবডি ঝিমাইতাছস। প্ল্যান অবশ্য আগেই কইরা রাখছিলাম। ব্যাগে কইরা মেক আপও নিয়া আসছিলাম।’

‘কী ভয়ানক! আর একটু হইলেই হার্ট অ্যাটাক করতাম।’

‘তোরা এমনই ফ্রেণ্ডরে। ভূত দেইখা শাওনরে ফালায়াই দৌড় দিসিলি।’

‘ও–উ–উফ,’ ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল মিশুক।

‘যথেষ্ট হইছে। ভোর হয়ে আসতেসে। চল সবাই। ভীষণ ঘুম পাইসে। হোস্টেলে গিয়ে ঘুমাতে হবে।’ এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল রবিন।

উঠে পড়ল সবাই। ব্যাগ গুছিয়ে রওনা দিল। শেষবারের মত ভুতুড়ে মন্দিরটাকে এক নজর দেখে হাঁটা শুরু করল।

‘অ্যাই, এবার অন্য কেউ ধর শাওনকে। আমি ব্যাগ নিচ্ছি।’ ব্যাগের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল রোহান।

রওনা হলো সবাই। আবার সেই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ব্যালান্স ঠিক রেখে এঁকেবেঁকে হাঁটা। রীতিমত অসম্ভব ব্যাপার। সবাইকে পিছনে ফেলে রোহান দ্রুত হেঁটে এগিয়ে গেল সামনে। ‘তোরা আয়, আমি আগে গিয়া দেখি যাওয়ার কী ব্যবস্থা করা যায়।’ আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে আস্তে আস্তে।

‘তা হলে দেখছি পুরা ব্যাপারটাই বোগাস।’ হাঁটতে হাঁটতে বলল আদনান।

'বোগাস বলবি?'

'কিছুই তো দেখলাম না।'

'তাও ঠিক। তবে...রোহান, যথেষ্ট হইছে, আর না, প্লিজ। ভড়ং ছাড়।'

মিশুকের কথা শুনে সামনে তাকাল সবাই। দেখল রোহান আবার ভূত সেজেছে। সেইরকম ঘোমটা টানা ছায়ামূর্তি। হাত-দুটো অস্বাভাবিক লম্বা। এতক্ষণ ওদের দিকে ফিরে ছিল। এখন ওদের দিকে পিছন ফিরে আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করল জঙ্গলের দিকে। হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে গেল জঙ্গলের ভিতর।

'অ্যাই, রোহান, কোথায় যাচ্ছিস তুই? আমাদের ব্যাগ কোথায়?' চিৎকার করে উঠল মিশুক।

'মিশুক, চলো হাঁটি। ও আবার ভয় দেখাতে চাচ্ছে। রাস্তায় উঠলেই দেখব হারামজাদা এসে পড়েছে। চলো চলো।' তাগাদা দিল রবিন।

আবার হাঁটতে শুরু করল সবাই। কিন্তু কয়েক পা এগোতেই দেখল মিশুক সেই পিছনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। স্তব্ধ, অনড়। পিছনে ফিরে গেল আদনান। জমে শক্ত হয়ে যাওয়া মিশুককে জোরে জোরে ধাক্কা দিতে থাকল। 'অ্যাই, মিশুক, কী হয়েছে তোর? কথা বলছিস না কেন?' যন্ত্রমানবের মত আদনানের দিকে মুখ ঘোরাল মিশুক। চাহনি ভয়ার্ত, আতঙ্কগ্রস্ত। কোনরকমে হাত তুলে মিশুক তার ডানদিকে ইশারা করল। সবাই সেই ইশারা অনুসরণ করে দেখল মাটিতে ঘাসের উপর পড়ে আছে তাজা রক্তমাখা অনেকগুলো হাড়। আর তার একটু দূরে দোমড়ানো মোচড়ানো রক্তাক্ত একটা শরীর। শরীরটা যে একটা মানুষের তা শুধুমাত্র বোঝা যাচ্ছে শরীরে জড়ানো ছিন্নভিন্ন কাপড়গুলো দেখে।

রোহানের শরীর। তবে হাড়শূন্য।

মোঃ মুশফিকুর রহমান

ইকবাল আহমেদের কৌশল

ইকবাল আহমেদের আত্মকথন-১। ১৭ ডিসেম্বর, ২০০৮।

আমার নাম ইকবাল, ইকবাল আহমেদ। থাকি আমেরিকায়। হলিউডে। নামটা আমেরিকার হিসেবে আজব লাগছে না একটু? হ্যাঁ, ধরেছেন ঠিক, আসলে আমি বাংলাদেশী। পনেরো বছর যাবৎ আছি এখানে। পেশায় চিত্র পরিচালক-সোজা কথায়, সিনেমা বানাই আমি। দেশেও তাই করতাম। একদম ছেলেবেলা থেকেই সিনেমার পোকা ছিলাম। স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখবার অপরাধে স্কুলের সার আর বাবার হাতে যে কত মার খেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু মাথার 'ভূত' কি ওভাবে তাড়ানো যায়? একটু বড় হতে আমাদেরই এলাকার এক বড় ভাইকে ধরলাম-শুনেছিলাম ওঁর এক আত্মীয় নাকি ফিল্ম ডিরেক্টর। আমরা থাকতাম মফস্বল শহরে, আর ওই ভদ্রলোক থাকেন ঢাকায়। কী করি? ধীরে ধীরে বাবার পকেট থেকে টাকা সরিয়ে একদিন পালিয়ে এলাম ঢাকায়। গিয়ে পড়লাম ওই লোকের পায়ে। উনি তো কিছুতেই রাজি হন না; বারবার বলেন-তুমি বাড়ি ফিরে যাও। বাইরে থেকে সিনেমার জগৎটাকে যতটা চক্চকে মনে হয় ভেতরটা মোটেও তেমন নয়। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। সারাদিন এফডিসি'র সামনে ঘুরি, রাতে ঘুমাই স্টেশনে, আর মাঝে-মধ্যেই ধরনা দেই ওনার কাছে। ওদিকে বাবাও লোক মারফত জানিয়ে দিয়েছেন যে আমি যেন আর বাড়িমুখো না হই, এমন কুলাঙ্গার সন্তান নাকি তাঁর দরকার নেই। আমার মা মারা গেছেন আগেই-কাজেই এমনসব ক্ষেত্রে মা-রা যেভাবে বাবাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করেন, আমার ক্ষেত্রে তেমনটাও ঘটল না। আমার এহেন বেহাল দশা দেখে বোধহয় করুণাবশতই ডিরেক্টর সাহেব একদিন আমাকে বললেন, ঠিক আছে, তুমি আমার সাথেই থাকো-দেখি কী করা যায়। আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। তাঁর বাড়িতেই একটা ছোট্ট রুমে উঠলাম। ডিরেক্টর সাহেবকে খুশি

করবার জন্য সব করতাম আমি—এমনকী উনি যখন বেশি মাতাল হয়ে বমি করতেন, সেই বমিও মুছতাম যত্ন করে। আমার এই 'সাধনা'র ফলও মিলল, ডিরেক্টর সাহেব আমার ওপর সন্তুষ্ট হলেন। আমার যাত্রা শুরু হলো ওঁর হাত ধরে। পাঁচটা বছর দাঁত কামড়ে থাকলাম তাঁর সাথে। চাকর থেকে অবশেষে উঠে এলাম অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর-এর জায়গায়। ভালই চলছিল সব। কিন্তু কোথায় যেন একটা অপূর্ণতা থেকে যাচ্ছিল। আসলে, আমাদের দেশে প্রেম আর সামাজিক কাহিনি নিয়ে যেসব প্যান-প্যানানি সিনেমা তৈরি হয় তাতে মন ভরত না আমার, আমার মন পড়ে থাকত ইংরেজি হররমার্কা রক্তারক্তিঅলা সিনেমাগুলোয়। সারাদিন কাজ সেরে রাতের বেলা ভি সি আর-এ দেখতাম ওই সিনেমাগুলো, আর আক্ষেপ করতাম—ইশ! অমন একটা সিনেমায় যদি কাজ করতে পারতাম! আমার ডিরেক্টর সাহেবের মুড ভাল দেখে কথাটা বলেও ফেললাম একদিন—বস্, আমার মনে হয় একটা হরর ফিল্ম বানালে খুব চলবে। উনি প্রথমে আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন, তারপর ঠাণ্ডা গলায় বললেন—তুমি কি চাইছ আমার ঘটি-বাটি সব নিলামে উঠুক? শোনো, এসব ছবি আমাদের দেশে চলে না। তাই, যদি করে-কম্মে খেতে চাও তবে যা করছ তাই করে যাও মন লাগিয়ে; ওসব হরর ফিল্মের ভূত মাথা থেকে ঝেঁটিয়ে বের করো। কিন্তু বললেই কি আর ওই 'ভূত' তাড়ানো যায়? আমিও তক্কে-তক্কে থাকলাম কী করা যায়। এমন সময় যেন কপাল খুলে গেল আমার। আমাদের সিনেমার এক সাইড নায়িকা-কে মনে ধরল আমাদের প্রযোজক সাহেবের। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত সাইড নায়িকারা তেমন আপত্তি করেন না, বরঞ্চ প্রযোজকের মন জুগিয়ে চলে টাকা-পয়সা হাতিয়ে নেন। কিন্তু আমাদের ওই সাইড নায়িকা আবার ছিল 'সতী' টাইপ। সে এসবে কোনমতেই রাজি না। প্রযোজক সাহেব এই নিয়ে খুব পেরেশান ছিলেন। এমনই এক সন্ধ্যায় প্রযোজক সাহেব তাঁর রুমে বসে মদ্যপান করছিলেন। মাতাল মানুষের মন তরল থাকে। এই সুযোগে আমি কায়দামত ইনিয়ে-বিনিয়ে ওনাকে জানালাম যে উনি যদি আমাকে ফুল ডিরেক্টর হিসেবে একটা ছবি করবার টাকা দেন তা হলে আমি আজীবন তাঁর কেনা গোলাম হয়ে থাকব এবং এও কথা দিলাম যে

আগামী সাতদিনের মধ্যে ওই সাইড নায়িকা-কে তাঁর বিছানায় এনে দেব, তা সে যেমন করেই হোক। মেয়েমানুষের লোভ পায়ে ঠেলা কঠিন; আমাদের প্রযোজক সাহেবও এই আকর্ষণ এড়াতে পারলেন না। রাজি হয়ে গেলেন উনি। ব্যস্, আমিও কায়দা-কানুন করে মিথ্যে বলে ওই মেয়েটাকে একদিন এনে দিলাম তাঁর হাতে; আনবার আগে খানিকটা নেশা জাতীয় পাউডার গোপনে খাইয়ে নিয়েছিলাম। তাই, কাজটাও হয়ে গেল সহজেই। প্রযোজক সাহেব বেজায় খুশি হলেন আমার ওপর। তিনি টাকা খাটালেন আমার সিনেমায়। ডিরেক্টর হিসেবে আমার প্রথম কাজ।

খুব খেটে-খুটে সিনেমাটা বানালাম। জমজমাট একটা হরর ছবি বানাতে যে টেকনোলজি লাগে, যে টাকা লাগে তার কিছুই পাওয়া গেল না। তাও, যতটুকু পারলাম তার মধ্যেই বানালাম সিনেমাটা। ঝামেলা হয়ে গেল সেন্সর নিয়ে। আমার ছবিতে নাকি মাত্রাতিরিক্ত রক্তারক্তি আর অশ্লীলতা। এক্ষেত্রে ঘুষ জিনিসটা খুব কাজে লাগে। সেন্সর বোর্ডের সদস্যদের কিনে নিলাম আমি। ব্যস্, মুক্তি পেয়ে গেল আমার সিনেমা। খুব যে ভাল চলল আমার সিনেমা এমন না, কিন্তু এমন সিনেমা এদেশে প্রথম বলে কৌতূহলী দর্শকদের অনেকেই ঢুঁ মারলেন হলে। তা ছাড়া পত্রিকাগুলো কষে গালাগাল দিল এই বলে যে আমার ছবিটা নাকি অশ্লীল। এই অভিযোগ আমার জন্য শাপে বর হয়ে উঠল। কারণ, একশ্রেণীর দর্শক এই অশ্লীলতা দেখতেই ভিড় জমাল হলে। সবমিলিয়ে খুব একটা লাভ না হলেও অন্তত লস্ হলো না প্রযোজক সাহেবের। খুশি হয়ে আমার দ্বিতীয় ছবিতেও টাকা ঢাললেন তিনি। কিন্তু এবার বিধি বাম। প্রথমবারের কৌতূহল আগেই মিটে গেছে বলে দর্শক আর আমার হরর ছবিটা দেখতে গেল না। ভরাডুবি হলো আমার। হাতে টাকা-পয়সা কিছু নেই। আগে যে ডিরেক্টরের আসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করতাম তাঁর সাথে সম্পর্কটা এমন তিক্ত হয়ে উঠেছিল যে তাঁর কাছে ফিরে যাব সে পথও খোলা নেই। সব মিলিয়ে যেন চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম আমি। রীতিমত পাগল হবার দশা।

এমনই দুর্দিনে ফেরেশতার মত উদয় হলেন আমার এক

দূরসম্পর্কের মামা। হঠাৎ করেই রাস্তায় তাঁর সাথে দেখা। অনেক দিন পর দেখা। তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমার ভগ্নস্বাস্থ্য আর মলিন চেহারা দেখে তাঁর হয়তো সহানুভূতিই জেগেছিল। তিনি আমাকে বাঁচাবার পথ বাতলালেন। উনি আদম ব্যবসা করেন। বললেন, একলাখ টাকা হলে তিনি আমাকে আমেরিকায় পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবেন। যদিও কাজটা অবৈধ, কিন্তু একবার কোনমতে পৌঁছাতে পারলে কাজ-কর্ম করে টাকা কামানো যাবে। আজ থেকে পনেরো বছর আগে এক লক্ষ টাকা অনেক টাকা। আমি তখন কপর্দকহীন। অত টাকা কোথায় পাব? কিন্তু এই সুযোগ তো আর আসবে না। কী করব আমি? উপায়টা বাতলে দিলেন মামা-ই। গ্রামের বাড়িতে গেলাম আমি। দীর্ঘদিন পর আমাকে দেখে বাবা রাগ-অভিমান ভুলে বরণ করলেন। তা ছাড়া, ইদানীং ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাই মনটাও নরম হয়ে এসেছে। আমরা দুই বোন, এক ভাই। দু'বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বাবা মারা গেলে সম্পত্তির ভাগীদার হব আমি–আর দু'বোনকে ভজিয়ে-ভাজিয়ে ওদের ভাগটাও হাত করাটা খুব কঠিন হবে না আমার জন্য। একরাতে তাই পানিতে বেশি করে ঘুমের ওষুধ মিলিয়ে দিলাম। ওটা খেয়ে অক্কা পেলেন বাবা। গাঁয়ের কেউ সন্দেহ করল না, কারণ বাবা এমনিতেও ভীষণ অসুস্থ ছিলেন। তা ছাড়া আমিও এমন শোকবিহ্বল সন্তানের অভিনয় করলাম যে কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পেল না কিছু। আমার বাবার বেশি টাকা পয়সা ছিল না, কিন্তু বেশ কিছু জমি ছিল। ওগুলো বিক্রির ব্যবস্থা করলাম আমি। আমার দুই দুলাভাই অশিক্ষিত সরল মানুষ; মিথ্যে বলে ওদের ঘোল খাওয়ানোটা খুব কঠিন হলো না আমার জন্য। নিজের অজান্তেই আমার দুই বোন তাদের ভাগ লিখে দিল আমাকে। বিক্রি করে দিলাম জমিটা। হাতে এল এক লাখ ষাট হাজার টাকা। ব্যস্, তারপর আর গ্রামমুখো হইনি আমি। আমার বোনেরাও শত খুঁজেও আমার টিকির নাগাল পায়নি।

ভয় ছিল মামা না আবার টাকা নিয়ে সট্‌কে পড়ে। কিন্তু দেখা গেল লোকটা এক কথার মানুষ। অল্প ক'দিনের মধ্যেই পাকা হয়ে গেল আমার আমেরিকা গমন।

এক সন্ধ্যায় বিমানে চেপে নিউ ইয়র্কে নামলাম আমি। তখনও নিউ

ইয়র্কে এত বাঙালী গিজ্‌গিজ্ করত না। তা ছাড়া একটা পাপ করে এসেছি বলে মনে মনে একটা শঙ্কাও ছিল, তাই স্বেচ্ছায় কোন বাঙালীর কাছে সাহায্যের জন্য যেতে মন চাইছিল না। কী বিশাল এক মহানগরীতে আমি একা। কাউকে চিনি না। বুঝতে পারি মোটামুটি, কিন্তু ঠিকমত ইংরেজি বলতে পারি না। আলো ঝলমলে ওই রূপালী শহরে পকেটে মাত্র একশো ডলার নিয়ে নিজেকে ভীষণ ক্ষুদ্র মনে হলো। গা ঘেঁষাঘেঁষি করা ভিড়ে ভরা রাস্তায় প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘুরে কমদামি দেখে একটা খাবার দোকানে ঢুকলাম। এক ডলার দামের একটা হট ডগ অর্ডার দিয়ে বসলাম এক কোণে। খাওয়া শেষ করে পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম মানিব্যাগটা নেই–হাওয়া। থার্ড ব্রুক রোড দিয়ে আসবার সময় নির্ঘাত পকেট কাটা গেছে আমার। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সম্ভবত আমার ফ্যাকাসে মুখটা দেখেই একটা কালো মত তাগড়া লোক এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'ইজ দেয়ার এনি প্রবলেম?' বন্ধুর মুখ দেখেই চেনা যায়। ওই মানুষটিই পরবর্তীতে আমেরিকায় আমার সেরা বন্ধু–কিউবার মানুষ অ্যান্তোনিও ক্ল্যানসি।

এমন সৌভাগ্য আমার জীবনে আর কখনও ঘটেনি–দেখা গেল অ্যান্তোনিও সিনেমা জগতের লোক। বেশ পয়সাঅলা মানুষ। মূলত সিনেমা ডিস্ট্রিবিউশন করে সে। আর মাঝে-মধ্যে কম বাজেটের সিনেমায় টাকা খাটায়। কেন কে জানে, বাংলাদেশ থেকে আসা, কপর্দকহীন এই আমাকে পছন্দ হয়ে গেল ওর। ওর বাড়িতেই উঠলাম। বছর দু'য়েক গাধার খাটনি খাটলাম ওই লাইনে। পড়াশোনায় ভাল ছিলাম না কোন কালেই; কিন্তু আমেরিকায় সিনেমা পরিচালনা করতে গেলে অনেকগুলো পরীক্ষা দিয়ে তবে শুরু করা যায়। খেটে-খুটে পড়ে পাশও করে গেলাম এক সময়। ক'দিন কাজ করলাম কয়েকটা মুভি ইউনিটে। তারপর, অবশেষে অ্যান্তোনিও'র দেয়া টাকা দিয়েই একটা ছবি বানিয়ে ফেললাম আমি। ভয়াবহ কিছু খুন-খারাবির দৃশ্যঅলা একটা তৃতীয় শ্রেণীর ছবি। কিন্তু অ্যান্তোনিও'র ডিস্ট্রিবিউশনের জোরেই ক'টা রাজ্যের ছোট হলগুলোতে মোটামুটি ভালই চলল ছবিটা। ব্যস্, কপাল খুলে গেল আমার। একের পর এক ন'টা ছবি বানালাম আমি। মার মার কাট কাট ব্যবসা না হলেও মোটামুটি উৎরে গেল ছবিগুলো। বলাই

বাহুল্য, আমার ছবির প্রধান বিষয় ছিল রক্তারক্তি, খুন আর বীভৎসতা।

তবে খুনের শুটিং নিয়ে প্রথম দিকে খুব ঝামেলায় পড়ে গেলাম। ডামি দিয়ে খুনের দৃশ্য বাস্তবসম্মত করাটা ভীষণ কঠিন ব্যাপার আর খুব খরচও হত ওভাবে। পানির মত টাকা ঢালতে হত ওই ধরনের দৃশ্যে। মাথায় রীতিমত হাত পড়ে যাওয়ার দশা হয়েছিল আমার। বিপদ থেকে আমাকে বাঁচিয়ে দিল অ্যান্তোনিওই। অসাধারণ এক কৌশল সে বাতলে দিল আমাকে। কম খরচে অসাধারণ কাজ হলো ওই পথে। বিষয়টায় খানিকটা ঝুঁকি আছে বটে, কিন্তু ওই যে বলে না—'নো রিস্ক, নো গেইন।'

ইকবাল আহমেদ আর অ্যান্তোনিও ক্ল্যানসির কথোপকথন/এগারো বছর আগের এক সন্ধ্যা

ইকবাল : অসম্ভব, এটা কখনোই সম্ভব নয়।

অ্যান্তোনিও : সম্ভব, বন্ধু, সম্ভব।

ইকবাল : কিন্তু...।

অ্যান্তোনিও : কোন কিন্তু নয়... এত চিন্তার কিছু নেই...

ইকবাল : এত বড় রিস্ক...।

অ্যান্তোনিও রিস্ক না নিয়ে কে কবে কী করতে পেরেছ বলো... আর এটা স্রেফ একটা ব্যবসা... উন্নতি করতে হলে তো ঝুঁকি নিতেই হয়, তাই না?

ইকবাল সেন্সর বোর্ড ধরে ফেললে?

অ্যান্তোনিও তুমি আর কথা পেলে না... সেন্সর বোর্ডের ওই ছাপোষা বুদ্ধিজীবী নামধারী মানুষগুলোর ঘটে এই বিষয়গুলো আসলে তো... ওরা থাকে আর্টের অবাস্তব জগতে... এই চরম বাস্তব ওদের মাথায় নেই... আসবেও না কখনও।

ইকবাল : পুলিশ?

অ্যান্তোনিও : ওরা তো বিষয়টা জানেই না... ধরবে কেমন করে?

ইকবাল : যদি জেনে ফেলে?

অ্যান্তোনিও আরে, জানবে না। আর যদি কোনও ভাবে জেনেই ফেলে পয়সা দিয়ে সব ঠাণ্ডা করা যাবে... তুমি কি ভেবেছ শুধু তোমার

দেশের পুলিশই ঘুষ খায়, আর আমেরিকার পুলিশ ফেরেশতা... ভুল, বন্ধু ভুল... পয়সায় সব হয়... সব।

ইকবাল কিন্তু...

অ্যান্তোনিও আহ্, ইকবাল—ছেলেমানুষী কোরো না। এ ভাবে ছবি বানাতে খরচ পড়বে অর্ধেকের কম... তাতে তোমার আর আমার দু'জনেরই লাভ... নাচতে নেমে ঘোমটা দিয়ে লাভ নেই...।

ইকবাল : ঠিক আছে, তুমি যখন এত করে বলছ... আমি রাজি।

অ্যান্তোনিও: গুড্! তা হলে পরের ছবি থেকেই শুরু হোক এই কায়দা?

ইকবাল : ও. কে.। পরের ছবি থেকেই শুরু হোক।

একটা পুরোনো বাড়ি। ক্যালিফোর্নিয়া, আমেরিকা। রাত বারোটা পনেরো মিনিট। ১৩ ডিসেম্বর-২০০৮।

সিগারেটের ধোঁয়ায় গুমোট হয়ে আছে রুমটা। কেমন দম বন্ধ করা একটা পরিবেশ। নিলাম চলছে ওখানে। এমনিতে নিলামের সময় লোকের হাঁকডাকে সরগরম থাকবার কথা জায়গাটা—কিন্তু এখানে যেন ঠিক তার উল্টো। সবাই বসে আছে চুপচাপ। লোকজনও একদম কম। সবমিলিয়ে জনা পনেরো। যে নিলাম ডাকছে তার কণ্ঠস্বরও এত আস্তে যে ঠিকমত শোনাই যায় না। অ্যান্তোনিও ক্ল্যানসি বসে আছে একপাশে। মাত্র ১০০ ওয়াটের একটা বাল্বের মৃদু আলোয় বড় কক্ষটা আলোকিত তো হয়ইনি, বরঞ্চ জায়গায় জায়গায় যেন ছোপ পড়েছে অন্ধকারের। 'সাতশো পঞ্চাশ, সাতশো পঞ্চাশ...', ডাকছে নিলামঅলা। 'আটশো,' বলল কে যেন। 'আটশো, আটশো...', চলছে ডাক। 'একহাজার,' এক লাফে দু'শো ডলার বাড়িয়ে দিল কেউ। 'এক হাজার, এক হাজার...' নিলাম চলছে। 'বারোশো,' ডাক ছাড়ল অ্যান্তোনিও। 'বারোশো, বারোশো...,' চলছে ডাক। কারও সাড়া নেই। 'বারোশো এক... বারোশো দুই...,' একটু বিরতি দেয় নিলামঅলা, 'বারোশো তিন।' ডাকল না আর কেউ। জিনিসটা কিনে ফেলল অ্যান্তোনিও। বারোশো ডলার দিয়ে।

গুডগুট স্টুডিও। ক্যালিফোর্নিয়া। ১৫ ডিসেম্বর, ২০০৮। রাত।

ক্যালিফোর্নিয়া শহরের একেবারে শেষমাথায় গুডগুট স্টুডিও'র এখন পড়তি দশা। অনেক পুরানো এই স্টুডিও এখন আর ব্যবহার হয় না বললেই চলে। বছরের বেশিরভাগ সময় খালিই পড়ে থাকে। কালেভদ্রে কোন পরিচালক নিতান্ত টাকার অভাবে পড়লে আসেন এই স্টুডিওতে। স্টুডিওটার বেহাল দশা। কড়িবর্গাগুলো খুলে খুলে আসছে। ঝোপঝাড়ে ছেয়ে গেছে সামনের খোলা জায়গাটা। অন্ধকারে রীতিমত ভুতুড়ে দেখায় এগুলো। কেমন যেন কনকনে হাওয়া বইছে আজ। আকাশ অন্ধকার। চাঁদ নেই। রাত জাগা একটা পাখি হঠাৎ ডেকে উঠল শব্দ করে। স্টুডিও'র ভেতরে মোম জ্বেলে বসে আছে মার্টিন। বয়স চল্লিশের মত। কিন্তু দারিদ্র্য আর নানান অনাচারে দেখে মনে হয় পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে কোন কালে। চলচ্চিত্রের রূপালী জগতের মোহে সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে সতেরো বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালায়। সিনেমার জগৎটা যাকে দেয় তাকে উজাড় করে দেয়, আর যে পায় না সে পায় না কিছুই। মার্টিন দ্বিতীয় দলের মানুষ। মদে চুর হয়ে থাকে সারাক্ষণ, টাকার অভাব সে বোঝে হাড়ে হাড়ে, তাই একটু টাকার লোভে যেকোন রকম কাজ করতে রাজি। অনেকদিন পরে তো ডাক পেয়েছে ইকবাল আহমেদের সিনেমায়। সহজ রোল। ইকবাল ঘোড়েল লোক, বেশি টাকা দেবে না। তা না দিক, এই দুর্দিনে কাজ তো পাওয়া গেল; এই ঢের। মার্টিনের শরীরে জামা নেই। খালি গা। মুখ ভর্তি দাড়িগোঁফ। মুখের কষে ফেনা লেগে সাদাটে হয়ে আছে। হাতে ফুটখানেক লম্বা ধারালো একটা ছুরি। মোমের আলোয় চকচক করছে ওটা। সিনেমায় মার্টিনের চরিত্র এক উন্মাদ খুনীর–কম বয়েসী ছেলেদের নৃশংস ভাবে হত্যা করাই যার নেশা। মার্টিনের পাশে একটা খাটে বেঁধে রাখা হয়েছে কমবয়সী একটা ছেলেকে–খুব বেশি হলে দশ বছর বয়স হবে ওর। বিছানার সাথে শক্ত করে ওর হাত-পা বাঁধা। মুখটা সেলোটেপ দিয়ে বাঁধা। মার্টিন এগিয়ে গেল ওর দিকে। ছুরির ধারালো ফলাটা নামিয়ে আনতে লাগল আস্তে করে। আতঙ্কে চোখজোড়া যেন ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে ছেলেটার। দু'চোখ দিয়ে আতঙ্কে জল পড়ছে। মুখ বাঁধা–তাই শোনা যাচ্ছে না আর্তচিৎকার। ছুরির ফলাটা ঘ্যাচ করে ঢুকিয়ে দিলো সে

ছেলেটার এক চোখে। যন্ত্রণায় ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল ছেলেটার শরীর। ছুরির ডগায় গেঁথে মার্টিন তুলে আনল চোখের মণিটা। চোখের জায়গার ফাঁকা গহ্বর থেকে রক্ত বেরোচ্ছে গলগল করে। চোখটা ফেলে দিয়ে আবার ছুরিটা নামিয়ে আনে মার্টিন ছেলেটার গলা বরাবর। একটা লম্বা পোঁচ। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোয় ওখান থেকে। কণ্ঠনালী থেকে কেমন ঘর্ঘর্ শব্দ হচ্ছে। রক্তের ছিটে লেগে ভিজে গেছে মার্টিনের চোখ-মুখ। বীভৎস দেখাচ্ছে ওকে।

'কাট্,' আওয়াজ করে বলে ইকবাল আহমেদ। ভারি সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে ইকবালের চেহারা। আজকের দৃশ্যগ্রহণটা চমৎকার হয়েছে। ছুরির ফলায় গেঁথে চোখ বের করে আনবার দৃশ্যটা তো অনবদ্য।

ইকবাল আহমেদের আত্মকথন-২। ১৭ ডিসেম্বর, ২০০৮।

আজ আমার মনটা খুব ভাল। কাল রাতে চমৎকার হয়েছে শুটিংটা। এবারেও নিশ্চয় চমৎকার ব্যবসা করবে সিনেমাটা। অ্যান্তোনিও জিনিসটাও এনেছিল ভাল, দামেও সস্তা। স্পেশাল এফেক্ট ব্যবহার করলে কমসে' কম চল্লিশ হাজার ডলার বাড়তি খরচের ধাক্কা, অথচ এখানে কাজ হয়ে গেল মাত্র বারোশো ডলারে। ভাল উপায়, তাই না? বুঝছেন না কিছু এখনও। আসলে অ্যান্তোনিও গত পরশু একটা মানুষ কিনেছিল। হ্যাঁ, জ্যান্ত একটা মানুষ। ন'বছর বয়স ছিল ছেলেটার। গরিব দেশ থেকে আনা হয় ওদের; নিজের দেশে যেভাবে বেঁচে থাকত তার চে' বেশি খারাপ তো কিছু ঘটেনি ওর কপালে। আসলে, ওকেই মার্টিন গতকাল খুন করেছে গুডশুট স্টুডিওতে। নাহ্, খুন শব্দটা ভাল না–শুটিং-এর অভিনয় বলা যায় বরঞ্চ। এভাবেই চালাচ্ছি গত পনেরোটা বছর। সস্তায় এমন চমৎকার খুনের দৃশ্য আর কীভাবে দেখানো যায় বলুন; আপনারা যারা মাঝে-মধ্যে হলিউডের সিনেমা দেখেন তাঁরা ভিডিও দোকানিকে বলে রাখতে পারেন; সত্যি বলছি, খুনের এমন বাস্তব 'অভিনয়' আর কোথাও দেখেননি আপনারা।

আসমার ওসমান

ভৌতিক

আর ক'দিন পর বড়দিন। টরচেস্টার শহর এখন লোকজনের আনাগোনায় সরগরম। বড়দিন এলে রমরমা ব্যবসা হয় এ শহরে। রাস্তায় প্রচুর লোকজন, তবে আজ রাতের মত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দোকান-পাট।

শতাব্দী প্রাচীন 'হর্স-শু সরাইখানা'-র কফি রুমে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে ছ'জন অতিথি। আরামদায়ক আগুন জ্বলছে ঘরে, তার আলোয় বসে গল্প করছে তারা। এদের বেশিরভাগই ব্যবসায়ী, ফলে প্রথমটায় স্বভাবতই যার যার কারবারের প্রসঙ্গ এল। তারপর এটা সেটা নিয়ে আলাপ করতে করতে শেষমেশ ভূতের প্রসঙ্গ উঠল।

তিনটে ভূতের গল্প বলা হলো, কিন্তু কোনটাই কারও তেমন মনে ধরল না। সরাইখানার বাইরে প্রচুর শোরগোল, আর ভেতরে পর্যাপ্ত আলো। এই পরিবেশে ভূতের গল্প জমার কথাও নয়। তবে চার নম্বর গল্পটা বেশ জমে উঠল। রাস্তায় লোক অনেক কমে এসেছে, এবং বক্তা গল্প শুরু করার আগে গ্যাস লাইট নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। আগুনের শিখায় আলোকিত জানালার কাঁচ, দেয়ালে ছায়া-নৃত্য। এ গল্পটা শ্রোতাদের আগ্রহ ধরে রাখল।

'গল্পটা ভাল,' অবশেষে মন্তব্য করল এক শ্রোতা, চুমুক দিল উষ্ণ হুইস্কির গেলাসে। 'ভূতেরা মানুষের আশপাশে থাকতে চায় এ তো পুরানো কথা। এক লোকের মুখে একবার ট্রেনে-চড়া ভূতের গল্প শুনেছিলাম। তার সহযাত্রীটি যে ভূত জানত না সে। টিকেট চেকার এলে ভূতটা অনেকক্ষণ তার পকেট হাতড়ায়, তারপর টিকেট খুঁজে না পেয়ে পালায় জানালা গলে।'

'যথেষ্ট হয়েছে, হার্স্ট,' বলল আরেকজন।

'এটা কিন্তু ছেলেখেলার বিষয় নয়,' বেঁটে মত এক বুড়ো ভদ্রলোক বললেন। 'আমি কখনও ভূত দেখিনি। তবে দেখেছে এমন লোকের কথা

জানি। বলতে কী, এই সরাইখানাটারও কিন্তু ভুতুড়ে অপবাদ আছে।'

'জানতাম না তো,' বলল একজন। 'এখানে বেশ কয়েক বছর ধরেই তো আসছি।'

'সে বহু আগের কথা,' বললেন বৃদ্ধ। সার্ভ করতে আসা ওয়েটারের উদ্দেশে বললেন, 'জর্জ, তুমি তো জেরি বাগুলারের কথা শুনেছ, তাই না?'

'অল্প-বিস্তর, সার,' জবাবে বলল বৃদ্ধ ওয়েটার, 'তবে আমার বিশ্বাস হয় না। এখানকার এক কর্মচারী নাকি ওকে দেখেছিল। মানে সে তাই বলে আরকী। ম্যানেজার তাকে খেদিয়ে দিয়েছেন।'

'আমার বাবার এ শহরেই জন্ম,' বললেন বুড়ো ভদ্রলোক। 'কাহিনিটা তার কাছেই শোনা। বাবা মিথ্যে বলত না, নিয়মিত চার্চে যেত। এ বাড়িতে জেরি বাগুলারের ভূত দেখেছে সে।'

'কে এই জেরি বাগুলার?' প্রশ্ন করল একটি কণ্ঠস্বর।

'লণ্ডনের এক চোর, দাগী আসামী,' জানালেন বৃদ্ধ। 'এ বাড়িতে বড়দিনের কাছাকাছি সময়ে ধরা পড়ে সে। তা প্রায় আশি বছর আগের কথা। এ ঘরে শেষবারের মত সাপার করে সে। শুতে যাওয়ার পর দু'জন পুলিশ আসে তার খোঁজে। লণ্ডন থেকে ওকে ফলো করে ওরা। বাড়ির মালিক ওদেরকে নিয়ে যায় ওপরতলায়। কিন্তু দরজা খুলতে গিয়ে ব্যর্থ হয় তারা। তো এক পুলিশ নীচে রাস্তায় চলে যায়। ওখান থেকে জেরির ঘরের জানালায় উঠে আসে। রাস্তা থেকে লোকজন জেরিকে জানালায় দাঁড়ানো দেখতে পায়। হঠাৎ কাঁচ ভাঙার শব্দ ওঠে, আর পুলিশটা জানালা থেকে ছিটকে পাথরের রাস্তায় এসে পড়ে। চাঁদের আলোয় চোরটার ফ্যাকাসে মুখ দেখা যায় জানালায়।

'অপর পুলিশটা তখনও মালিককে নিয়ে দরজা ভাঙার চেষ্টা করছিল। ভেতরে ভারী ফার্নিচার ঠেক দেয়া ছিল, কিন্তু শেষমেশ ঘরে ঠিকই ঢোকে ওরা। আর ঢুকেই দেখে জেরি বাগুলার–গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে।'

'কোন্ বেডরুম ছিল ওটা?' একজন জানতে চাইল।

মাথা দোলায় বক্তা। 'তা আমি বলতে পারছি না। তবে লোকে বলে,

জেরিকে এখনও নাকি এ বাড়িতে দেখা যায়। মানুষ খুন করার চেষ্টা করে সে, যদিও পারে না।'

উঠে পড়লেন বৃদ্ধ, একে একে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

'গ্যাস জ্বেলে দেব, মি. ম্যালকম?' জানতে চায় ওয়েটার, জর্জ।

'না, দরকার নেই। এমনিতেই যথেষ্ট আলো দিচ্ছে ফায়ারপ্লেস,' বলল অতিথি। 'হ্যাঁ, তা তোমাদের আর কারও কোন ভূতের গল্প জানা আছে নাকি?'

'আজকের মত অনেক হয়েছে,' বলল একজন। 'বাদ দাও।'

'এক কাজ করলে কেমন হয়,' প্রস্তাব করল হার্স্ট। 'আমি জেরি বাণ্ডলারের পোশাক পরে বুড়ো ভদ্রলোককে একটু ভয় দেখাই। কি, দেখাব?'

'বাহ্, দারুণ আইডিয়া!' বলল ম্যালকম। কিন্তু অন্যরা আপত্তি জানাল।

'স্রেফ ঠাট্টা করব তো,' বলল হার্স্ট।

'কোন দরকার নেই,' বলল আরেকজন।

'একটু মজা করলে ক্ষতি কী,' হার্স্ট নাছোড়। 'আমার ঘরে পুরানো আমলের কিছু কাপড়-চোপড় আছে। একটা নাটকে অংশ নেব বলে পরতে হবে ওগুলো। আমি মন্দ অভিনয় করি না, কী বলো হে, সমার্স?'

'তা ভালই করো!' ওর বন্ধু হেসে উঠে জানাল।

'তুমি আমাকে ভয় দেখাতে পারলে এক পাউণ্ড দেব,' বলল ম্যালকম।

'বেশ,' বলল হার্স্ট। 'আর না পারলে আমি উল্টো টাকাটা তোমাকে দেব।'

'আমাদের ভয় দেখাতে পারবে না,' বলল একজন। 'আমরা তো আগে থেকেই তৈরি থাকব। তবে যাই করো ওই বুড়ো ভদ্রলোককে ভয় দেখিয়ো না।'

'ঠিক আছে, দেখাব না। তবে প্রথম চেষ্টটা তোমার ওপর দিয়েই যাবে,' বলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল হার্স্ট। 'গ্যাস জ্বেলো না।'

ও বেরিয়ে যাওয়ার পরও আলোচনা চলতে লাগল। দু'জন অতিথি গেল শুতে। রাত তো কম হয়নি। আধ ঘণ্টা পর, জর্জ ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে ঢুকল।

'উনি আসছেন!' চিৎকার করে বলল। 'ওঁকে বারে দেখেছি আমি। খুব অল্প আলো ছিল ওখানে।'

'যাই, আমি গিয়ে নিয়ে আসি ওকে,' বলল ম্যালকম।

'যাবেন না, সার!' ওকে আটকে দিল জর্জ। 'সে কী জিনিস না দেখলে বুঝবেন না।'

হঠাৎ ঘরের বাইরে থেকে চিৎকারের শব্দ উঠল, এবং কেউ একজন দৌড়ে কামরায় প্রবেশ করল।

'কী হলো? কী ব্যাপার?' থতমত খেয়ে জানতে চাইল ম্যালকম। 'ও, হার্স্ট!' বলল আশ্বস্ত সুরে। 'গ্যাস জ্বালো, জর্জ,' বলল।

গ্যাসের আলোয় হার্স্টকে পরিষ্কার দেখা গেল। প্রাচীন আমলের পোশাক পরনে ওর। কিন্তু তখনও ড্রেস আপ করতে পারেনি পুরোপুরি। ভয়ে কাঁপছে থরথর করে।

'কী হলো?' জবাব চাইল ম্যালকম।

'আমি ভূতটাকে দেখেছি,' শ্বাসের ফাঁকে কোনমতে বলতে পারল হার্স্ট। 'জীবনে আর ও নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করব না!'

ঘরের খোলা দরজাপথে বাইরে চেয়ে রয়েছে সে।

'ওই যে, আবার মনে হয় দেখলাম। তোমরা কেউ কিছু দেখতে পাচ্ছ না?'

'না, ওখানে তো কিছুই নেই,' বলল ম্যালকম। কিন্তু ওর কণ্ঠ কেঁপে গেল আতঙ্কে।

'ঘুরে দাঁড়াতেই দেখতে পাই ওটাকে,' কথার খেই ধরে হার্স্ট। 'সাদা, মড়া মুখ ওটার।'

'বারের কাছে আমিও দেখেছি,' সায় জানায় জর্জ। 'ভয়ঙ্কর সে মূর্তি!'

হার্স্ট কাঁপতে কাঁপতে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল।

'অবাক কাণ্ড তো,' বলল ম্যালকম। 'দু'দু'জন মানুষের চোখের ভুল

হতে পারে না। এই সরাইতে আমি আর উঠব না বাবা।'

'আমি কাল চলে যাচ্ছি,' ঘোষণা করল জর্জ। 'আমাকে পঞ্চাশ পাউণ্ড দিলেও একা আর ওই বারের ধারে-কাছে যাচ্ছি না।'

'আমরা বেশি আলোচনা করেছি বলে এটা ঘটল,' বলল একজন।

'আমার তো এখন শুতে যেতেই ভয় করছে,' বলল ম্যালকম।

'আমি স্পষ্ট দেখেছি, সার,' বলল জর্জ। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে ইশারা করল। ওর আঙুল অনুসরণ করে অবশ্য কেউ কিছু দেখতে পেল না। একজনের ধারণা হলো, একটা মাথা উঁকি দিতে দেখেছে, তবে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারল না সে। ম্যালকম দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল, বারে কেউ আছে কিনা দেখতে।

'দেখতে পেলেন, সার?' সে ফিরলে জানতে চাইল জর্জ।

'জানি না,' শান্ত সুরে বলল ম্যালকম। 'এখন কেমন বোধ করছ?' হার্স্টকে জিজ্ঞেস করল।

'আগের চেয়ে ভাল,' জবাব দিল হার্স্ট। গলার স্বর শীতল তার। সবাই চেয়ে আছে ওর দিকে।

'সবাই হয়তো ভাবছে আমি একটা ভীতু,' বলল সে। 'কিন্তু তোমরা তো ওটাকে দেখোনি, দেখলে বুঝতে।'

ম্যালকম মৃদু হেসে বলল, 'তা ঠিক।'

'আমি শুতে যাচ্ছি,' বলল হার্স্ট, লক্ষ করেছে ম্যালকমের মুচকি হাসি। 'তুমি কি আমার ঘরে শোবে, সমার্স?'

'নিশ্চয়ই,' বলল ওর বন্ধু, 'সারা রাত যদি আলো জ্বেলে রাখো।'

ওরা দু'জন ওপরে চলে গেল। ওদের ঘরে দরজা লেগেছে শুনতে পেল অন্যরা।

'এখন তো মনে হচ্ছে,' আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে বলল ম্যালকম, 'হার্স্টকে একটা পাউণ্ড দিতে হবে আমার। কিন্তু আমার ধারণা আমি জিতেছি। আমার জীবনে কোনদিন কাউকে এত ভয় পেতে দেখিনি।'

'আমার ঘরে কি কেউ শোবেন?' ওর এক শ্রোতা জানতে চাইল। 'আমার একা থাকতে ভয় করছে।'

'আমি থাকব,' জানাল ম্যালকম।

'আমরা আশা করি একসাথে থাকছি, মি লীক,' তৃতীয় একজন চতুর্থ জনের উদ্দেশে বলল।

'না, ধন্যবাদ,' জানাল লীক। 'আমি ভূত-টুতে বিশ্বাস করি না। আমার ঘরে কিছু এলে সোজা গুলি চালাব।'

'ভূতের তাতে থোড়াই ক্ষতি হবে, লীক,' বলল ম্যালকম।

'গুলির শব্দে সবাই সজাগ তো হবে,' জবাবে বলল লীক। 'তবে আপনার ভয় করলে জর্জকে সাথে নিতে পারেন। ও নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না,' তৃতীয় লোকটির উদ্দেশে বলল লীক।

'প্রশ্নই ওঠে না,' জানাল জর্জ। 'আমিও তা হলে জানে বাঁচি। আপনারা দয়া করে আমার সাথে একটু বার পর্যন্ত আসবেন? গ্যাসটা নেভাতাম।'

লীক বাদে সবাই গেল। সাবধানে সামনে দৃষ্টি রেখে এগোল ওরা। জর্জ বারের আলো নেভালে পরে, কফিরুমের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে এল দলটা। এবারে ঘরে যাওয়ার পালা।

'আলোটা আমার হাতে দিয়ে তারপর গ্যাস নেভাও, জর্জ,' বলল ম্যালকম।

তার নির্দেশ পালন করল ওয়েটার। ঠিক সে মুহূর্তে ওরা সবাই একটা আওয়াজ শুনতে পেল। দরজার ওপাশে আছে কেউ একজন। এবার কফিরুমের দরজাটা খুলে গেল ধীরে ধীরে। ম্যালকম পিছে সরে গেছে, মুখ হাঁ তার। দরজায় দেখা দিল ধবধবে সাদা একটা মুখ। চোখজোড়া ওটার কোটরাগত।

মুহূর্ত কয়েক মূর্তিটা স্থির দাঁড়িয়ে লক্ষ করল ওদের। তারপর ঘরের একটু ভেতরে এসে দাঁড়াল।

কারও মুখে কথা নেই, কেউ নড়ছে না। সবাই একদৃষ্টে মূর্তিটাকে দেখছে। গলা থেকে কী যেন একটা খুলে নিল ওটা, এবং মাথাটা তার ফলে কাত হয়ে পড়ল এক পাশে। নিথর দাঁড়িয়ে অবয়বটা। এবার ম্যালকমকে লক্ষ করে এগিয়ে আসতে শুরু করল, হাতে কিছু একটা জিনিস বাড়িয়ে ধরা।

পরক্ষণে দড়াম করে এক শব্দ হলো, আর বাতি গেল নিভে। মেঝেতে কী যেন পড়ে থাকতে দেখল ওরা। সশব্দ শ্বাস-প্রশ্বাসের পর কামরার ভেতর নেমে এল অটুট নীরবতা।

সবার আগে কথা ফুটল ম্যালকমের মুখে। 'ম্যাচ,' অদ্ভুত শোনাল ওর কণ্ঠ। জর্জ দিয়াশলাই জ্বেলে তারপর গ্যাস জ্বালল। ম্যালকম ভূপাতিত জিনিসটিকে স্পর্শ করল পা বাড়িয়ে, নরম-নরম ঠেকল ওর কাছে। সঙ্গীদের দিকে চাইল এবার সে। তারা প্রশ্ন করতে চাইছিল, কিন্তু মাথা দোলাল ও। একটা প্রদীপ হাতে নিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ল ম্যালকম। কাছ থেকে লক্ষ করল নিস্পন্দ দেহটাকে।

তারপর উঠে দাঁড়াল ঝট করে, টেবিল থেকে তুলে নিল পানির জগ। রুমালটা পানিতে ভিজিয়ে সাদা মুখটা মুছে দিল। ভয়ার্ত চিৎকার ছেড়ে পেছনে সরে গেল পরমুহূর্তে।

লীকের হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তল, দু'হাতে মুখ ঢাকল সে। অন্যরা এগিয়ে এসে ভয়তাড়িত চোখে চেয়ে রইল হার্স্টের মরা মুখটার দিকে।

কারও গলায় স্বর ফুটল না, খুলে গেল দরজা। হন্তদন্ত হয়ে ঘরে এসে ঢুকল সমার্স। দু'চোখ বিস্ময়ে বিস্ফোরিত তার, দৃষ্টি মৃতদেহের ওপর স্থির।

'হায় খোদা!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'তোমরা ওকে...'

সবাই নিশ্চুপ।

'আমি ওকে নিষেধ করেছিলাম,' ক্ষীণ কণ্ঠে বলল ও। 'নিষেধ করেছিলাম...'

গুরুতর অসুস্থ দেখাচ্ছে ওকে। ওর অচেতন দেহটা তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল ম্যালকম।

মূল: ডব্লিউ ডব্লিউ জ্যাকবস
রূপান্তর: কাজী শাহনূর হোসেন

দু'জন দুর্বল মানুষ

এক

আজ রাতটা অতিরিক্ত রকম কালো। শহরে সাধারণত এমনটা দেখা যায় না। একটা তারা পর্যন্ত নেই আকাশে। চারপাশ ঘুটঘুটে অন্ধকার। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। আজ সারাটা দিনই এমন কেটেছে। কখনও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। কখনওবা মুষলধারে বৃষ্টি—ক্যাটস অ্যাণ্ড ডগস যাকে বলে। সন্ধ্যার দিকে কোথাও বোধ হয় ট্রান্সমিটার বার্স্ট করেছে; বিদ্যুৎ একেবারেই নেই। দোকান-পাট সব দু'ঘণ্টা আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পরিবেশটা মোটামুটি রকম অস্বস্তিকর বলা যায়।

আমি হাঁটছি। বৃষ্টির পানি জমেছে রাস্তায়—ছপ ছপ শব্দ হচ্ছে। বাতাস বইছে প্রচণ্ডভাবে। ভয় হচ্ছে আমার পাটকাঠির মত শরীরটা না উড়ে যায়। আচ্ছা আমি যদি এখন সত্যি সত্যি উড়ে যেতাম তবে কেমন হত? উড়তে উড়তে হয়তো এমন কোথাও থামতাম যেখানের কিছুই আমি চিনি না! অথবা লোকালয়ের বাইরে যদি চলে যেতাম। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে শত শত বছর আগের কোন অশ্বত্থ। বাহু প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে বহু কাহিনির সাক্ষী হয়ে। তখন কী করতাম আমি? ভয় নিশ্চয়ই পেতাম না। আমি এতটা ভীতু কখনওই নই।

বৃষ্টির ঝিরিঝিরি ফোঁটাগুলো বাতাসের তোড়ে আছড়ে পড়ছে আমার বিশালাকৃতি বর্ষাতিতে। আমি অবশ্য যা পরি তাই-ই বিশালাকৃতি মনে হয়। বর্ষাতিটা বাতাসের তোড়ে ফুলে ফেঁপে উঠছে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো বর্ষাতির গায়ে পড়ে এক অদ্ভুত শব্দ করছে। আমি উড়ে যে অশ্বত্থ গাছটার কাছে যেতাম ওটার পাতায় বৃষ্টি পড়লে এমন শব্দই হত।

এই মুহূর্তে আমাকে দেখলে যে কেউই ভয় পাবে। ড্রাকুলা-ট্রাকুলা কিছু একটা ভেবে বসতে পারে। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কাছে পিঠে বিকট

শব্দে কোথাও বাজ পড়ল। হঠাৎ উজ্জ্বল আলোয় চোখ ঝলসে ওঠায় সবকিছু আরও বেশি অন্ধকার লাগছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে পথ চলা বেশ কষ্টের। টর্চটা আনা উচিত ছিল। মোবাইলটাও আনিনি। পকেটে থাকলে বর্ষাতির জন্যে ভিজত না। আজকাল খুব ছিনতাই হচ্ছে এদিকে। এজন্যেই মোবাইলটা আনিনি।

এত অন্ধকারে কেমন যেন কিছুটা ভয় ভয় লাগা শুরু করল। ভূতের ভয় না, মানুষের ভয়। ইদানীং এদিকে অদ্ভুত কিছু ব্যাপার হচ্ছে। মানুষ উধাও হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা এমন–শহরে বেশ কিছুদিন ধরে মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে প্রত্যেকেই কোনও না কোনও কাজে এদিকে এসেছে। এরপরে আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। পুলিশ বেশ তৎপর। এলাকাবাসী পাহারাদারের সংখ্যা বাড়িয়েছে। এই পরিবেশে তারা বের হয়েছে বলে মনে হয় না।

এলাকাটা বেশ নির্জন। শহর থেকেও কিছুটা বাইরে। এতটা বাইরে এত রাতে একটা মেয়ে আসতে পারে আমার ধারণায় ছিল না। তাও আবার অবিবাহিতা একটা মেয়ে। ভালবাসা বোধ হয় এমনই।

আমার কিছুটা টেনশন হচ্ছে। তিয়ানার কোনও বিপদ হলো না তো? অন্যদের মত হারিয়ে গেল নাকি? টগরের বাসায় যাওয়ার আগে কিছু বোঝা যাবে না।

আমি এখন যাচ্ছি টগরের বাসায়। প্রেমিক-প্রেমিকা যুগলের কাছে। সেই সকালে তিয়ানা বাড়ি থেকে বের হয়েছে বান্ধবীর বাসায় যাবে বলে। একমাত্র আমিই জানি ও গেছে টগরের বাসায়। তিয়ানা আমার বন্ধু। একসাথে কলেজ পর্যন্ত আমি, টগর আর তিয়ানা পড়েছি। এরপরে আমি ঢাকায় চলে যাই। ওখানে ভার্সিটিতে ভর্তি হই। একটা পার্টটাইম চাকরিও জুটিয়ে ফেলি। ওরা এই মফস্বলেই থেকে যায়। এখন অবশ্য আমি সাংবাদিকতা করি। ওরাও এখানেই কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। টগর একটা এন.জি.ও-তে চাকরি করে। তিয়ানাও এন.জি.ও.তে চাকরি করে; তবে অন্য একটা। তিয়ানার সব কথাই টগর ছাড়া একমাত্র আমি জানি। অবশ্য আমার আর টগরের অনেক কথাই তিয়ানা জানে না–অনেক কথা।

দুই

আমার আর টগরের প্রথম পরিচয় স্কুলে ভর্তির সময়। আমি বাবার হাত ধরে ছোট্ট ছোট্ট পায়ে হেডমাস্টারের রুমে ঢুকলাম। ছোটবেলা থেকেই আমি ছিলাম অতিরিক্ত রকমের লাজুক প্রকৃতির। এর জন্য অবশ্য দায়ী ছিল আমার ছোট্ট শরীরটা। ছোট বেলা থেকেই আমার শারীরিক গঠন ছিল ক্ষুদ্রকায়। অতিরিক্ত রকমের হালকা-পাতলা। খুব বেশি রকমের ছিল। এ নিয়ে আমার লজ্জার অন্ত ছিল না। লজ্জার থেকে বেশি কাজ করত ভয়। সমবয়সী প্রায় সবার কাছে মার খেতাম। যে কারও সাথে কারও ঝগড়া বাধলে রাগের বহিঃপ্রকাশটা ঘটত আমার উপরে। ওটুকুন বয়সেই জীবনের উপরে চরম তিক্ততা এসে গিয়েছিল। ওই তিক্ততা থেকে আমাকে উদ্ধার করেছিল টগর।

হেডমাস্টারের রুমে ঢুকেই আমার সব ভয় আর লজ্জা কেটে গিয়েছিল। আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলাম আমি। আছে, আছে! আমার মত অভাগা আর একটি আছে। হেডমাস্টারের রুমে আমার মতই আর একটা ছেলে বসে আছে। রোগা-পাতলা আর টিঙটিঙে। আমাকেও হার মানাবে। হেডমাস্টারকে আমার বাবা সালাম দিয়ে বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'সার, আমার ছেলে। ওকে এবার ভর্তি করাতে চাই।'

হেডমাস্টার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী নাম তোমার?'

ছোট্ট আমি আমার সমস্ত শক্তি জড়ো করে বললাম, 'নিষাদ।'

'চমৎকার নাম। তুমি কাল থেকেই স্কুলে আস। এই ছেলেটাও তোমার সঙ্গেই পড়বে,' সার টগরকে দেখিয়ে বললেন। 'আজ থেকে তোমরা দু'জন বন্ধু। দুই তালপাতার সেপাই।' এই বলে সার আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন, হা হা হা। আমার বাবাও সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠলেন। এরপর সার বাবাকে বললেন, 'আমার ছেলে টগর। আপনার ছেলের সঙ্গে ভালই মিলবে মনে হয়।'

সারকে আমার বেশ ভাল লেগেছিল। এমন মানুষ হয় না। তা ছাড়া

তিনি সব হেডমাস্টারদের গণ্ডি থেকে বের হয়ে এসেছিলেন। হেডমাস্টার মানেই যে গুরুগম্ভীর এই শর্ত তিনি ভঙ্গ করেছিলেন। তাঁর ছেলেটাও ছিল তেমন। সারাক্ষণ হাসিখুশি। একমাত্র একটা ব্যাপারেই ছিল তার আক্ষেপ–শারীরিক ক্ষুদ্রতা। আমরা বারোটা বছর একসাথে কাটিয়েছি। এই বারো বছরে তার মনে একটাই দুঃখ ছিল–শারীরিক অপূর্ণতা। এতটা দুর্বল মানুষ হতে পারে! আমার সাথে এজন্যেই হয়তোবা তার সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ ছিল। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি এই বারো বছরে তার সাথে আমার একবারও ঝগড়া হয়নি। আমাদের দুজনের দুর্বলতা অবশ্য অনেকখানি দূর হয়ে গিয়েছিল দু'জন একত্র হওয়ার পরে। দু'জন দুর্বল মানুষ মিলে আমরা অনেকখানি সবল হয়েছিলাম। বারোটা বছর আমরা একসঙ্গে থেকেছি। ভয়ংকর সব কাজ করেছি দু'জন মিলে, যা একা থাকলে কল্পনা করার শক্তিও ছিল না আমার। এ বাড়ির আম চুরি করেছি, ও বাড়ির জাম। গভীর রাতে ঘুরে বেড়িয়েছি বনে বাদাড়ে। একে-তাকে ভয় দেখিয়েছি। কালীমন্দিরে রাত কাটিয়েছি। শারীরিক গঠনের জন্যে একটা সুবিধা সবসময় পেয়েছি–কেউ আমাদের কখনও সন্দেহ করেনি।

এই বারোটা বছর আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি স্বাস্থ্য ভাল করার জন্য। কোনও কাজ হয়নি। শরীরে অস্বাভাবিক শক্তি বেড়েছে, তবু মোটা হতে পারিনি। আমি এক সময় হাল ছেড়ে দিয়েছি তবু টগর ছাড়েনি। কলেজে ভর্তি হওয়ার পর একটা ঘটনায় তা আরও বেড়ে গেল।

কলেজে উঠে টগর প্রেমে পড়ল। আমাদেরই ক্লাসমেট, মিথিলা নাম। এর আগে তিয়ানা ছাড়া আর কোনও মেয়ের সাথেই কথা বলিনি। তাই বোধ হয় মেয়েটাকে অতিরিক্ত রকমই চেপে ধরলাম। প্রতিদিন জ্বালাতন করতাম মেয়েটাকে। চিঠি, বাক্যবাণ সব একটু বেশিই চলতে লাগল। তবু মেয়েটাকে রাজী করানো গেল না। একদিন তো রাগ করে বলেই ফেলল, 'তোর মত শুঁটকার সাথে প্রেম করবে কে?'

কথাটা শুনে টগর প্রচণ্ড রকমের দুঃখ পেয়েছিল।

এরপর থেকে ওর শরীরের প্রতি নজর আরও বেড়ে গেল। আমি

আর তিয়ানাওকে অনেক বুঝালাম। তবু ওর চাল-চলনে পরিবর্তন হলো না। নানা রকম বইপত্র ঘাঁটতে লাগল। ডাক্তার-কবিরাজও বাদ গেল না। কিছুতেই কিছু হলো না। একসময় ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা আসল। পরীক্ষা দিলাম। ভালভাবে পাশও করলাম। আমি ঢাকায় চলে গেলাম। ওরা দু'জন ওখানেই থেকে গেল। ওদের নাকি এখানেই ভাল লাগে।

তিন

অনার্সটা শেষ করে আমি আমার পুরানো মফস্বলে ফিরে এলাম। ক'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছিলাম। আমার এখন বেড়ানোও বেশ সমস্যা। পার্টটাইম একটা চাকরি করি। নিয়মিত না গেলে বেতনে সমস্যা হয়।

বাবাও ঢাকায় বদলি হয়েছেন। ওই মফস্বলে রয়ে গেছেন আমার এক মামা। এ ছাড়া আমার আর কোনও আত্মীয় ওখানে নেই। তাই তেমন আসা হয়নি। টগরের সাথেও বেশ ক'বছর দেখা হয়নি। অবশ্য চিঠিতে আর মোবাইলে নিয়মিত কথা হয়েছে। সার নাকি মারা গেছেন। আণ্টি তো আগেই মারা গেছেন। ও এখন শহরের বাইরে থাকে। নিজেদের বাড়ি। তিয়ানার সাথে ওর প্রেমের ব্যাপারটাও মোবাইলেই জেনেছি।

তিয়ানার সঙ্গে ওর প্রেমটা হঠাৎ করেই হয়ে গেল। এই তো বেশি দিন হয়নি। তিয়ানাই নাকি ওকে আগে অফার করেছে। আমার কেন যেন বিশ্বাস হয়নি। তিয়ানা ওকে কী দেখে অফার করল? তাছাড়া আমি নিজেও তিয়ানাতে সামান্য মজেছিলাম। এই বোধহয় প্রথম আমি টগরের উপরে সামান্যতম ঈর্ষা বোধ করলাম। অবশ্য ঈর্ষাটা অতি সামান্যই।

তিয়ানার সঙ্গে ওর প্রেমের ব্যাপারটা একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে দেখছি। এখন আর শরীর নিয়ে মোটেও আক্ষেপ করে না ও। তিয়ানা নিশ্চয়ই ওকে বুঝিয়েছে।

টগরকে দেখে আমি একটা ধাক্কা খেলাম বলা যায়। ছোটখাট ধাক্কা না, বেশ বড়সড় ধাক্কা। ও এত মোটা হলো কেমন করে! বিশাল মোটা না তবে স্বাস্থ্যবান যে কেউ বলবে। যে কোন মেয়ে ওকে একবার দেখলেই প্রেমে পড়ে যাবে। লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইটের মত হবে, প্রথম দর্শনেই প্রেম। এখন বুঝলাম তিয়ানা ওকে কেন অফার করেছে।

এমন চমৎকার স্বাস্থ্য ও কেমন করে বানাল! আমার মাঝে আবারও ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এবার বেশ বড়সড় ভাবে। এমন স্বাস্থ্যবানকে যে কোনও স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের মানুষই ঈর্ষা করবে। আমি তো তালপাতার সেপাই।

ওকে দেখে যেমন করব বলে ঠিক করেছিলাম তেমন কিছুই করলাম না। করতে পারলাম না বলা যায়। ঝাঁপিয়ে ওর উপরে পড়লাম না। দু'হাত প্রসারিত করে দৌড়েও গেলাম না। শক্ত করে জড়িয়েও ধরলাম না। শুধুমাত্র হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। অতি অনাগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন আছিস?' আমার আসলে বার বার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল, 'কেমন করে এমন দেহ বানিয়েছিস। আমাকে তোর গোপন রহস্যটা জানিয়ে দে।'

'ভাল আছিরে, দোস্ত, দেখছিস না?' বলে জড়িয়ে ধরল ও আমায়। আমার শরীরের প্রত্যেকটা হাড় যেন মট মট করে উঠল। জানান দিল আমি ভাল নেই। টগর আবার বলল, 'তুই কেমন আছিস? নিশ্চয়ই জানতে চাচ্ছিস এমন স্বাস্থ্য কেমন করে বানিয়েছি। বলব, তোকে সব বলব। তোকে না বললে কাকে বলব। আমাকে দেখে নিশ্চয়ই চমকে উঠেছিস? এই চমকটা তোকে দেব বলেই এই খবরটা জানাইনি। রাগ করিস না, দোস্ত।'

আমার মনটা আনন্দে লাফ দেয়। আমিও এমন হব! এমন সুপুরুষ হতে পারব আমি কল্পনাও করিনি। আমার কেন যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। এমন সময় টগর বলে উঠল, 'দেখিস তোকে আমি এমন করে দেব। পুরোপুরি সুপুরুষ। তোর অবিশ্বাসের কোনও কারণ নেই।'

আমি এবারও চমকে গেলাম। ও যেন কেমন করে আমার মনের কথা টের পেয়ে যাচ্ছে। এ কেমন করে সম্ভব। নিশ্চয়ই কাকতালীয়

ভাবে ঘটেছে। অবশ্য ওকে দেখে আমার অনেক কিছুই সম্ভব মনে হচ্ছে।

টগর বলল, 'নিষাদ, তোকে শীঘ্রিই আবার এখানে আসতে হবে। সেদিন থেকে শুরু হবে তোকে মোটা করার প্রক্রিয়া।'

এরপর দু'দিন মাত্র ঘুরেছি। টগরের সঙ্গে কাটিয়েছি পুরোটা সময়। টগর অনেক কিছুই বলেছে আমাকে। শুধুমাত্র মোটা কেমন করে হয়েছে বলেনি। বলেছে খুব তাড়াতাড়িই নাকি আবার আসব। সেদিন সব বলবে।

দু'দিন পরে আমি ঢাকা চলে এলাম।

চার

ঢাকায় এসে আমি সাংবাদিকতার পেশায় ঢুকলাম। ক'দিন বেশ কেটে গেল। হঠাৎ খবর আসল, মামা প্রচণ্ডরকম অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমি ক'দিনের ছুটি নিয়ে মাকে নিয়ে মামাকে দেখতে গেলাম। অবাক হয়ে দেখলাম টগরের কথাই সত্যি হয়েছে। মামা বাড়ি এসে দেখলাম মামা মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

আসার সময়ে আবহাওয়া তেমন একটা ভাল ছিল না। আকাশ মেঘলা। কাল মেঘগুলো ভালই ওড়াওড়ি করছিল। আসার পরে শুরু হলো বৃষ্টি। ভেবেছিলাম তিয়ানা আর টগরের সঙ্গে দেখা করব। কিন্তু এমন আবহাওয়ায় বের হতে ইচ্ছে হলো না। তা ছাড়া জার্নির ধকল গেছে। কাল দেখা করা যাবে। টগরের সাথে দেখা করার জন্য অবশ্য মনটা অস্থির হয়ে আছে।

সন্ধ্যার পরপরই বিদ্যুৎ চলে গেল। ট্রান্সমিটার বার্স্ট করেছে বোধ হয়। সাতটা-আটটার দিকেই খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়লাম। সাড়ে নটার দিকে মা আমাকে ঘুম থেকে জাগালেন।

তিয়ানার বাবা এসেছেন। আমাকে আলাদা ডেকে নিয়ে বললেন তিয়ানাকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। কোন বান্ধবীর বাড়ি যাওয়ার কথা

বলে বেরিয়ে গেছে আর কোনও খোঁজ নেই। তিনি নাকি সেই বান্ধবীর বাড়ি খোঁজ নিয়ে দেখেছেন সেখানে ও যায়নি। আর তেমন কোনও বন্ধুর বাসা চেনেনও না! আমাকে উনি অনুরোধ করলেন আমি যেন একটু খুঁজে দেখি। সেই সাথে বারবার উনি লজ্জিত একথাও বললেন। অবশেষে আমার দু'হাত ধরে বললেন, 'বাবা, কথাটা অন্য কাউকে বোলো না যেন।'

আমি বর্ষাতিটা নিয়ে বের হলাম।

পাঁচ

আমার একটু শীত শীত লাগছে। বর্ষাতি ভেদ করে কেমন করে যেন পানি ঢুকে গেছে। হালকা কাঁপুনি লাগছে। বৃষ্টি অনেকখানি কমে গেছে। বাতাসও কমে গেছে অনেক। অন্তত আমাকে উড়িয়ে নেওয়ার মত জোর নেই। এখনও থেকে থেকে বিজলি চমকাচ্ছে। আমি টগরের বাড়ির একবারে কাছাকাছি চলে এসেছি। একটা বড়সড় বাগানের মধ্যে দিয়ে ওদের বাড়ি যেতে হয়। আমি এখন বাগানটায় আছি। চারপাশে বড় বড় মেহগনি গাছ। মাঝে মধ্যে দু'একটা ছোট বাঁশঝাড় দেখা যায়। এর মধ্যে দিয়ে চলে গেছে ছোট্ট একটা পথ।

পানি জমে ক্ষুদ্র একটা নালায় রূপান্তরিত হয়েছে। আমি সেই নালার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। ছপছপ শব্দ হচ্ছে। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন কীসের সংকেত দিল। মুহূর্তের জন্যে অনুভব করলাম আমার পেছনে কেউ একজন আসছে। ঘাড়ের কাছে গরম নিঃশ্বাসও অনুভব করলাম। আমি ভূত প্রেত তেমন একটা ভয় পাই না। তবু টের পেলাম শিরদাঁড়া দিয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল। শীতটাও বেশিরকম জড়িয়ে ধরল—আষ্টেপৃষ্টে ধরা বলতে যা বুঝায়। শরীরে কাঁপুনি উঠে গেল। ভয়ের না শীতের বুঝতে পারলাম না। নিশ্চয়ই ভয়ের। আমি আসলে ভয় পেয়েছি। দারুণ ভয় পেয়েছি আমি! এমন সময় ক্ষীণ একটা শব্দ পেলাম—রিনিঝিনি শব্দ।

কিশোরী মেয়ে প্রথম চুড়ি পরলে যেমন ইচ্ছে করে শব্দ করে ঠিক তেমন শব্দ। বেশ মধুর। রিনিঝিনি শব্দ বেড়ে গেল। মনে হলো কেউ দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। সবদিকে খুঁজলাম। অন্ধকার কালো ছাড়া কিচ্ছু খুঁজে পেলাম না। এই অন্ধকারে যে কিছু পাওয়া যাবে না তা আমি জানি। কেন যে টর্চটা আনলাম না। হঠাৎ কড়া বেলি ফুলের সৌরভ নাকে ধাক্কা মারল। নেশা ধরানো সৌরভ। গন্ধটা ক্রমশ বাড়তেই লাগল ; সাথে রিনিঝিনি শব্দ। আমি চিৎকার করে উঠলাম–'কে? কে ওখানে?'

সব নিশ্চুপ হয়ে গেল। আবার হঠাৎ করে গন্ধটা নাকে লাগল। এবার আরও কড়া। চুড়ির রিনিঝিনি শব্দও বেড়ে গেল। আমার বুকের মাঝেও ঢাক বাজছে। আমি আবারও চিৎকার করলাম, 'কে?'

মিষ্টি একটা কণ্ঠ শুনলাম। আমার বহু প্রতীক্ষিত কণ্ঠে তিয়ানা বলল, 'আমি তিয়ানা। এমন চিৎকার কেন করলে?' নিমেষেই আমার সমস্ত ভয় চলে গেল। আমি বললাম, 'তুমি এত রাতে একা জঙ্গলে কী করছ? আর টগর কোথায়? ও কি তোমার সাথে আছে?'

তিয়ানা বলল, 'টগর ঘরে আছে। আর আমি তো জঙ্গলে না, আমিও ঘরে আছি। তা তুমি এটাকে জঙ্গল বলছ কেন? এটা তো বাগান।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তা ঠিক। কিন্তু তুমি ঘরে আছ মানে! কী বলছ এসব?' আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি। 'তিয়ানা, তুমি কোথায়? আমি তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।'

'এই তো আমি।' বলে তিয়ানা আমার হাতটা ধরল। আমার মনে হলো এটা তিয়ানার হাত না। কোমল এক টুকরো বরফ আমার হাতটা চেপে ধরেছে। আমার সারা শরীর মুহূর্তের জন্যে কেঁপে উঠল। আমি তিয়ানাকে বললাম, 'তোমার হাত এত ঠাণ্ডা কেন? চলো, ঘরে যাই।' আমি তিয়ানার হাত ধরে টগরের ঘরের দিকে হাঁটা দিলাম।

তিয়ানা বলে উঠল, 'চলো যাই। আমি এখন বাথরুমে পড়ে আছি তো তাই আমার হাত এত ঠাণ্ডা।'

আমি আবারও অবাক হলাম। 'কীসব বলছ তুমি! তুমি বাথরুমে পড়ে আছ মানে? কেন ঠাট্টা করছ? আমি এমন ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে

তোমার কাছে আসলাম আর তুমি ঠাট্টা করছ!'

'না, না। ঠাট্টা কেন করব? আচ্ছা বাদ দাও। পরে বুঝতে পারবে। দাঁড়াও তো, নিষাদ। আমায় একটা কাজ করে দিতে পারবে?'

'কী কাজ?' আমি প্রশ্ন করি।

'আমায় ওখানটা থেকে কতগুলো বেলি ফুল এনে দিতে পারবে?' এবার তিয়ানায় কণ্ঠে অনুরোধ ঝরে পড়ে।

'কোথা থেকে?' আমি আবারও প্রশ্ন করি।

'ওই তো ওইখান থেকে।' বলে আমার হাত ধরে তিয়ানা টান দিল। অন্ধকারে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। তিয়ানা আবার বলে উঠল, 'তোমার মনে নেই তুমি এখানে কতগুলো বেলি ফুল গাছ লাগিয়েছিলে!' এমন ভাবে কথাগুলো বলল যেন মনে না থাকাটা কী আশ্চর্যের কথা! অথচ আশ্চর্য হলাম আমি। এই বাগানে কোথাও বেলি ফুল গাছ কখনও লাগিয়েছি বলে মনে পড়ে না।

আমি তিয়ানার সাথে হাঁটছি। চুড়ির রিনিঝিনি শব্দ হচ্ছে। হঠাৎ টের পেলাম তিয়ানার হাতটা গরম হতে শুরু করল। ধীরে ধীরে অসহ্য গরম হয়ে উঠল ওটা। আমি তিয়ানাকে বললাম, 'তিয়ানা, হাত ছাড়ো। তোমার হাত এত্ত গরম কেন?'

তিয়ানা খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, 'আমাকে এখন রান্না করছে তো। তাই এত্ত গরম লাগছে।'

এমন সময় বিজলি চমকাল। প্রথমেই লক্ষ করলাম আমি টগরের বাড়ির পিছনদিকটায় চলে এসেছি। ওই তো একটু সামনেই টগরের ঘর। কিন্তু তিয়ানা কই! অথচ এখনও টের পাচ্ছি ওর অস্তিত্ব। আমার হাতটা এখনও ধরে আছে। আমি হাতটা এক ঝটকায় ছাড়িয়ে টগরের ঘরের দিকে দৌড় দিলাম। দৌড়াচ্ছি আর শুনতে পাচ্ছি তিয়ানার হাসি। এখন আর মিষ্টি খিলখিল হাসি নয়, খ্যানখ্যানে হাসি হাসছে তিয়ানা।

ছয়

আমি অন্ধকারে কেমন করে টগরের ঘরে ছুটে এলাম জানি না। এসে দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগলাম। দমাদম কিল-ঘুষি মারছি। হঠাৎ টগরের গলা শুনলাম–'দরজা খোলা আছে।'

আমার বুক হাপরের মত ওঠানামা করছে। শরীরের জোর প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। দরজায় সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠেলা দিলাম। অবাক ব্যাপার, দরজা খুলছে না। আরও জোরে ঠেলা দিলাম। সামান্যও নড়ল না। আমার বুকের কাঁপুনি শতগুণ বেড়ে গেল। দরজা খুলছে না কেন! আমি আবারও দরজা ধাক্কানো শুরু করলাম।

টগর উঠে এসে দরজা খুলে দিল। আমি যে কী পরিমাণ ভয় পেয়েছি বুঝতে পারলাম। টগরদের বাড়ি যে মিস্ত্রী বানিয়েছে হারামজাদা ভুলে দরজা উল্টো করে লাগিয়েছে। ওদের দরজা বাইরে থেকে টেনে খুলতে হয়, অথচ আমি গাধার মত গায়ের জোরে ঠেলেছি। প্রচণ্ড ভয়ে সব ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। কোনও মতে ঘরে ঢুকে বেহুঁশ হয়ে গেলাম।

কতক্ষণ পরে চোখ মেললাম জানি না। তবে বৃষ্টি একেবারে থেমে গেছে বুঝতে পারলাম। টগরদের ঘরটা টিনশেড বিল্ডিং–সহজেই বোঝা যায়। বাতাসও পড়ে গেছে। আমার ভয়টাও অনেকখানি কমে গেছে টের পেলাম। চোখ খুলেই টগরের হাসিমুখ দেখলাম। সুদর্শন মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। টগর এই কদিনে অনেকখানি সুন্দর হয়েছে। স্বাস্থ্যটাও আরও ভাল হয়েছে। আমি সব ভয় নিমেষের মধ্যে ভুলে গেলাম। মুহূর্তের জন্যে টগরের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করলাম। হঠাৎ আমার তিয়ানার কথা মনে পড়ল। আমি উঠে বসতে বসতে বললাম, 'তিয়ানা কোথায়?'

টগর আমার কাপড় পাল্টে দিয়েছে। ভেজা কাপড় বদলে ওর কাপড় পরিয়ে দিয়েছে। আমি এখন ওর বিছানায় বসা। কাপড়টা

আক্ষরিক অর্থেই আমার গায়ে ঢিলে হয়েছে। আমি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলাম, 'তিয়ানা কই?'

টগর বলল, 'বলছি। তার আগে বল তুই বেঁহুশ হয়ে গেলি কেন?'

আমি বললাম, 'ওটা পরেও শোনা যাবে। তুই বল তিয়ানা কই?'

টগর নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, 'তিয়ানা এখানে আসেনি।' আমি বিছানা থেকে উঠতে উঠতে বললাম, 'তা হলে চল তিয়ানাকে খুঁজে বের করি। ও আজ সারাদিন বাসায় নেই।'

টগর আমাকে ধরে বিছানায় বসিয়ে বলল, 'তিয়ানার কথা বাদ দে। আমি তোর জন্য আজ ওষুধের ব্যবস্থা করেছি। আজ থেকে তোর ট্রিটমেন্ট শুরু।'

আমি বললাম, 'ট্রিটমেন্ট পরে করলেও চলবে। আগে চল তিয়ানাকে খুঁজি।'

টগর বলল, 'তিয়ানাকে পরেও খোঁজা যাবে। তার আগে তুই এটা পড়–বলে একটা ছেঁড়া কাগজ আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। এটা পড়লেই বুঝবি তিয়ানা কোথায় আছে।'

আমি হাত বাড়িয়ে কাগজখানা নিলাম। পুরানো কোনও বই থেকে ছিঁড়ে নেওয়া। সম্পূর্ণ ইংরেজিতে লেখা কথাগুলোর মানে করলে এমনই দাঁড়ায়–

'আপনি কি মোটা, স্বাস্থ্যবান হতে চান? আপনার কি অন্যকে দেখে ঈর্ষা হয়? তবে ভাল করে পরবর্তী তথ্যটুকু পড়ুন। তা হলেই আপনি পৌঁছুতে পারবেন আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। কাউকে ঈর্ষা করতে ইচ্ছে হবে না আপনার; বরং আপনাকেই ঈর্ষা করবে সবাই।

অ্যাজটেকদের প্রধান সবজি-আমিষ ছিল ভুট্টা ও সিম। অথচ তা মোটেও পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না। পর্যাপ্ত চাষাবাদের অভাবে সাধারণ জনগণ তা খেতে পারত না। দেখা যেত যে চাষ করত তার ঘরেই প্রোটিন-স্বল্পতায় ভুগছে বাচ্চা-বুড়োরা। অথচ ভুট্টা আর সিম ছাড়া তেমন কোন প্রোটিনের উৎসও ছিল না। তবু ধনীরা বাইরে থেকে আমদানী করে তাদের ঘাটতি ঠিকই পূরণ করত।

(এবারের লাইনগুলো লাল কালি দিয়ে আণ্ডার লাইন করা)

অ্যাজটেক সভ্যতার অধিবাসীরা তাদের দেবতাদের উদ্দেশে প্রায় এক শতাংশ মানুষকে উৎসর্গ করত। এর সংখ্যা আড়াই লাখের মত ছিল। ওইসব মৃত মানুষের মাংস খাওয়ানো হত অ্যাজটেকদের সাধারণ মানুষদের আমিষের ঘাটতি পূরণের জন্যে। অবশ্য সাধারণ মানুষ মানেই গরীব মানুষ। অথচ দেখা যেত ধনীদের তুলনায় গরীবদের দেহ বেশি রকম সুঠাম।

আমার ব্যক্তিগত ধারণা তারা দেবতাদের উদ্দেশে মানুষ উৎসর্গ করত মূলত তাদের প্রোটিনের অভাব পূরণের জন্যে। এই জন্যেই হয়তোবা তাদের কল্পিত এত দেবতা ছিল। ব্র্যাকেটে লেখা–পাঠক, আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি মানুষের মাংসের স্বাদ কিছুটা মিষ্টি। এটা পরীক্ষিত সত্য। আপনাদের জন্যে একটা সুস্বাদু রেসিপি দেওয়া হলো...'

এখানে পৃষ্ঠাটা ছেঁড়া।

আমার সারা শরীর ঘেমে গেছে। বমি পাচ্ছে প্রচণ্ডভাবে। বহু কষ্টে বমি চেপে রাখলাম। কোনও এক মানসিক রোগী ফিচারটা লিখেছে। টগরও যে একজন মানসিক রোগী সে ব্যাপারে আমার কোনও সন্দেহ নেই।

সাত

আমি কাগজটা হাতে নিয়ে থ মেরে বসে আছি। বলার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। আমার প্রচণ্ড কান্না পাচ্ছে। তিয়ানার কী পরিণতি হয়েছে এখন বুঝতে পারছি।

টগরই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করল–'তোর নিশ্চয়ই বমি পাচ্ছে। আমাকেও নিশ্চয়ই তোর 'মেণ্টালি সিক' মনে হচ্ছে। ওটা কোনও ব্যাপার না। ওষুধে অরুচি অনেকেরই থাকে। এখনও অনেককে পাওয়া যাবে যাদের ওষুধের নাম শুনলেই বমি পায়। আর মন-টনের ব্যাপার বাদ দে। তুই স্রেফ ওষুধ হিসেবে খেয়ে নিবি।'

আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, 'তিয়ানা কোথায়?' টগর যেন প্রশ্নটা শোনেনি এমন ভঙ্গিতে বলতে লাগল, 'তুই তো জানিস আমি অনেক বই-টই পড়ি। শরীর মোটা করার জন্যে অনেক কিছু করেছি। কিছুতেই কিচ্ছু হয়নি। তার উপরে মিথিলার কাছে অপমানিত হয়ে জেদটা অনেক বেড়ে গেল। এমন সময় কোনও এক পুরানো বইয়ের দোকান থেকে বই কিনেছিলাম। একটা বইয়ের মাঝে খুঁজে পাই পৃষ্ঠাটা। ওটা আসলে ঈশ্বর পাইয়ে দিয়েছেন আমাকে। এরপরের ঘটনা নিশ্চয়ই বলা বাহুল্য।'

আমি প্রচণ্ড কষ্টে ঘৃণা আর রাগ লুকাই। থেমে থেমে বলি, 'তা হলে এতদিন যেসব লোক হারিয়েছে সবাইকে আসলে তুই খুন করেছিস।'

টগর নির্দ্বিধায় স্বীকার করে-'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'আর তিয়ানা?' এবার ঘৃণা ফুটে ওঠে আমার কথায়।

'আমি জানি তুই তিয়ানাকে পছন্দ করতি। তাই তোর জন্যে আজ ওকেই উৎসর্গ করলাম।'

টগর কত সহজভাবে বলে যাচ্ছে কথাগুলো।... 'মেয়েদের মাংসে স্বাদ অনেক বেশি। বেশ মিষ্টি লাগে খেতে। পুরো শরীরে চর্বি থৈ থৈ করে। তোর জন্যে স্পেশালভাবে রান্না করেছি। অনেকক্ষণ ধরে বাথটাবে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। তুই বোধহয় জানিস না, আমি একটা বাথটাব কিনেছি। মাংস ধুতে সুবিধা হয়। তোর জন্যে আলাদা করে স্তন আর উরুর মাংস ভেজেছি। চমৎকার লাগবে খেতে। তুই যখন দরজা ধাক্কাচ্ছিলি তখন রান্না করছিলাম। এসেই তো বেহুঁশ হয়ে পড়লি। কী হলো তাও বললি না। হুঁশ আসতে আসতে অবশ্য রান্না কমপ্লিট। খাবার সাজিয়ে রেখেছি।'

কী নির্দ্বিধায় টগর বলল কথাগুলো, কত সহজ করে! আমি অবশ্য একটা কঠিন সিদ্ধান্ত খুব সহজে নিয়ে নিলাম। আমি টগরকে খুন করব। ধারালো কোনও অস্ত্র খুঁজছি।

টগর বোধহয় আগের কথার খেই ধরেই বলতে লাগল, 'ও! তোকে তো বলাই হয়নি। মানুষের মাংস খেলে আর একটা সুবিধা আছে। ওই লেখক ভদ্রলোক কথাটা লেখেননি। আবার হয়তোবা কথাগুলো

লিখেছেন কিন্তু অন্য কোনও পৃষ্ঠায় রয়ে গেছে। মানুষের মাংস খেলে আসলে মানুষের মনের কথা সহজেই বোঝা যায়। তোকে শেষ একটা কথা বলি, তিয়ানা আসলে আমার থেকেও তোকে বেশি ভালবাসত।'

আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম, টগর ওর চেয়ারের পেছন হতে বের করে আনল বড় একটা রামদা।

আমার চোখ চলে গেল আমার ডানহাতে। বড় একটা ফোস্কা পড়েছে হাতে।

•

পরিশিষ্ট

টগর খেতে বসেছে। সে ধীরে সুস্থে খাচ্ছে। আজ সারাদিন অনেক ধকল গেছে। এখনও বিদ্যুৎ আসেনি। অথচ ফ্রিজটা মাংসে ভর্তি হয়ে আছে। মাংগুলো পচে না যায়। তার কিছুটা ঘুমঘুম আসছে।

টগরের খেতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। দু'জনের খাবার একা খেতে হচ্ছে–কষ্ট তো হবেই।

রাসেল আহমেদ

ডাইনীর কুশপুত্তলিকা

'হ্যালো, রজার বলছি, পাণ্ডা সেভেন, শুনতে পাচ্ছ? ওভার।' ওয়াকিটকিতে যান্ত্রিক আওয়াজ ভেসে এল।

উত্তর দিল পাণ্ডা সেভেন, 'হ্যাঁ, রজার, শুনতে পাচ্ছি, বলে যাও, ওভার।'

'শোন, পাণ্ডা সেভেন, তুমি একবার ওক কটেজে যেতে পারবে? ওই কটেজের বাসিন্দার অভিযোগ কয়েকজন ছেলে নাকি তার বিরক্তির কারণ হয়ে উঠছে, ওভার।'

'ও.কে. রজার, আমি সেখানে যাচ্ছি, ওভার এণ্ড আউট।'

ওয়াকিটকিটা কোমরে গুঁজে রেখে, মোটর বাইকে চেপে বসল সার্জেন্ট ওয়ালস ওরফে পাণ্ডা সেভেন। 'ওক কটেজ', মনে মনে আওড়াল ওয়ালস, হলফেয়ার লেনে, জায়গাটা তার ভালই চেনা আছে।

শহরতলী এলাকায় অতীতের কয়েকটা খামার বাড়ির অবশিষ্ট ধ্বংসাবশেষের আশপাশে অবস্থান ওক কটেজের। রাস্তা দিয়ে বাইক চালাতে গিয়ে ওয়ালস দেখল, বাচ্চা ছেলেরা কাঠ সংগ্রহে ব্যস্ত। তারা জঙ্গল থেকে কাঠ চুরি করছে আর ধ্বংসাবশেষ থেকেও ভাঙাচোরা কার্ডবোর্ড, বাক্স সংগ্রহ করছে। তারপর সেগুলো মাঠে জড় করে স্তূপ করে রাখছে। তখনি তার মনে পড়ল, ডাইনির কুশপুত্তলিকা পোড়ানো উৎসবের রাত আসন্ন।

অবশেষে হলফেয়ার লেনে এসে হাজির হলো ওয়ালস, তারপর ওক কটেজের সামনে এসে বাইক থামাল। কাঠের গেট ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করেই তার মনে হলো, যেন অন্য এক জগতে প্রবেশ করেছে সে। সামনের লনের ঘাসগুলো অনেক বড় হয়ে উঠেছে। রাস্তার চলমান গাড়ির হর্ন, যান্ত্রিক আওয়াজ মনে হচ্ছিল যেন অনেক দূর থেকে ভেসে

আসছে। শান্ত ভাবে পাথর বিছানো পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে দরজায় নক করল সার্জেন্ট। এক মুহূর্তের নীরবতা, তারপরেই বাড়ির ভেতর থেকে একটা বিক্ষিপ্ত আওয়াজ ভেসে এল। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলে দরজা খুলে গেল। আর দরজার ওপাশে দৃষ্টি পড়তেই ওয়ালসের প্রথম যে ধারণা হলো তা হলো, একজন ডাইনী দাঁড়িয়ে রয়েছে তার সামনে। কালো পোশাক পরা বয়স্কা মহিলা, নুয়ে পড়া শীর্ণ একটা দেহ, মুখে অজস্র বলিরেখা, সব মিলিয়ে যেন সেই ছোট্ট বেলার ছবির বইতে দেখা রূপকথা কাহিনির অবিকল জীবন্ত ডাইনীর প্রতিরূপ।

'ওহ, অফিসার আপনি? ভেতরে আসুন প্লিজ।' বয়সের ভারে জড়ানো এবং ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে বলল মহিলা।

'ধন্যবাদ।' বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল সার্জেন্ট ওয়ালস।

'আপনি যে এত তাড়াতাড়ি এখানে আসতে পেরেছেন সেজন্য আমি খুশি,' স্যাঁতস্যাঁতে প্যাসেজ পেরিয়ে বাড়ির পিছন দিকের একটা ঘরে ওয়ালসকে বসতে দিল বয়স্কা মহিলাটি। 'হয়তো আপনি তাদের বোঝাতে পারবেন।'

'কাদের বোঝানোর কথা বলছেন?' প্রশ্ন করল সার্জেন্ট ওয়ালস।

'বাচ্চাদের,' উত্তরে বলল মহিলা, 'ওহ হো, আপনাকে তো পুরো বিষয়টি বলা হয়নি। আসল ব্যাপারটা হলো, স্থানীয় ছেলেরা সবাই আমার বাড়ির পেছনের বনে জড় হয়েছে। তারা প্রায়ই এখানে আসে। আর তারা সেখানে খেলাধুলা করলে আমি কিছুই মনে করি না, কিন্তু কুশপুত্তলিকা পোড়ানো রাত আগত প্রায়, তাই বহ্ন্যুৎসবের জন্য জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে শুরু করে দিয়েছে তারা।'

'তারমানে তারা বনের গাছগুলো ধ্বংস করছে?' জিজ্ঞাসা করল ওয়ালস।

মাথা নেড়ে সায় দিল বয়স্কা মহিলা। তারপর বলল, 'আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনলে ওদের কলরব এখান থেকে শুনতে পাবেন। ওরা এখন জঙ্গলে গিয়ে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহে ব্যস্ত। তবে সেটা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না, যত পারুক কাঠ কেটে নিয়ে যাক, কিন্তু ওদের ওই বহ্ন্যুৎসব খুবই বিপজ্জনক। যদি সেই আগুনে ছেলেদের কোন ক্ষতি

হয়, আমি তা হলে কখনও নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।'

'তারমানে আপনি আমাকে, ওদের নিরুৎসাহিত করতে বলছেন।' ওয়ালস বলল।

'আপনি যদি কিছু মনে না করেন,' উত্তরে বলল মহিলা, 'আমি তা হলে খুবই কৃতজ্ঞ হব।'

'আচ্ছা, বাড়ির পেছন দিক দিয়ে বেরোনোর কোন রাস্তা আছে?' জিজ্ঞাসা করল ওয়ালস।

বয়স্কা মহিলাটি তখন তাকে পথ দেখিয়ে রান্নাঘরে নিয়ে গেল এবং পেছনের দরজা খুলে দিল। ফুলে ভরা বাগানের মাঝ দিয়ে অরণ্যের পথে এগিয়ে যেতে লাগল ওয়ালস। বাচ্চাদের হৈ চৈয়ের শব্দ তার কানে ভেসে এল এবং শব্দটা ক্রমশ বাড়তে লাগল।

তাদের দলে ছিল পাঁচজন, সবাই বাচ্চা; বয়স এগারোর মধ্যে হবে, তার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল। ষষ্ঠ ছেলেটা এক টুকরো কাঠ বয়ে আনছিল, আর তারা সেই দৃশ্যটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিল।

'কী হচ্ছে এখানে?' চিৎকার করে উঠল ওয়ালস, 'তোমরা এসব কী করছ?'

ছেলেরা তাকে দেখা মাত্র স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর তাদের মধ্য থেকে একটি ছেলে বলে উঠল, 'দেখুন, মিস্টার, আমরা স্রেফ কিছু কাঠ সংগ্রহ করছি।'

ওয়ালস বলল, 'তোমরা কি জানো, তোমরা এখানে অনধিকার প্রবেশ করেছ?' বলেই বুঝল তার একথা ছেলেরা মোটেই পাত্তা দেবে না। অনধিকার প্রবেশ করলে যে আইন ভঙ্গ হয়, এনিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মনে করে না তারা। এমনকী ওয়ালস যদি তাদের গোলাবাড়ির ভাঙাচোরা বিপজ্জনক অবস্থার কথা বলে, তা হলেও তারা বোধহয় বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করবে না। সে তখন ভাবছিল, কীভাবে ছেলেদের ভয় পাওয়ানো যায়।

হঠাৎ তার মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। তবে ছেলেরা সেটা বিশ্বাস করবে কিনা, এব্যাপারে তার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আজকাল

ছেলেরা তাদের বয়সের তুলনায় অনেক বেশি পাকা।

'আমি যদি তোমাদের জায়গায় হতাম, তা হলে এখানে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে আসতাম না,' এই বলে সে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল।

এবার তার কথায় কাজ হলো। ছেলেরা আগ্রহ সহকারে তার দিকে তাকাল।

'কেন আসতেন না?' আগের সেই ছেলেটা প্রশ্ন করল।

'ওই বয়স্কা মহিলাটির জন্য,' বাড়িটির দিকে মাথা ঝাঁকাল ওয়ালস, 'তোমরা জান সে কে? নিশ্চয়ই জান না? সে একটা ডাইনী।' ছেলেদের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করল। মনে মনে সন্তুষ্ট হলো সে। 'সে চায় না তার বাগানে কেউ আসুক। একথা বলার জন্য আমি এখানে এসেছি। সে বলেছে, তোমরা যদি কেউ এখানে আস...' একটু থেমে নাটকীয় ভঙ্গিতে নিচু স্বরে বলল, 'কে জানে কী ঘটতে পারে এখানে।'

'কিন্তু ওর মধ্যে তো ডাইনীর ভাবভঙ্গি দেখা যায় না।' একটা ছেলে মন্তব্য করল।

'অফিসার ঠিকই বলেছে, সে একটা ডাইনী। আমার ভাই বলেছিল এই অঞ্চলে একটা ডাইনী আছে।' আরেকটি ছেলে বলে উঠল, 'আচ্ছা, আপনারা তাকে গ্রেফতার করতে পারেন না? সে ডাইনী এই অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করেন।'

'আমি কীভাবে তাকে গ্রেফতার করতে পারি বলো?' ওয়ালস নিজের অপারগতা প্রকাশ করে, 'তাকে গ্রেফতার করতে গেলে, দেখা যাবে সে হয়তো আমার বাইকটাকে ব্যাঙ আর আমার পিস্তলটাকে মাকড়সা বানিয়ে ফেলেছে।'

'ওকে দেখে আর ওর বাড়ির পেছনে ঝাড়ু ঝোলানো দেখে আমি আগেই বলেছিলাম, ও ডাইনী না হয়ে যায় না।' সেই ছেলেটি বলল, 'আমার ভাইয়ের ডাইনী সম্পর্কে অনেক বই আছে, সেখানে আমিও দেখেছি। আর তার কাছ থেকে ডাইনী বিষয়ে অনেক কিছু আমি জেনেছি। চল সবাই, আমাদের এখানে থেকে কেটে পড়াই ভাল হবে।'

নিজের মনে হাসছে সার্জেন্ট। এবার সে মহিলার বাড়ির দিকে

এগিয়ে চলল।

'ওরা চলে গেছে?' মহিলা জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ, চলে গেছে,' উত্তরে বলল ওয়ালস, 'এবং আমার মনে হয় না ওরা আবার আসবে।'

'অনেক ধন্যবাদ,' বলল মহিলা, 'চা আর কেক খাবেন?'

'খাওয়া যেতে পারে,' ওয়ালস রাজী হলো।

আধঘণ্টা পর সেই বাড়ি ছেড়ে চলে এল ওয়ালস। চা আর কেক খাওয়ার পর আসার সময় তাকে কথা দিয়ে এল ওয়ালস, আবারও ছেলেগুলো আসে কি না সে ব্যাপারে সে খোঁজখবর রাখবে। ছেলেগুলো যাতে আর না আসে, তার জন্য তাদের সাথে কী রকম ছলচাতুরী করতে হয়েছে, সে কথা শুনলে মহিলার মনে কেমন প্রতিক্রিয়া হতে পারে, এসব ভেবে নিজের মনে খানিকটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল ওয়ালস।

৫ নভেম্বর অপরাহ্নের শিফট-এ সার্জেণ্ট ওয়ালসকে তার কাজে প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকতে দেখা গেল। রাত এগারোটার সময় তাকে অত্যন্ত ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। চার চারটে বহ্ন্যুৎসব কোন রকম অঘটন ছাড়া সামাল দেয়াটা সহজ ব্যাপার নয়। তারপর ফায়ার ব্রিগেড এসে আগুনগুলো নিভিয়ে ফেলে। তবে এসব আগুন ভয়ংকর রকমের ভীতির সঞ্চার করেছিল কাছাকাছি বাড়ির বাসিন্দাদের মনে। আর জনগণেরও প্রচুর অভিযোগ শুনতে হয় তাকে।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ওয়ালস তার বাইকের কাছে এসে হাজির হলো।

'পাণ্ডা সেভেন!' ওয়াকিটকিতে যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'বলে যাও,' উত্তর দিল ওয়ালস।

'তুমি একবার ওক কটেজে যেতে পার? একটা ভুতুড়ে টেলিফোন কল থেকে জানা যায় ওই এলাকায় গোলমাল দেখা দিয়েছে।'

'ও.কে. রজার, আমি সেখানে যাচ্ছি।' ওয়ালস বলল। ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে গেল ওয়ালস। তার আশঙ্কা সেই মহিলাটির কোন বিপদ হয়নি তো!

ফটকের বাইরে ওয়ালস তার বাইকটা রাখল। তারপর এক মুহূর্তের

জন্য কান পেতে রইল, কিছু শোনার জন্য। কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই শুনতে পেল না। কেবল কিছুদূর থেকে বহ্ন্যুৎসবে মেতে থাকা ছেলেদের হৈ চৈ-এর আওয়াজ ভেসে এল তার কানে।

ওক কটেজের লন পেরিয়ে এসে সদর দরজায় শব্দ করল সে। ভাবল হয়তো সেই মহিলা তার আগমন বার্তা পেয়ে গেছে এবং চায়ের পেয়ালা হাতে সে আহ্বান জানাবে ওয়ালসকে। কিন্তু কোন সাড়া এল না বাড়ির ভিতর থেকে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তারপর সে ঘুরে বাড়ির পিছন দিকে বাগানের পথ ধরে সেখানে গিয়ে হাজির হলো। পিছনের ঘরে আলো জ্বলছিল এবং দরজা খোলা থাকায়, সেই আলোয় সে দেখল বাগানের ঘাসগুলো কেমন যেন দোমড়ানো মোচড়ানো। সে তার টর্চের আলো ফেলতেই বাগানটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার মনে হলো যেন একদল বুনো জানোয়ার সাজানো বাগানটাকে তছনছ করে দিয়ে গেছে। আর সেই তাণ্ডবলীলা চলেছে বাগানের ঝোপঝাড় পর্যন্ত। সেই অস্বাভাবিক দৃশ্য অনুসরণ করে এক সময় ওয়ালস দেখল সে মাঠের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে। সেখানে তখনও বহ্ন্যুৎসব পুরোদমে চলছে এবং সেই আগুনে কয়েকটা কুশপুত্তলিকা জ্বলতে দেখল। আরও সামনের দিকে এগিয়ে চলল সে। এক সময় তার পায়ে কী যেন ঠেকল। টর্চের আলো ফেলতেই সে দেখল তার পায়ের কাছে হাতে তৈরি একটা কুশপুত্তলিকা পড়ে রয়েছে।

'ওরা ওটা পোড়াবে না?' একটা ছেলেকে দেখে তাকে প্রশ্ন করল ওয়ালস। ভাল করে লক্ষ করে দেখল সেই দিনের সেই দলেরই একটা ছেলে।

ছেলেটা উত্তর দিল, 'এর চেয়ে আরও ভাল একটা কুশপুত্তলিকা আমাদের আছে। ওই দেখুন–'

চোখ পিট পিট করে অদূরে বিরাট অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে একটা মানুষ আকারের মূর্তি জ্বলতে দেখল ওয়ালস। সেই প্রচণ্ড আগুনের মধ্যে মূর্তিটা যেন নড়াচড়া করছিল। একটা সম্ভাবনার কথা মনে হতেই হাত-পা অবশ হয়ে এল ওয়ালসের। হ্যাঁ, ঠিক তাই ঘটেছে। সেই আগুনের খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। কাঁপা কাঁপা আগুনের ধোঁয়ায় কুশপুত্তলিকা

কেঁপে ওঠার মত দৃশ্য এটা নয়। এ যেন কোন জীবন্ত মানুষের ছটফটানি, আগুনে দগ্ধ হয়ে সে যেন নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে দাপাদাপি করছে।

হঠাৎ নিজেকে ভীষণ অসুস্থ মনে হলো ওয়ালসের, বমি হওয়ার উপক্রম হলো তার। কুৎসিত কিন্তু ভালমনের মহিলাটির জন্য বুকের মধ্যে ভয়ানক কষ্ট অনুভব করল সে। তার দম বন্ধ হয়ে এল। জ্ঞান না হারানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল সে। ঠিক সেই মুহূর্তে, আগুনের হিস্ হিস্ শব্দ ছাপিয়ে ছেলেগুলোর সম্মিলিত চিৎকার তার কানে এল, 'আমরা সত্যিকার ডাইনীকে পুড়িয়ে মেরেছি।'

মূলঃ সেন্ট জনবার্ড

অনুবাদঃ শাহনেওয়াজ খান

পরাজয়

এত্ত গরম বাপের জন্মেও দেখেনি সে। দেখেছে কী ? না! ষাট বছরের স্মৃতি হাতড়েও বলতে পারে না আওলা বুড়ি। বাঁ হাতের চেটোয় কপাল বেয়ে পড়া ঘামের স্রোতের তরতর গতিকে মুছে নিয়ে নিজের চলার গতি বাড়ানোর চেষ্টা করে বুড়ি। আজ চেয়ারম্যান বাড়িতে ভোজ আছে। আওলা বুড়ির বরাবরের মত দাওয়াত সেখানে। সহজ-সরল আর একাকীত্ব ভুলে থাকা স্বামী সন্তানহীন এই মুখরা বৃদ্ধাকে গ্রামের লোকেরা আওলা বুড়ি বলে ডাকে। সে নাকি সারাক্ষণ আওলা আওলা কথা বলে। কিছু হলেই অযথা চিৎকার চেঁচামেচি করে। আওলা-ঝাওলা তার কাজকর্মও। কথা নেই, বার্তা নেই একদিন হঠাৎ হয়তো তাকে দেখা যাবে মাঝ পুকুরে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে আছে। আর বলছে–মৃত স্বামীর সাথে কথা বলছে!

আজ গরম বড়ই কাবু করেছে তাকে। চলার গতি মন্থর হয়ে আসে। আর না পেরে সে কাঁঠাল গাছের নীচে বসে পড়ে। বয়সী ফুসফুসে ফোঁস ফোঁস করে আসা যাওয়া করে গ্রীষ্মের তপ্ত হাওয়া। জিরোতে জিরোতে কেমন যেন ঝিমুনি এসে পড়েছিল আওলা বুড়ির। হঠাৎ ঝিমুনি ছুটে যায় তার। হতভম্বের মত সামনে তাকিয়ে থাকে। জোরে একটা চিৎকার দিতে গিয়েও থেমে যায়। শ্যামা ঘোষালের মেয়ে অরুণা হেঁটে যাচ্ছে তার সামনে দিয়ে! যেতে যেতে সামনের কাঁঠাল গাছের সারির ভেতর দিয়ে কোথায় লুকাল আল্লাহ মালুম। 'লা ইলাহা ইল্লা আনতা...' বুড়ি কাঁপতে কাঁপতে দৌড় দেয় অরুণার ভূত তার ঘাড় মটকানোর আগেই!

ঘরের দাওয়ায় বসে আছে সালমা। বয়স বারো কি তেরো। বয়সের

মতই কচি তার মুখখানা। পরনে নোংরা ফ্রক। তার আবার জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। তার ছেঁড়া কপালের মত বোধকরি ওগুলোও জোড়া লাগার নয়।

সালমা বসে বসে তার মনিবের তৈরি হওয়া একদৃষ্টিতে দেখে। দেখে আর ভাবে। এই কী গতকাল...

শরীরের নীচের দিকের যন্ত্রণা কমছে না। খানিক পর পর কুঁকড়ে ওঠে। যন্ত্রণা নিয়ে বসে বসে দেখে–চাকর এসে চকচকে পালিশ করা জুতো রেখে যায়। মনিবের স্ত্রী সাজানো পানের খিলি তুলে ধরে স্বামীর সামনে। বউয়ের কাছ থেকে নেয়া পান মুখে দিয়ে আদেশ করে চেয়ারম্যান–

'মেহমান যারা আইব তাদের য্যান কোন অসম্মান না হয় সে দায়িত্ব তোমার। কালুরেও কইয়া দিছি। হে তোমার লগে লগে থাকব।'

'আপনে সালিশ থেইক্যা তাড়াতাড়ি ফির্যা আইসেন। মেহমান আমি একা সামলামু কেমনে? বাবলুরে দেখভাল করতে হইব না?'

তাই তো? স্ত্রী মন্দ কথা বলেনি। মুসলমানি করানোর পর থেকেই ছেলেটা খানিক পরপর যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। অবশ্য আজ কালের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। একা মেহমান সামলাতে তার সত্যি কষ্ট হবে। ছোট ভাই আর তার বউ সব শহরে গেছে। তারা থাকলেও না হয় একটা কথা ছিল।

'হুম...ঠিক আছে। চিন্তা কইরো না। সালিসে বেশি সময় নিমু না। তুমি থাকো, গেলাম।'

চেয়ারম্যান বাইরে বেরুনোর জন্য পা বাড়াতেই ধাক্কা লাগে দাওয়ায় জড় পুতুলের মত বসে থাকা সালমার গায়ে।

খেঁকিয়ে উঠে চেয়ারম্যান–'ওই হারামজাদি! সইরে বসবার পারস না? বেহাইন বেলায় এই বজ্জাতির মুখ দেখলে আর কিছু করন লাগব না।' রাগে গজ গজ করতে থাকে চেয়ারম্যান।

অবশ্য বেশিক্ষণ তাকে চেঁচাতে হলো না। তার চেঁচামেচি ঢাকা পড়ে যায় আরেকজনের চিৎকারে। আওলা বুড়ি হেঁড়ে গলায় চিল্লাতে চিল্লাতে উঠোনে ঢোকে। 'অরুণা আইছে গো...অরুণা আইছে!'

উঠোন ভর্তি কামলারা মুহূর্তের জন্য অচল হয়ে পড়ে। তাদের ভয়ার্ত গোঙানি পাক খেয়ে ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে।

'কী বলিস বুড়ি? অরুণা? হে তো মরছে তিন বছর আগে!'

'অরুণা? শ্যামা ঘোষালের মাইয়া?'

'সর্বনাশ ভূত না তো? হুনছি নিজে নিজে খুন হইয়া মরলে সেই আত্মা কবরে যায় না। আসমান জমিনের মাঝে আটকা পড়ে। ভূত হইয়া বাতাসে ভাইসা বেড়ায়। তারপর একলা কাউরে পাইলে তার ঘাড় মটকাইয়া...

'চোপ্! চোপ্ হারামজাদারা! আর একটা ফাউ কথা বলবি তো সবগুলারে বাড়ির বাইর কইরা দিম...'

রাগে আর কিছু বলতে পারে না চেয়ারম্যান। ছাতা হাতে ছাবের দাঁড়িয়েছিল পাশে। অতর্কিতে তার গালে ঠাস্ করে একটা চড় কষিয়ে দেয়। তারপর জলদ গম্ভীর স্বরে বলে–

'সালিসের দেরি হইয়া যাইতাছে। চল।'

চেয়ারম্যানের ধমক শুনে আর একটা কথাও বলে না কেউ। যে যার যার মত কাজে লেগে পড়ে। আওলা বুড়ি ভেতরে প্রস্থানরত চেয়ারম্যানের বউয়ের পাছ ধরে–'আম্মাগো! আমি একটুও মিছা কতা কইতাছি না, আম্মা। নিজের চউক্ষে অরুণারে দেখলাম। গাছের আড়ালে...'

আওলা বুড়ির প্যানপ্যানানি ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসে। দাওয়ায় বসে জড় কুণ্ডলী সালমা কেবল দেখতেই থাকে। জন্মানোর পর প্রকৃতি তাকে রূপ-সৌন্দর্যের মত অপ্রয়োজনীয় জিনিসটি দিলেও কেড়ে নিয়েছে চলন এবং বাক শক্তির মত প্রয়োজনীয় দুটি ক্ষমতা। জন্মেছেও খানিকটা মানসিক ভারসাম্যহীনতা নিয়ে। শুনতে তার কোন সমস্যা নেই। সবই সে শুনতে পায়।

মৃত বাবার অনুপস্থিতিতে মার কোলে বড় হচ্ছিল। এক সময় মা-ও আরেকজনের সাথে পালিয়ে যায়। যাওয়ার আগে রেখে যায় চেয়ারম্যান বাড়ির উঠোনে। সন্তানহীন চেয়ারম্যানের বাঁজা বউ ফেলতে পারে না এই অভাগা জীবটিকে। তারপর থেকেই সে বেড়ে উঠতে থাকে

...নেই। ওর জন্য বাড়ির পেছনে একটা কুঁড়ে তুলে দেওয়া হয়। এ বাড়িরই আরেক আশ্রিতা কুলসুম বানুর দেখভালে বড় হতে থাকে সে। তিন দিনের কালাজ্বরে কুলসুম বানুর ইহলীলা সাঙ্গ হলে তাকে একাই বড় হতে হয় তার ছোট্ট কুটিরে। গফুর নামের এক বৃদ্ধ কামলা তাকে রোজ খাট থেকে উঠিয়ে এনে চেয়ারম্যান বাড়ির দাওয়ায় বসিয়ে দেয়। আর রাত হলে খাটে শুইয়ে দিয়ে আসে। রাতে একা একা ভয় পায় বলে সে বাড়ির আরেক মহিলা শ্রমিক চেয়ারম্যান বউয়ের আদেশে মাঝে মাঝে থাকে। তবে বেশির ভাগ সময়েই–'সালমা, তুমি ঘুম পাড় দেহি, আমি একটু আসতেছি।' এই বলেই স্বামী সন্তানের কাছে চলে যায়।

চেয়ারম্যানের বউ ওর যত্নের ক্রটি রাখে না। তার ভয়ে কামলারাও তার দেখভাল করে। জীবন ইতিহাসের এ পাতাগুলো সালমার অ-পঠিতই রয়ে যায়। এসব কিছু সে জানে না। সে শুধু জানে খেতে আর ঘুমাতে। আর চেয়ে চেয়ে দেখতে...

সেদিন রাতে দাওয়ায় বসে কেবল দেখতেই থাকে–ওই তিরতির করে কাঁপতে থাকা ঘাসকে। পাতাকে। কক্ কক্ আওয়াজ তুলে দীপ্ত ভঙ্গিতে হেঁটে চলা রাজহাঁসকে। মাঝে মাঝে তার নিজেরও ওই প্রাণীটা হতে ইচ্ছে করে। ওরকম হলে অনেক কিছু পারা যায়। হেঁটে হেঁটে, ছুটে ছুটে খেলা করা যায়। ডানা মেলে রৌদ্রে বসে থাকা যায়। গোঁফওলা ওই লোকটা–রাতের আঁধারে সে এলে, তার হাত থেকে ডানা ঝটপটিয়ে উড়াল দেওয়া যায়। সালমার মুখটা হঠাৎ আতঙ্কে কুঁকড়ে যায়। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে গত রাতের দুঃসহ স্মৃতি।

এলোমেলো ঝড়ো বাতাস বইছিল কাল সন্ধ্যে থেকেই। ঝলমলে শাড়ি গহনা পরা সেই ভাল মহিলা অর্থাৎ চেয়ারম্যানের বউ তাড়াতাড়ি তাকে নিজ হাতে খাইয়ে দেয়। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে সে দেখে এই মহিলা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে এই কাজটা করে আসছে। সে কে? কেন করে? এ সমস্ত জাগতিক কথাবার্তা তার মত জড়পুত্তলির কাছে নিতান্তই অবান্তর। সে হাঁটতে পারে না, চলতে পারে না–আর সবার মত কথা বলতে পারে না–বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারগুলো তাকে সাময়িক উত্তেজিত করে কিন্তু চিন্তা-ভাবনার মত আজব জিনিসটা তার মাথায়

এলেও ওর সাথে সে ঠিক কুলিয়ে উঠতে পারে না। তার কিছুই করার নেই। প্রকৃতি তার কিছু করার শক্তি কেড়ে নিয়েছে।

খাওয়া শেষে মুখ মুছিয়ে গফুর চাচাকে ডাকে সে মহিলা। তার ঘরে পাঠিয়ে দিতে বলে। রোজকার মত গফুর চাচা তাকে কোলে করে কুঁড়ে ঘরে এনে খাটে শুইয়ে দিয়ে যায়। একা একা সে খাটে উঠতে পারে না। নাগালে আসে না।

ঝড়ো বাতাসের দাপট দেখে ভয় ভয় লাগছিল তার। যাওয়ার আগে চাচা দরজা জানালা লাগিয়ে দিয়ে যায়। প্রতিদিন তাই করে। আবার সকালবেলা খুলে তাকে বের করে উঠোনে নিয়ে যায়। খোঁয়াড়-বাস হলেও এতেই অভ্যস্ত সে।

খানিক পর পর আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। জানালার পাল্লা ঠাস্ করে খুলে গিয়ে খটাখট আওয়াজ তোলে। বৃষ্টির ছিটা আসে মশারির ভেতর। ভয় লাগে। ভীষণ ভয়। তসলিমা নামের যে মহিলা রাতে তার সাথে শোয় সে-ও কদিন ধরে আসছে না।

বিছানায় সিঁটিয়ে যেতে থাকে সালমা, আধো আলো আধো অন্ধকারে খেয়াল করে দরজাটাও হঠাৎ ঝড়ের দাপটে খুলে গেছে। শুধু তাই নয়, কে যেন ঢুকেছে ঘরে। চাচা নাকি? সালমা গোঁ গোঁ করে গোঙাতে থাকে। চাচাকে জানাতে চায় তার ভয় লাগছে। ঝড়ো-বাতাসে তার খুব ভয় করছে। চাচা যেন শুনল না। বিছানায় উঠে তার পাশে নিঃশব্দে শুয়ে পড়ে। গায়ে হাত বোলাতে থাকে অস্থির ভাবে। টান মেরে ফ্রক খুলে ফেলে। আর একবার বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে। তার আলোয় সালমা দেখতে পায় তার গায়ের ওপর চেপে বসা লোকটাকে, সে তার চাচা নয়। সালমা ভয় পেল। কিন্তু ডাকবে কাকে? ঝড়ের দাপট আর বিছানার নড়াচড়ার আওয়াজ পেরিয়ে ওর গোঙানি কার কানেই বা পৌঁছাবে? তারপরও সে প্রাণপণে চেঁচিয়ে ওঠে, চেঁচায় যন্ত্রণায়। তার সদ্যবিকশিত আনকোরা যৌবন এক ভীষণ ঝড়ের দাপটে দলিত-মথিত হতে থাকে। হঠাৎ প্রচণ্ড এক যন্ত্রণা অনুভব করে সালমা। ওর আর্তচিৎকার চাপা-গোঙানি হয়ে মিশে যায় ঝড়ের বাতাসে।

কক...ক...কক্... হাঁসগুলো চেঁচাতে চেঁচাতে ঘুরে বেড়ায়। ওদের

ডাক শুনে চমক ভাঙে সালমার। অবশ্য তাদের চেঁচানি থেকেও লোকজনের চেঁচানি আরও বেশি কানে লাগছে। কাজ করছে সবাই পুরোদমে। সালমা চেয়ে চেয়ে ওদের দেখে...কেবল দেখতেই থাকে...

'যাউক! ঠিক ঠাক মত হইছে সব। আমি বহুত খুশি!'

'বাব্বাহ্! আমিও কি কম ডরাইছিলাম? চেয়ারম্যান বাড়ির ইজ্জত বইলা কথা।' বলতে বলতে মনোয়ারা চিরুনি বুলায় চুলে।

'আমার পোলার অনুষ্ঠান কি আর যেমন তেমন হইব? অ্যাঁ? দশ গেরামের লোক দশ বছর পর্যইন্ত মনে রাখব। পোলায় কী করে?'

'ঘুমায়।'

মনোয়ারা এতক্ষণ ধরে আঁচড়ানো চুলগুলো খোঁপায় বন্দি করে। সুগন্ধি মাখে গায়ে। স্টিল আলমারীর ঝকঝকে আয়নায় সাজতে থাকে অল্প বিস্তর। এই একটু কাজলটা...এই ঠোঁট রাঙানো চকটা... টিপটা...চেয়ারম্যান তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে। হাতের কাগজপত্র হাতেই পড়ে থাকে। বউয়ের হোঁৎকা মোটা শরীরটা ইদানীং বড় বেশি দৃষ্টি কটু লাগে। সাজগোজও সে কটুতা ঢাকতে পারে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে বুক চিরে।

সয়ে যায়। শ্বশুরের বিস্তর যৌতুকের কথা মনে পড়লে ওটুকুও সয়ে যায়। তার সদ্যমৃত শ্বশুরের বদৌলতে সে এখন অঢেল দৌলতের অধিকারী। ছোট থেকেই অভাব গিলতে গিলতে বড় হয়েছে সে। মুটেগিরি করে করে পড়াশোনা চালিয়েছে। সে আমলের এক মাত্র বি এ পাশ ছেলে। এর জোরেই না হোঁৎকা মোটা কদর্য চেহারার ধনীর দুলালী মনোয়ারাকে পাওয়া। চেয়ারম্যানগিরি...তাও কি সে এমনি এমনি পাওয়া? গ্রামের অভাবী লোকগুলোকে শ্বশুরের টাকার কাগজ খাইয়ে ব্যালট কাগজে তার মূল্য নিতেই যদি না পারত তা হলে কি আজ এত ঘটা করে ছেলের মুসলমানি করাতে পারত? টাকা সব পারে! টাকা চেনে জয়। অভাবের জয়। স্বভাবের জয়। জয় পরাজয়ের। তা ছাড়া সে নিজে গভীর জলের মাছ। তাকে পরাজিত করে এমন কিছু এ জগতে নেই। তবে তার বউটা তার উল্টো। বড় বোকাসোকা মহিলা।

রিনিঝিনি হেসে ওঠে মনোয়ারা। লজ্জাবনত চোখে লাজুক গলায় বলে ওঠে, 'আমারে কেমন লাগতাছে?'

'সোন্দর। খুব সোন্দর লাগতাছে আমার পরী বিবি।'

মিথ্যে কথাগুলো বলতে পেরে ভেতরে ভেতরে বেশ পুলক অনুভব করে চেয়ারম্যান। বোকা বউকে আরও বোকা বলে প্রতিপন্ন করে।

মনোয়ারা রুপোর মল ঝমঝমিয়ে বিছানায় উঠে আসে।

'হুনছেন নি গো? অরুণারে সত্য সত্য দেখছে নাকি বুড়ি। কিরা কসম কাইটা কানতে কানতে আমারে বলল।'

'বুড়ির আবার সত্য দেখা। এক ঠ্যাঙ কবরে গেল। চোখ দুখানও যে আস্তা আছে, তুমি ক্যামনে বুঝলা। মাথা পাগলা বুড়ি, বয়সও হইছে কম না। হে কী না কী দেখছে হেইডা লইয়া বেবাকের মাথা ব্যথা।'

'ঠিক কইছ। আমারও পরথমে হেইডা মনে হইছিল। আমি বিশ্বাস করি নাই বাপু!'

প্রকাণ্ড একটা হাই তোলে মনোয়ারা।

'কী গো? বহুত রাইত হইছে, ঘুমাইবেন না।'

'হুম ঘুমামু। তুমি শুইয়া পড়ো। এই কাগজগুলায় সাইন করন বাকি।'

মনোয়ারা 'একান্ত অনুগত ছাত্রী'র মত কথা বাড়ায় না। সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ে। বলাই বাহুল্য, শোয়ার পাঁচ মিনিটের মাথায় ঘোঁত-ঘোঁত নাক ডাকতেও শুরু করে দেয়। বোকা মহিলা! শাড়ি, গহনা, খাওয়া, ঘুম ছাড়া আর কিছু চেনে না!

আড়মোড়া ভেঙে ঘুম ঘুম ভাব তাড়ানোর চেষ্টা করে চেয়ারম্যান। বিছানা ছেড়ে নামে। নতুন একটা নেশা জন্মেছে তার ভেতর। নেশার টানেই সে বের হয়ে পড়ে ঘুটঘুটে রাত্তিরের আঁধারে। ঝোপ জংলা মাড়িয়ে রওনা দেয় তার বাড়ির পেছনের কুটিরের উদ্দেশে।

সালমা তাকে দেখতে পেয়েই ভয়ে কুঁচকে গেছে। কাঁপছে রীতিমত। গোঁ গোঁ করছে। তাতে কিছু যায় আসে না চেয়ারম্যানের। ওর ওঙ্কার ঝোপ-জঙ্গল পেরিয়ে বাড়ির কামলাদের কিংবা তার বোকা বউয়ের কান পর্যন্ত

পৌঁছবে না। বউ ভোঁস ভোঁস করে ঘুমাচ্ছে সেটা নিজের চোখেই দেখে এসেছে। তসলিমাকে অলরেডি টাকা খাইয়ে এ কদিন সালমার সাথে শোয়া বন্ধ করিয়েছ। আর কী চাই? আর কামলাদের যদি কেউ নেহায়েৎ জেনে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে তাতেও সমস্যা নেই। টাকা আছে। টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। টাকা থাকলে পরাজয়ও থাকে না।

'ওই হারামজাদী! অত ডরাস ক্যান? বলতে বলতে সালমার বিছানায় বসে চেয়ারম্যান। লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায় রূপসী জড়কুণ্ডলী সালমার দিকে। কচি হলেও খাসা মাল। তার বেঢপ পরীবিবির চাইতে তো বটেই!

'ওই চোপ্! চোপ্!! আর একবার গোঙাইবি তো...'

সালমার মুহুর্মুহু বাড়তে থাকা গোঙানি স্তিমিত হয়ে আসে ধমকে। চেয়ারম্যান ধীরে ধীরে তার নোংরা হাত প্রসারিত করে ওর দিকে। একটানে কাছে নিয়ে আসে।

সালমার চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থমকে যায় সে। তার চোখে গত রাতের মত ভয় কিংবা বিভীষিকা নেই। তার বদলে আছে হিংস্রতা! ওর রক্ত-লাল চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকার সাহস পায় না চেয়ারম্যান। ওকে বিছানায় ফেলেই উঠে দাঁড়ায়।

এ তো মানুষের দৃষ্টি নয়। ডাইনী! ডাইনী ভর করেছে ওর উপর, না। এখানে আর এক মুহূর্তও নয়। ডাইনীর চাইতে বোকা বউ ঢের ভাল।

'কাছে আ-য়-য়...!!'

কানে ভুল শুনল না তো। খানিক অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল—এখন বিস্ফারিত চোখে সে চেয়ে দেখে, সালমা চার পায়ে ভর দিয়ে পশুর মত বসে আছে। তার দিকে তাকিয়ে, ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে। ভারী কণ্ঠে কথা বলছে ও এবং উঠে বসেছে! এর দুটোই ওর জন্য সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে কী...

আর দেরি না করে সমূহ বিপদ টের পেতেই দরজার দিকে দৌড় দিতে যায় চেয়ারম্যান। আজ তার ভাগ্য বড়ই খারাপ! কে যেন তাকে পাঞ্জাবীর কলারসুদ্ধ পেছনে টেনে ধরে। টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি

খেয়ে পড়ে যায় মেঝেতে।

আধাআধি ভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে চেয়ারম্যান বিস্মিত হয়ে দেখে, সালমা নামের ডাইনীটার হাত বিছানা থেকেই প্রসারিত হয়ে দরজার কাছে খামচে ধরেছে তাকে! সে এখন আর জড় কুণ্ডলী নেই। তার বদলে পরিপূর্ণ নারীর অবয়ব। আশ্চর্য! মুখটাও তো সালমার নয়। অরুণার! ঘোষালের মেয়ে অরুণার!

'আমারে চিনতে পারস, কুত্তা?'

কর্কশ কণ্ঠটা তার বুক ধড়ফড়ানি আরও বাড়িয়ে দেয়। বেশ চিনতে পারছে তাকে। এ বাড়িতেই ধান ভানার কাজ করত। সারারাত ঢেকিতে ধান কুটে বাকি রাতটুকু বাড়ির বারান্দায় বসেই কাটিয়ে দিত। বড় ভাল লাগত তাকে। তার ভরাট তনু কালচে মাংসল সৌন্দর্য বড় বেশি টানত। টানত দুলতে থাকা ওই নোলকটাও। মাথায় ঘোর লাগিয়ে দিত। একদিন ঘোরের মাথায় নিজেকে সামলাতে না পেরে তার মুখে গামছা বেঁধে, বাড়ির পেছনের জংলায় নিয়ে গিয়ে...

হুমকি দিয়েছিল, তার স্বামী আর এক বছরের দুধের বাচ্চাকে শেষ করে দেবে বলে। আর বেশ কটা টাকার লোভও দেখিয়েছিল। লাভ হয়নি। হারামাজাদী ফাঁসি নিয়ে মরেছে। এ সেই অরুণা! অথবা অরুণার প্রেতাত্মা!

লম্বা হাতে মাটি থেকে শূন্যে ঝুলিয়ে ধরে, ঝুলন্ত অবস্থাতেই নিয়ে আসে বড় আমগাছটার সামনে, যার ডালে নিজের শাড়ি পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছিল সে। অরুণার অসুরিক শক্তি দেখে চিৎকার করার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে চেয়ারম্যান। অরুণা উপর থেকে তাকে আছড়ে নীচে ফেললে, ককিয়ে ওঠে।

'তুই কুত্তা, আমারে নষ্ট করছিলি। নষ্ট করছস এই নিষ্পাপ মাইয়াটারেও। এইডার শাস্তি কী হইব তুই জানস?'

চেয়ারম্যান করুণাপ্রার্থীর মত তার দিকে তাকায়। যেমনটা তাকায় বাড়ির কামলারা, ভিক্ষে নিতে আসা ভিক্ষুকেরা।

'আ-আমারে...আমারে ছা...ছাইড়া দেও। আর এমন কাম...'

'হাঃ হাঃ হাঃ...'

অরুণার কিন্নর হাসির চোটে কথা শেষ করতে পারে না চেয়ারম্যান। বাতাসে তার হাসি ঢেউ তুলে ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। ঘাসের চাদরে। আমের পাতায় পাতায়। রাত্তিরের আকাশে অবাক চোখে ভেসে থাকা পূর্ণিমার চাঁদের থালায়।

'ছাইড়া দিমু? ওইডা তোল, তোল।'

হতবিহ্বল চোখে আলো আঁধারের মাঝে সাদা একটা লতা বা দড়ির মত কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখে মাটিতে। চেয়ারম্যান হুমড়ি খেয়ে ওটা তুলে নেয়। হ্যাঁ। দড়িই। গরু বাঁধার আধ-ময়লা দড়ি। দু'এক জায়গায় লেগে থাকা গোবর শুকিয়ে গেছে। চাঁদের আলোয় ওটাকে একটা সাদা-কালো লম্বা সাপের মত দেখায়। দড়ি হাতে ভীরু চোখে সে প্রেতিনীর দিকে তাকায়।

'ওইডা গলায় বাঁধ! বাইন্ধা ঝুইলা পড় ডালে। আমি যেমন ঝুলছিলাম, বাঁধ।'

চেয়ারম্যানের চোখ ফেটে কান্না আসে। বুকের ভেতর ধড়াস্ ধড়াস্ করে লাফাতে থাকা হৃৎপিণ্ড জানান দেয় তার অসাড় দেহে এখনও প্রাণটুকুর উপস্থিতি। জীবনে কখনও সে পরাজয় মেনে নেবে না ভেবেছিল। আজ কি তাই হতে চলেছে। এমন করুণ পরাজয়! দড়ি হাতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে সে অরুণার দিকে তাকিয়ে থাকে...চোখ জল ভরে ঝাপসা হয়ে আসতে থাকে দ্রুত...

সালমা দাওয়ায় বসে লোকজনের যাওয়া-আসা দেখে। আতর আর কর্পূরের গন্ধে ভারি হয়ে উঠেছে বাতাস। খাটিয়ায় পড়ে থাকা কাফন মোড়ানো লাশটাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত। অবশ্য লাশের দাফন প্রসঙ্গের চাইতে আরেকটা প্রসঙ্গই মুখর করে রেখেছে চেয়ারম্যানবাড়ির চারপাশ।

'চেয়ারম্যান গলায় দড়ি দিল ক্যান?'

কেউ ফিসফিসিয়ে বলে, 'মনে হয় খুন হইছে।'

'চোপ! এ কথা মুখেও আনিস না! পুলিশ যখন তোর গলায় দড়ি পরাইব তখন বুঝবি।'

'ওই থাম! দেখস না? পুলিশ এদিকে ঘোরাফিরা করতাছে।'

গুটিকয়েক পুলিশও এসেছে। লক্ষণ-টক্ষণ দেখে আত্মহত্যা বলেই কাফনে চালান করে দিয়েছে। অবশ্য তদন্ত তখনও চলছে।

সালমা তাদের দেখে। ভীষণ ব্যস্ততা ওদের। লোকজনের যাওয়া-আসা দেখতে দেখতে হঠাৎ একজনের দিকে চোখ পড়তেই সে চমকিত হয়। সেই মেয়েটা, যে কালরাতে তার ঘরে এসেছিল। মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়েছিল। কপালে চুমু আর অভয় দিয়ে বলেছিল, 'ভয় পাইস না। আমি আছি না? তুই ঘুমা।'

বিস্ময় এবং আনন্দ নিয়ে সে কালরাতে ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে লোকজনের হৈ চৈ শুনে ঘুম ভেঙে গেলে আর তাকে মাথার কাছে বসে থাকতে দেখে না।

সালমা এখন সেই মায়াবতী মেয়েটাকে দেখতে পাচ্ছে। ওই যে! ওই বড় মত গাছটার পাশে হেলান দিয়ে তার দিকেই তো তাকিয়ে আছে, হাসছে নোলক পরা মেয়েটা। হাসতে হাসতেই গাছটার আড়াল হয়ে যায় সে। সালমা তার জড়কুণ্ডলী দেহ নিয়ে অনেক চেষ্টা করে, একটু এগিয়ে গিয়ে তাকে দেখে। পারে না। প্রকৃতির দেওয়া আজীবন বাধার কাছে তাকে পরাজয় মানতে হয়।

তাহমিনা সানি

মা কালী

এটা বগুড়ার ঘটনা। ১৯৬২ সালে আব্বা আমাকে সরাসরি ভর্তি করে দিলেন বগুড়া প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের তৃতীয় শ্রেণীতে। আর দশজন ছাত্রের মত প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়া আমার হয়নি। ওই দুটো বছর আমাকে পড়িয়েছেন মফু নামের এক শিক্ষক। তিনি ছিলেন বড় মার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়, খুবই আদর করে পড়াতেন আমাকে। কোনও কোনওদিন হয়তো এমন হয়েছে যে শিক্ষক এসে উপস্থিত হয়েছেন, আমি ঘুম থেকেই উঠিনি। মফু মাস্টার তখন আমাকে খাট থেকে কোলে তুলে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিতেন পড়ার টেবিলে। মাঝেসাঝে বিরক্ত হয়ে আমি বেঁকে বসতাম, 'মাস্টার সাহেব, আজ আমি পড়ব না।'

মফু মাস্টার জিজ্ঞেস করতেন, 'একেবারেই পড়ার ইচ্ছে হচ্ছে না?'

'না,' বলতাম আমি আরও মুখ গোমড়া করে।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে বড় মার কাছে গিয়ে মফু মাস্টার বলতেন, 'যাই।'

'সে কী রে, এই তো মাত্র এলি,' বলতেন বড় মা।

'না, আজ থাক।'

বড় মা আর কথা বাড়াতেন না। মফু মাস্টারের শিক্ষণ পদ্ধতির ওপর ভরসা ছিল তাঁর। এবং সত্যিই তিনি ভরসা রাখার যোগ্য শিক্ষকই ছিলেন।

শৈশবে অনেক ব্যাপার মানুষ বোঝে না, কিন্তু ঘটনাগুলো তার স্মৃতিতে ঠিকই জমা থাকে। বড় হবার পর সে পেছন ফিরে দেখে, আর স্মৃতির কুঠরি খুলে সেগুলোর একেকটাকে নেড়েচেড়ে বিশ্লেষণ করে। আমিও তেমনই বিশ্লেষণ করে দেখেছি, মফু মাস্টার শিশু মনস্তত্ত্ব খুব

ভাল বুঝতেন, তাই আমাকে পড়ানোর তিন-চারটে বছর একবারের জন্যেও তাঁর আমাকে মারার প্রয়োজন পড়েনি, এমনকী বকাঝকাও করতে হয়েছে কালেভদ্রে।

বড়দের কিছু প্রচলিত ধারণার ফলে শিশুদের অনেক সময় ভুগতে হয়। তাঁরা স্থির নির্দিষ্ট কিছু পথের দিকে তাকিয়ে আশা করেন–শিশুরা বেড়ে উঠবে এই এইভাবে। আসলে শিশুরা কিছু মেনে-বুঝে বেড়ে ওঠে না, তারা বাড়ে তাদের নিজ নিজ ধরনে। 'দি লিটল স্প্যারো' গল্পে ম্যাক্সিম গোর্কি বলেছেন, 'শিশুদের মন সজীব, কলুষমুক্ত হবার ফলে তারা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ভাবনা ভাবতে সক্ষম। মানুষ যত বড় হয়, বাস্তবের কশাঘাতে ক্রমে ক্রমে তাদের মন ম্যাড়মেড়ে হয়ে যায়।' আমাদের কাজী নজরুল ইসলামও কোনও শিশু কিছু বলতে শুরু করলে তাকে ধমকে থামিয়ে না দিয়ে নতুন ধারণা পাবার আশায় তার কথা শেষ পর্যন্ত কান পেতে শুনতেন।

সত্যি বলতে কী, প্রায় সব বড়রাই ভুলে বসে থাকেন যে তাঁদের প্রত্যেককেই একসময় শৈশব পেরিয়ে আসতে হয়েছে। শিশুদের প্রকৃতভাবে বুঝতে হলে বুঝতে হবে নিজ শৈশবে ফিরে গিয়ে। যাই হোক, মফু মাস্টারের কল্যাণে আমি এক জ্বালার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম। কথাটা আমি এখানে খুব সংক্ষেপে বলতে চাই, কারণ, আজ না বললে সে-কথা আর কখনওই বলা হবে না।

একেবারে ক খ গ ঘ ঙ-এর সময় থেকেই আমার ভেতরে ছিল বিরল এক অভ্যেস, যা বোধ হয় শিশুদের থাকেই না। আমি কখনওই পড়তে পারতাম না জোরে জোরে শব্দ করে। অথচ সেসময় আমাদের আশেপাশের বাড়ির সমবয়েসী সব শিশু কেবল জোরে জোরেই পড়ত না, সামনে-পেছনে দুলত রকিং চেয়ারের মত, কেউ কেউ তো শব্দে বাড়ি মাথায় তুলে ফেলত। পক্ষান্তরে আমাকে সবসময় নিঃশব্দ থাকতে দেখে বড় মা ভাবতেন, আমি পড়াশোনায় ফাঁকি দিচ্ছি। তাই মাঝেসাঝেই বকাঝকা তো করতেনই, চড়চাপড়ও দিতেন। এই অবস্থা থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন মফু মাস্টার।

একদিন তিনি বড় মাকে বললেন, 'আপনি খসরুকে অযথা মারবেন

না।'

'অযথা!' অবাক হলেন বড় মা। 'ওর তো সাড়াশব্দই পাই না কখনও।'

'তবুও মারবেন না। সে যদি পড়াশোনাই না করবে, তা হলে সব পড়া পারে কীভাবে?'

'সব পারে!' আরও অবাক হলেন বড় মা। 'বলিস কী রে, মফু?'

'হ্যাঁ। সব পারে।'

সেদিন থেকে ওই বিষয়ে বড় মা আর আমাকে কিছু বলেননি।

তো, ভর্তি হলাম তৃতীয় শ্রেণীতে। তৃতীয় হলেও আমার জন্যে প্রথম। বাড়ির বাইরে এই প্রথম সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশ। বাইরে উচ্ছ্বসিত না হলেও ভেতরে ভেতরে সহপাঠী ছাত্র-ছাত্রী আর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের লক্ষ করি দারুণ কৌতূহলভরে।

কোন্ দিক দিয়ে যেন ১৯৬২ কেটে গিয়ে এল ১৯৬৩ সাল। চতুর্থ স্থান দখল করে উঠলাম চতুর্থ শ্রেণীতে। আর এই বছরটা পার হবার আগেই আমার দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে গেল হ্যাপি নামের এক ছেলের সঙ্গে। ভীষণ ডানপিটে ছেলে। সহপাঠীদের কেউ কোনও এদিক-সেদিক করলেই তার ঘুসি, সোজা নাক বরাবর। সঙ্গে সঙ্গে সেই সহপাঠীর ভ্যাঁ, খানিক পর কাঁদতে কাঁদতেই সারের কাছে গিয়ে নালিশ, এবং বিচারে হ্যাপির শাস্তি। কিন্তু হ্যাপি তো হ্যাপিই। স্কুল ছুটির পর গেট পেরিয়ে বাইরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নালিশকারী ছেলের কলার ধরে হ্যাপির শাসনি, 'কী রে, ব্যাটা, খুব তো নালিশ করলু। এখন তোক্ কোন্ স্যার বাঁচাবি বে?' পরমুহূর্তেই ঠাস করে চড় কান বরাবর, এবং সেই সহপাঠীর ভ্যাঁর পুনরাবৃত্তি।

১৯৬৪ সাল। দ্বিতীয় স্থান দখল করে উঠলাম পঞ্চম শ্রেণীতে। ততদিনে হ্যাপির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হয়েছে।

মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভেবেছি, কী জটিল আর রহস্যময় মানুষের মন! পৃথিবীর সবচেয়ে রহস্যময় আর জটিলতম বস্তুটিও মানুষের মনের তুলনায় নস্যি। এটা যে কখন কাকে ভাল লাগায়, কখন কাকে ডুবিয়ে দেয় ঘৃণার পাঁকে, কখন কাকে টেনে নেয় বুকের ভেতরে, আবার কখন

কাকে ঠেলে সরায় নিদারুণ অবহেলায়—বলা কঠিন, খুবই কঠিন! হ্যাপির মত দুর্দান্ত একটা ছেলের আমাকে ভাল লাগার কোনও কারণ নেই, এদিকে আমার মত নির্জনতাপ্রিয় একটা ছেলেরও নেই হুল্লোড়ময় হ্যাপিকে পছন্দ করার কোনও যুক্তি। যাই হোক, প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ছিল কো-এডুকেশন। ছাত্রীরা ভয়ে হ্যাপির আশেপাশে যেত না, ছাত্ররাও ততদিনে তার নামে নালিশ করা ছেড়ে দিয়েছে পিটুনির আতঙ্কে।

হ্যাপির ছিল হঠাৎ পণ্ডিতির অভ্যেস। পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময় একদিন স্কুলে এসে হাত শুঁকিয়ে বেড়াতে লাগল জনে জনে, আর জানতে চাইল, 'বল্ দেখি বে, আজ কী খায়্যা আসিচি?'

সবাই চুপ করে থাকায় শেষমেশ হ্যাপি নিজেই জবাব দিল, 'পিলাউ।'

এবার হেসে ফেলল খোকা নামের এক ছাত্র, 'পিলাউ! সিডা আবার কী, বে?'

'ইংরাজি না জানলে উঙ্কা প্রশ্নই তো করবু,' বলল হ্যাপি। 'শোন্ ব্যাটা, পোলাওয়ের ইংরাজি হলো পিলাউ।'

দুর্দান্ত ছিল সে জন্মগতভাবে। ওই বছরই কালীবাড়িতে দুর্গাপূজা দেখতে গেছি। প্রতিমা দেখতে দেখতে হ্যাপির মন্তব্য, 'দুর্গার দুই মেয়েক্ দেখিচু, লক্ষ্মী আর সরস্বতী? দুডাই স্যানা (পূর্ণযৌবনা) হচে।'

দুর্ভাগ্যক্রমে কথাটা শুনে ফেলল পুরোহিত। 'কী বললি রে, ছোঁড়া? থাম তো!' সোজা তেড়ে এল বুড়ো। আমরা দুজন চোঁ চাঁ দৌড়।

১৯৬৫ সাল। পঞ্চম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে পি.টি.আই.-এর পাট চুকিয়ে দিয়ে গিয়ে ভর্তি হলাম বগুড়া জেলা স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে। তখন সেখানকার হেডমাস্টার ছিলেন শেখ ময়েন আহমেদ। তাঁর মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষক আমার পুরো ছাত্র জীবনে আর কাউকে দেখিনি। তবে, আজ সেই পরম শ্রদ্ধেয় সারের কথা থাক।

১৯৬৭ সাল। আমি অষ্টম শ্রেণীতে উঠেছি। হাই স্কুলে যাবার পর

আমার অ্যাকাডেমিক রেজাল্ট আর ভাল হয়নি। যার মূল কারণ–প্রথাগত শিক্ষার প্রতি বিতৃষ্ণা।

বরাবর আমি ছিলাম বইয়ের পোকা (আজও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি), হাতের কাছে যা-ই পাই পড়ে ফেলি। ফলে ততদিনে আমি পড়ে ফেলেছি দস্যু মোহন, দস্যু বাহরাম, দস্যু কালো ভোমরা, স্বপ্নকুমারের আট আনা আর পাঁচ সিকা সিরিজ, বিজন বনের রূপকথা, পরীর দেশে ফুলের বেশে থেকে শুরু করে গ্রিক মিথলজি, দি প্রিন্স অ্যাণ্ড দি পপার, অ্যালান পোর গল্প, জাতক সংগ্রহ। মনের দিক থেকেও অনেক সাবালক অনুভব করছি। আর সেই সাবালকত্বের আগুনে ঘি ঢালতে শুরু করেছেন কোনও কোনও শিক্ষক।

কাদের সার একদিন ইংরেজি প্রেসীজ ক্লাশ নিচ্ছেন। সেদিন কী যেন কারণে আগেই ছুটি হয়ে গেছে গভর্নমেণ্ট গার্লস (ভী.এম.) হাই স্কুল। সারি বেঁধে মেয়েরা চলে যাচ্ছে জেলা স্কুলের পাশ দিয়ে।

কাদের সারকে আমরা বলতাম–কাদের গামা। কারণ, সার যেমন ছিলেন ছয় ফুটেরও বেশি উঁচু তেমনই দশাসই বপুর অধিকারী। টিচার্স কমন রুম থেকে কখন সারেরা ক্লাশের দিকে আসছেন তা আমরা উঁকি মেরে মেরে দেখতাম। একদিন শামিম সোহেলী মোসাবী নামের এক ছাত্র ঘোষণা দিল, 'কাদের গামা আসিচ্চে।' কিন্তু বেচারির টাইমিঙয়ে ভুল হয়ে গেল। মানে, স্যার ততক্ষণে অনেক কাছে এসে পড়ায় শুনে ফেললেন তার কথা। তাই ক্লাশে ঢুকেই সার মোসাবীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই আমার কী নাম বললি রে?' তারপর এই মার না সেই মার। ওপরদিকে লাফাতে লাফাতে মোসাবী বলতে লাগল, 'সার সার, বিশ্বাস করেন, হামরা আপনাক অপমান কর্যা এই নাম ধর্যা ডাকি না, সার। ভাব্যা দেখেন, গামা বিরাট পালোয়ান ছিল।' মারতে মারতে সার হেসে ফেললেন, 'যা, আজকের মত ছেড়ে দিলাম। লাস্ট বেঞ্চিতে গিয়ে বস্, আর একদিন শুনেছি তো...'

যাক, বলছিলাম কাদের সারের প্রেসীজ ক্লাশের কথা। সারি বেঁধে চলে যাচ্ছে মেয়েরা। প্রথমে থুতু ফেলতে গেল মাসুদ, তারপর আলাউদ্দীন, আর তারপর শামিম সোহেলী মোসাবী। সে ক্লাশে ঢুকতেই

কাদের সার বললেন, 'কী, সোনার চাঁদ, এত ঘন ঘন থুতু ফেলা কেন?' হাসলেন তিনি মুখ ভরে। 'ওই বয়স এখনও হয়নি।'

আরেক দিন সুলাইমান সার নিচ্ছেন ইতিহাস ক্লাশ। বই দেখে সার পড়ছেন, '...এক রাজা অন্য রাজ্য জয় করিবার পর অনেক সময় মর্মান্তিক অধ্যায়ের সূচনা হইত, চলিত লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ, নারীদের সম্ভ্রমহানি।'

দুলাল নামের এক ছাত্র নিরীহ মুখ করে জানতে চাইল, 'সার, সম্ভ্রমহানি মানে কী?' একগাল হেসে সুলাইমান সার তাকালেন আমাদের দিকে, তারপর সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোরা কি ভাবিচু উঁই এডার মানে জানে না? শয়তান আসলে হামার মুখত্ থাকে শুনবে।'

তখন পাকিস্তান আমল। উত্তরা, মেরিনা হলে চলছে পাকিস্তানী উর্দু সিনেমা, আমরাও দেদারসে দেখে চলেছি মো. আলী, সুধীর, জেবা, শামিম আরার অভিনয়। তো, আমরা অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময়েই বগুড়ায় সর্বপ্রথম শুরু হলো ম্যাটিনি শো। ফলে আমাদের সুযোগ আরও বাড়ল। আগে বাড়িতে না বলে ইভনিং শো দেখলে রাত করার জন্যে বড় মা বা আব্বার গালি শুনতে হত, ম্যাটিনি শো শুরু হবার পর দুপুরে সিনেমা দেখে সন্ধের আগেই বাড়ি ফিরতে লাগলাম সুবোধের মত।

টিফিনের পর শুরু হত আমাদের ফিফথ পিরিয়ড, ওদিকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে শুরু করত উত্তরা হলের মাইক থেকে ভেসে আসা ম্যাটিনি শো-পূর্ব গান। মোটামুটি গোটা পাঁচেক গান বাজত, তার মধ্যে দুটো গান বাজত প্রতিদিন। একটা 'আওয়ারা'র মুকেশের 'আওয়ারা হুঁ, ম্যায় গরদিশ নেহি আসমানকা তারা হুঁ,' আরেকটা 'লিডার'-এর মো. রফির 'মুঝে দুনিয়াওয়ালো শরাবী না সমঝো'। আনচান করা মন নিয়ে অপেক্ষা করতাম আমরা, আর ছুটির দিন আসামাত্র ছুটতাম হল অভিমুখে।

তখন গুনগুন করে গাইতাম আমি মেহেদি হাসানের 'রাহি ভটকনেওয়ালে', কিংবা 'এক নয়ি মোড়পে লে আয়া এহি হালাত মুঝে।'

ধমক দিত হ্যাপি, 'তোর শালা যতোসব বুড়াকেরে গান। গানই

গাবি তো গা ইঙ্কা,' বলে বেসুরো গলায় শুরু করে দিত আহমেদ রুশদির 'আজ খুশিসে ঝুম রাহা হ্যায় এক পরদেশী মস্তানা।'

অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময়ের বর্ণনাটা একটু লম্বা দিলাম। কারণ, আজ যে-ঘটনাটা লিখতে বসেছি তা ঘটেছিল আমি অষ্টম শ্রেণীতে থাকতেই।

মাঝেসাঝে সন্ধের পর আমরা দুজনে গিয়ে বসতাম জেলখানার পাঁচিলের পাশে। একটা ঢাল বেয়ে নামলেই করতোয়া নদী, করতোয়ার ওপারে লাশকাটা ঘর। হ্যাপি তখন সিগারেট খেত; কখনও এক্সপ্রেস, কখনও ব্রিস্টল, আবার কখনও ক্যাপস্টান। সে আমাকে সিগারেট সাধত, বরাবর 'না' করতাম।

এমনই গিয়ে বসেছি একদিন। হ্যাপি যথারীতি সাধছে, আমিও 'না, না' করছি। এক পর্যায়ে সে বলল, 'আজ খাবে। খুব ভাল সিগারেট। থ্রি ক্যাসল্স্। চাচার পকেটত্ থাক্যা মার্যা দিচি।'

তবুও 'না' করলাম আমি। তখন রেগে গিয়ে হ্যাপি বলল, 'তোর সবই ভাল, কিন্তু তুই শালা অ্যাডা লিরামিষ!'

সম্ভবত নিরামিষ হতে চাইলাম না বলেই তার প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে টানতে লাগলাম জোরে জোরে। আমার পিঠ চাপড়ে হ্যাপি বলতে লাগল, 'শাবাশ! শাবাশ!' আর তখন সিগারেটে হাতেখড়ি আমি কাশতে লেগেছি খকখক করে।

আরেক দিন গিয়ে বসলাম আমরা। চারপাশে চাপ চাপ অন্ধকার, কারণ, সেটা ছিল কালীপূজার রাত। আগেই বলেছি, হ্যাপির ছিল হঠাৎ পণ্ডিতির অভ্যেস। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হ্যাপি বলল, 'সংস্কৃত জানিস, বে? শোন্—যাঁ দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেন সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো: নম:।'

হঠাৎ কেমন একটা জেদের মত পেয়ে বসল আমাকে। বললাম, 'সংস্কৃত তুই বুঝি একাই জানিস? তা হলে শোন্—যাঁ দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো: নম:।'

মিটমিট করে হাসতে শুরু করল হ্যাপি, 'হামার অস্ত্র দিয়া হামাকই মারিচ্চু?'

'তার মানে?'

'মানে আবার কী, বে? হামি যে সংস্কৃত কনো, সিডাই আবার হামাক শোনালু।'

'সেটাই শোনাইনি,' মাথা ঝাঁকালাম আমি। 'তুই বলেছিস "শান্তি রূপেন", আমি সেখানে "শক্তিরূপেন" বলেছি।'

'তার মানে?'

'মানে হলো, দেবী কখনও শান্তির রূপ ধরে আসে, আবার কখনও আসে শক্তির রূপ ধরে। আজ যার পুজো হচ্ছে, সেই কালী হলো শক্তির দেবী। বুঝেছিস?'

'হ।' চুপচাপ সিগারেট টানতে লাগল হ্যাপি। মিনিট তিন-চারেক পর বলল, 'করতোয়াত্ এখন পানি কম্যা গেচে। চ, নদী পার হয়্যা ওপারকার লাশকাটা ঘরত্ যাই।'

'না।'

'তুই শালা অ্যাডা হিম্মতগঁ্যাড়া (কাপুরুষ)। তা'লে তুই বসে তাক, হামি একপাক ঘুর্যা আসি।'

ঢাল বেয়ে নামতে লাগল হ্যাপি। অন্ধকার আজ এত গাঢ় যে ঢালের নীচে নামার পরই তাকে আর দেখতে পেলাম না। মিনিট দুই পর কানে এল তার নদীর হাঁটু-পানি পার হবার ছপ ছপ শব্দ। আরও মিনিট দশেক পর, খানিক অন্তর অন্তর আগুনের ঝিলিক দেখতে পেলাম লাশকাটা ঘরের আশপাশে। হ্যাপি দেশলাই জ্বালছে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে।

ফিরল সে আরও আধ ঘণ্টা পর। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম আমি, 'চল্ যাই। আর দেরি করলে আব্বা বকবে।'

বাড়ির ফিরতি পথে হাঁটতে হাঁটতে হ্যাপি বলল, 'তুই গেলি না ক্যান্?'

'কী দেখলি ওখানে?' পাল্টা প্রশ্ন করলাম আমি।

'না, দেখার আর কী আছে? দুডা লাশ পড়্যা আচে। অ্যাডার ঠ্যাং ধর্যা আট-দশডা শিয়াল কামড়াকামড়ি করিচ্চে। উটি ঘুর্যা বেড়াতে ভালই লাগে, খালি অ্যাডাই মশকিল। লাশের পচা পচা গন্দ।'

'তোর ভয় লাগেনি?' জানতে চাইলাম আমি।

'ভয়! কীসের ভয়?' এমন গলায় বলল হ্যাপি, যেন আমি করে বসেছি আজব কোনও প্রশ্ন।

'লাশকাটা ঘর, শ্মশানের আশেপাশে নাকি ভূতপ্রেত আসে। বিশেষ করে, আজ কালীপূজার রাত নাকি খুবই ভয়ঙ্কর।'

'অগল্যান হিম্মতগ্যাঁড়াকেরে কথা,' বলল হ্যাপি রেগেমেগে।

আর কোনও আলাপ না করে চুপচাপ হেঁটে চললাম আমরা। মিনিট পনেরো পরেই পৌঁছে গেলাম জলেশ্বরীতলাতে আমাদের বাড়ির কাছাকাছি। এবার সুড়ুৎ করে আমি ঢুকে পড়ব বাড়িতে, চলে যাবে হ্যাপি। তার বাড়ি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের একশগজ মত পশ্চিমে, আমাদের বাড়ি থেকে মাত্র মিনিট পাঁচেকের পথ।

হঠাৎ ফিসফিসিয়ে হ্যাপি বলল, 'হামি এক প্ল্যান করিচি।'

'প্ল্যান? কীসের প্ল্যান?'

'আজরাত্রে মা কালীর জিবা বাঙমো,' হাসল সে।

'খবরদার! ওসব পাগলামি বাদ দে!' ধমক দিলাম আমি।

'পাগলামির কী দেখলু, বে?' পাল্টা ধমক ছাড়ল হ্যাপি। 'খালি যামো আর পুটুস কর‍্যা জিবাডা ভাঙ্যা লিয়া চলে আসমো।'

'আজ কালীপূজার রাত, খুবই খারাপ।'

আমার কথার কোনও জবাব না দিয়ে হনহন করে বাড়ির পথ ধরল হ্যাপি।

মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলাম, সত্যিই কি এই কাজটা করবে সে? তারপর ঢুকে পড়লাম বাড়ির ভেতরে।

পরদিন হ্যাপি স্কুলে এল না। তার পরদিনও না। ইতিমধ্যে বাররুহ্ নামের এক ছাত্র বলল, 'হ্যাপি শালার নাকি জ্বর হচে।'

সেদিন স্কুল ছুটির পর খেয়েদেয়েই বিকেলবেলা গেলাম হ্যাপিদের বাড়ি। হ্যাপির আব্বা আমাকে দেখে বললেন, 'ওর তো দুই দিন থাক্যা খুব জ্বর। একশ পাঁচ পয়েন্ট আট পর্যন্ত উঠিচিল।'

'এখন কেমন চাচা?'

'আজ সকাল থাক্যা অ্যানা কমিচে। তুমি যাও, হ্যাপি ঘরত্ই আচে।'

উঠোন পেরিয়ে গিয়ে ঢুকলাম তার ঘরে। দুর্দান্ত হ্যাপির মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। আমাকে দেখেই ধড়মড় করে উঠে বসতে চাইল সে।

'উঠিস না, উঠিস না!' বললাম তড়িঘড়ি।

কপালে হাত দিয়ে দেখলাম, বেশ জ্বর আছে এখনও। তার খাটের শিয়রে একটা ছোট টুল, সেখানে একটা বাটিতে রয়েছে থার্মোমিটার। জ্বর মাপলাম—একশ সাড়ে তিন।

খাটে বসতে হ্যাপি আমার একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'তুই আসিচিস, দোস্ত, খুব খুশি হলাম রে। কাল আর পরশু তোর কথা খুব ভাবিচি।'

'হুঁ, তা মানা করার পরেও গিয়েছিলি নাকি সেইরাতে?'

'সেজন্যেই তো জ্বর, বে,' তার ঠোঁটে ফুটল মলিন একটুকরো হাসি।

'কী ব্যাপার বল্ তো?'

মিনিটখানেক পর হ্যাপি বলতে লাগল আজব এক ঘটনা

'সেইরাতে তুই চলে যাবার পর বাড়িত্ আনো হামি। ভাত খাবার পর মাথাত্ ঘুরবার লাগল চিন্তা। একবার ভাবনো—যামো, আরেকবার ভাবনো—যামো না। শেষমেশ ঠিক করনো—যামোই।

'রাত বারোডা বাজতে হামার দরজাত্ শিকল তুল্যা দিয়া, গেটের তালা খুল্যা হাঁটপার লাগনো হামি। মিনিট পনেরোর মধ্যেই চলে গেনো কালীবাড়ি। কিন্তু ভেজাল কি কম! তকনো ভিতরে লোকজনের কথা শোনা যাচ্চে। অন্ধকারত্ই বসে থাকনো পশ্চিম দিককার পকরডার কচুর গাছগুলোর মদ্যে। মশাও শালা কামড়াচ্ছে। রাত তিনডার দিকে পূজা-করা বুড়াডা চল্যা যাতে নিঝুম হয়্যা গেল কালী বাড়ি।'

হ্যাপি থামল। কিন্তু আমাকে ততক্ষণে পেয়ে বসেছে গল্পটা। তাই বলে উঠলাম, 'তারপর?'

আবার মলিনভাবে হেসে হ্যাপি ফিরে গেল তার বর্ণনায়:

'পৃথিবীত্ যে কত আজিব জিনিস আছে রে!'

'তার মানে?' জানতে চাইলাম আমি।

'আগে পুরাড়া শোন্। বুড়া চল্যা যাবার পরেও হামি দেরি করনো মিনিট দশেক। না, চারপাশে আর কোনো সাড়াশব্দ নাই। কচুর গাছের মদ্যে থাক্যা বার হয়্যা আগানো কালীবাড়ির দিকে। দরজাত্ তালা নাই, তাই ঢুকতে অসুবিদা হলো না। বিতরে এক্কেবারে নীরব। ধীরে ধীরে আগালাম একপাশে খাড়া করা মা কালীর মূর্তির দিকে। তোরা তো সব্বাই জানিস, হামার ভয়ডর কিচ্ছু নাই। কিন্তু সেইরাতে কালীবাড়ির ভিতরে পা দিতেই শরীল্ডা কেমন করবার লাগল।'

'কেমন?' ফিসফিস করে জানতে চাইলাম আমি।

হাত তুলল হ্যাপি, যেন নিষেধ করল বাধা দিতে। আমিও ভাবলাম–না, আর কোন বাধা দেব না। কথা শেষ করুক সে।

'ঠিক কবার পারমো না। বারবার মনে হবার লাগল, উটি হামি ছাড়াও অন্য কেউ আছে! ঘোর অমাবস্যার কঠিন অন্ধকার। মূর্তির একেবারে কাছে যাতে চখত্ পড়ল কালীর সাদা সাদা দুই চখ আর লাল ঝোলান্ জিবা। আজ আবার দেশলাই লিয়্যা আসতে ভুলে গেচি। কানের কাছে কে যেন বলল–এখনও সময় আছে–পালা-পালা! কিন্তু হামি কি পালাবার বান্দা? তাই আবার তাকানো মূর্তির দিকে, আর তকনই খিয়াল করনো ব্যাপারডা। মনে হলো...'

কী মনে হলো? জিজ্ঞেস করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলাম আমি।

'মনে হলো, মা কালীর দুই চখ একন আর মাটির চখ লয়। কড়া চখে আবার তাকানো; হয়, মূর্তির চখ দুডার মণি যেন অ্যানা অ্যানা লড়িচ্চে। ভাবনো, আর দেরি করা উচিত হবি না। কিন্তু যাবার আগে জিবাডা ভাঙ্যা লিমো। ভাঙার জন্যে হাত বাড়ানো লাল টকটকা জিবাডার দিকে । ঠিক তখনি কালী মূর্তির পিছন থাক্যা ঘোঁত কর্যা ভাস্যা আল চাপা একডা গর্জন। সাহস আর কুলাল না, দোস্ত। প্রায় লাপ দিয়ে চলে আনো হাত দশ-বারো পিছনে। দেকনো, মূর্তির সামনে আস্যা খাড়া হয়্যা আছে বিরাট এক জানোয়ার, চারডা পাও, চখদুডা অন্ধকারত্ আগুনের মতন জ্বলিচ্চে। কালীবাড়ি থাক্যা বার হয়্যা সোজা দৌড় দিলাম; আবার একবার ঘোঁত কর্যা উটে তাড়্যা আল জানোয়ারডা।

রাস্তাত্ লাইট আছে; হামিও দৌড়াচ্ছি, পিছে পিছে ছুটে আসিচ্চে জানোয়ারডা। প্রায় চখে পলকত্ চলে আনো জলেশ্বরীতলার তোরকেরে বাড়ির মোড়ত্। কিন্তু ডানে না ঘুর্‌য়া হামি ছোটনো সোজা মালতিনগরের দিকে। মালতিনগরের মোড়ত্ আসতে, হামাক যকন প্রায় ধর্‌য়া ফেলিচে, তখন ওপরদিকে অ্যাডা লাফ দিয়ে থাম্যা গেল জানোয়ারডা। মনে হলো, অড্যার গলাত্ দড়ি লাগ্যা দিয়া হ্যাঁচকা টান দিছে কেউ। হামি দৌড়াতেই থাকনো; জানোয়ারডা মোড়ত্ই খাড়া হয়্যা থাকল, আর পিছন পিছন আল না। ক্যাঙ্কা কর্‌য়া যে সেইরাতে বাড়িত্ ফির্‌য়া আলাম, দোস্ত, আল্লাহ্ই জানে! তারপর থাক্যাই গায়েত্ জ্বর।'

হ্যাপি বর্ণনা শেষ করতে এটু যেন স্বস্তি পেলাম।

'যা, ব্যাটা, তুই কুকুর দেখেছিস,' হাসলাম আমি।

'কুকুর?' তাকাল হ্যাপি ফ্যালফ্যাল করে।

'হ্যাঁ। অন্ধকার গাঢ় ছিল, তাই ভালভাবে দেখতে না পেয়ে অন্য কোনও জানোয়ার ভেবেছিস।'

'না। রাস্তাত্ পরিষ্কার বাতি জ্বলিচ্চিল। তা ছাড়া, অত বড় কুত্তা!'

'কেন, জজসাহেবের গ্রে হাউণ্ড কুকুর দেখিসনি? কী বড়! জজ সাহেবের বাড়ি তো তোদের বাড়ির পাশেই।'

'এই ব্যাটা, তোর যুক্তি থামা তো, বে,' বলল হ্যাপি।

'যুক্তি থামাব কেন? এটা যুক্তিরই কথা।'

জ্বলজ্বলে চোখে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকার পর চিবিয়ে চিবিয়ে হ্যাপি বলল, 'তোর যুক্তি বুঝলাম–কুত্তা বড় হয়। হ্। কিন্তু পৃথিবীর কোন কুত্তার গায়েত্ই ডোরা নাই!'

এবার আর আমার মুখে কোনও কথা জোগাল না। চোখে চোখে তাকিয়ে রইলাম দুজনে। অবশেষে অস্বস্তিকর সেই নীরবতা ভেঙে ভেসে এল তার আব্বার ডাক, 'হ্যাপি–'

'জী, আব্বা?'

'আজ রাত্রে খসরুক্ খায়্যা যাবার ক।'

খসরু চৌধুরী

মৃত্যু পরোয়ানা

তাং-৯-১২-০৭

কলজে কাঁপানো ভীষণ ভয়ংকর এবং অপার্থিব কিন্তু চেনা ডাকটা শুনে আমার হৃৎপিণ্ডটা দ্রুত লাফাতে শুরু করল। ভয়ে আমার পুরো শরীর কাঁপতে লাগল থরথর করে। সারা শরীর যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। ওই ভয়ংকর ডাকটার মানে আমি জানি। আমি বুঝতে পারি, ওই ডাকটা শোনার পরদিন কী ঘটবে!

গভীর রাতে তীক্ষ্ণ অশুভ ডাকের শব্দটা শুনি আমি কখনও একমাস, কখনও ছ'মাস, কখনও এক বছর পর অথবা কখনও কখনও পরপর কয়েক বছরেও। ওই ডাকটা শুনলেই আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না। কারণ, ওই ডাকটা ভীষণ ভীষণ অশুভ। ভয়ংকর, হৃদয়বিদারক।

আমি ভয়ে ভয়ে ভাবতে থাকি, এবার কার পালা? তবে কি এবার আমার পালা?

সেজানের খুবই প্রিয় বন্ধু রকিবের ডায়েরীর শেষ পাতাটাতে অগোছালভাবে লেখা উপরের কথাগুলো। বোঝাই যাচ্ছে রকিব খুব ভয় পেয়ে ডায়েরীর পাতায় কথাগুলো লিখেছে। কারণ, অন্যান্য পাতায় খুব সুন্দর করে লিখলেও এ পাতাটাতে তার সেই লেখার ধারাবাহিক সৌন্দর্যটুকু নেই। যেন কেউ তাকে তাড়া করেছে এবং রকিব কোনওমতে তার লেখা শেষ করেছে।

প্রথম পাতা থেকে আবার রকিবের লেখাগুলো পড়তে থাকে সে...

তাং-৩-৭-৯৮

তীক্ষ্ণ একটা শব্দ শুনে চট করে ঘুম ভেঙে গেল আমার, এমনিতেই আমার ঘুমটা খুব পাতলা ধরনের, সামান্য একটু শব্দেই শালার ঘুম কোথায় যেন পালিয়ে যায়। কীসের শব্দ শুনলাম আমি?

ঘুম যখন ভেঙেই গেল, কী কারণে, কোন শব্দ শুনে ভাঙল তা বোঝার চেষ্টা করি। বিছানায় শুয়েই কানটাকে শব্দের উৎপত্তিস্থলের দিকে খাড়া করে রাখলাম। কিছুক্ষণ পর শরীরে শিহরণ জাগানো সেই ভয়াল শব্দটা আবার শুনলাম। আমার জীবনে এধরনের কোনও শব্দ শুনেছি বলে মনে হয় না। এ এক অন্যরকম শব্দ।

গভীর রাত। চারদিক নিস্তব্ধ। গভীর এ রাতের সুনসান নীরবতা ভেঙে দিয়ে ডেকে উঠল কোনও পাখি! পরপর তিনবার ভয়ংকর ডাকটা শুনলাম আমি। আমাকে অন্যধরনের এক ভয় পেয়ে বসল। সত্যিই ভীষণ ভয় পেয়েছি আমি ওই ডাকটা শুনে। বেশ কিছুক্ষণ পর চোখে ঘুম নেমে এল। ঘুমের সাগরে তলিয়ে গেলাম আমি।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দাঁত ব্রাশ করতে করতে বাড়ির পাশে লাগোয়া পুকুরে গেলাম মুখ ধোয়ার জন্য। ঠিক তখনই শুনতে পেলাম, পাশের বাড়িতে কান্নার শব্দ। কান্নার উৎস কী জানতে যখন ওই বাড়িতে গেলাম, জানতে পারলাম, রাত তিনটার দিকে এ বাড়ির প্রবীণ সদস্য আকবর চাচা মারা গেছেন।

সকাল বেলাতেই মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। আকবর চাচা খুব ভাল মানুষ ছিলেন। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। এবং মুক্তিযুদ্ধে তাঁর এক পা হারিয়েছিলেন। সব সময় তাঁকে দেখতাম হুইল চেয়ার নিয়ে চলাফেরা করতে। আমাকে খুব পছন্দ করতেন তিনি। কারণ, আমি তাঁর সেই যুদ্ধের কাহিনি খুব মন দিয়ে শুনতাম। একই গল্প বলার জন্য তাঁকে বারবার অনুরোধ করতাম।

তিনিও সোৎসাহে তাঁর মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা, ঘটনাগুলো আমাকে বলতেন। চাচার মুখে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গল্প আর শুনতে পাব না। আর কেউ আমাকে কাছে ডেকে তাঁর মত স্নেহের সুরে জিজ্ঞেস করবে না, 'কেমন আছেন, লেখক সাহেব?' ভাবতেই চোখে পানি এসে গেল, ঠিক তখনই আমার মনে হলো, আকবর চাচার মৃত্যুর সাথে ওই অশুভ ডাকটার একটা যোগসূত্র আছে!

তাং-৯-১০-৯৮

খালার শরীরটা বেশি ভাল নেই।

আমাদের গ্রামের পাশে পলাশনগর গ্রামেই তাঁর শ্বশুর বাড়ি। সেদিন গিয়ে খালাকে দেখে এলাম। খালাকে দেখে মনে হলো, তাঁর সময় ফুরিয়ে এসেছে। যে কোনও সময় তিনি এই সুন্দর পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে পারেন।

খালাকে দেখে আসার দু'দিন পর গভীর রাতে সেই ভয়ংকর, অশুভ ডাকটা শুনতে পাই আমি। আমি বুঝতে পারি, কারও মৃত্যু পরোয়ানা ওই মুহূর্তেই জারী হয়ে গেছে!

সকালে মায়ের কাছ থেকে শুনলাম, খালা নাকি কাল রাতে মারা গেছেন।

তাং-১২-৫-০১

'শালা, তোকে তো বেশ ক'দিন ধরে দেখাই যাচ্ছে না, প্রেমে-ট্রেমে পড়লি নাকিরে, ব্যাটা?' অনেকদিন পর আরিফকে দেখে জানতে চাইলাম আমি।

বেশ ক'দিন ধরে ও ভার্সিটিতে আসছে না। ফোন করেও এতদিন ব্যাটার কোনও পাত্তা পাইনি। আজ অমাবস্যার চাঁদকে পেয়েই কথার রেলগাড়ি ছুটালাম।

'নারে, ভাই, আমরা কি আর তোদের মত লেখক নাকি যে, আমাদের সাথে মেয়েরা পিরিত করবে! তোরাই তো সবাইকে ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিস।'

'আরে ব্যাটা আঁতলামি বাদ দে, এতদিন কোথায় ছিলি বল।'

'গ্রামের বাড়িতে গেছিলাম।' বলে আরিফ চুপ করে থাকে।

'ও আচ্ছা। তাই তো বলি সোনার চানকে দেখা যায় না কেন? এবার বল, চা না বিড়ি?'

'দুটোই চলুক।'

গতকাল রাতে ওই অশুভ ডাকটা আবার শুনেছি আমি। আমি জানি, আজ সেই ডাকের ফলাফলটা হাতে হাতে পাব।

সকালে ঘুম থকে উঠেছিও ভয়ে ভয়ে। ভেবেছি, না জানি আজ এই ভোরে কার মৃত্যু সংবাদ শুনতে হবে আমাকে। কিন্তু সকাল পেরিয়ে

এখন বিকেল শেষ হতে চলেছে। ভার্সিটি থেকে চলেও এসেছি। একটু পরে যাব টিউশনিতে। কিন্তু...

কিন্তু ওই ডাকটার ফলে কী হলো তো তো এখনও জানি না!

তবে কি এতদিন ভুল ধারণা করে এসেছি? ওই ডাকটা কী তবে কোনও সাধারণ নিশাচর পাখিরই ছিল? ছিঃ! এতদিন মনের মধ্যে এসব কী আজগুবি চিন্তা-ভাবনা পোষণ করেছি আমি! ভাবতেই নিজের প্রতি একটা ঘৃণা উথলে উঠল। সিদ্ধান্তে এলাম, এতদিন ওই তুচ্ছ ডাকটা নিয়ে ভুলের সাগরেই বসবাস করেছি আমি।

ওসব মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে টিউশনিতে গেলাম। ছাত্রকে পড়া বোঝানোর মাঝখানে বান্ধবী সোহানার ফোন পেলাম। যা শুনলাম, নিজেকে কিছুতেই স্বাভাবিক রাখতে পারলাম না। আরিফ নাকি কিছুক্ষণ আগে গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে!

ওই অশুভ ডাকটার ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে আমার ধারণা মনে পোক্ত হলো আবারও।

তাং-৯-১২-০৭

কলজে কাঁপানো ভয়ংকর, ভীষণ ভয়ংকর এবং অপার্থিব কিন্তু চেনা ডাকটা শুনে আমার হৃৎপিণ্ডটা দ্রুত লাফাতে শুরু করল, ভয়ে আমার পুরো শরীর থরথর করে কাঁপতে...

ওই ডাকটা শুনলেই আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না। কারণ, ওই ডাকটা ভীষণ, ভীষণ-অশুভ। ভয়ংকর। হৃদয়বিদারক। আমি ভয়ে ভয়ে ভাবতে থাকি, এবার কার পালা? তবে কি এবার আমার পালা?

হ্যাঁ, ওইদিন রকিবের মৃত্যু পরোয়ানাই জারী হয়েছিল। ওই অশুভ ডাকটিই ছিল রকিবের এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার সমন। রকিব ওইদিন রাতেই ভয় পেয়ে হার্টফেল করে মারা যায়।

রকিবের নিজের হাতে লেখা ডায়েরীটা পড়ে ভয়ে, বিস্ময়ে হাঁ হয়ে থাকে সেজান। এটা কি সত্যি?

দুই

এ ধরনের অদ্ভুত, ভয়ংকর, গা হিম করা ডাক তো আগে কোনদিন শোনেনি সেজান! এ আবার কোন্ নিশাচর পাখির ডাক?

ডাকটা শুনে ঘুম ভেঙে গেল ওর। লাইট জ্বেলে ঘড়িতে দেখল, রাত দুটো পনেরো। ভয় ধরানো আওয়াজটা শোনার পরও নিজেকে স্বাভাবিক রাখল। টেবিলে রাখা জগ থেকে দু'গ্লাস পানি খুব দ্রুত পেটে চালান করে দিল।

ভয় পায়নি, পায়নি বলে মনকে বোঝাতে চেষ্টা করলেও বুঝতে পারছে হৃদঘড়িটা তার টিক টিক করে খুব দ্রুত গতিতে অজানা গন্তব্যে ছুটে চলেছে।

ওর মনে পড়ে গেল, কিছুদিন আগে পড়া রকিবের লেখা ডায়েরীর কথাগুলো। তবে কি ওই অশুভ ডাকটাই শুনতে পেয়েছে সে? ভাবতেই শরীরের সব লোম দাঁড়িয়ে গেল সেজানের। দরদর করে ঘাম ছুটল, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে বাতি জ্বেলেই শুয়ে পড়ল। প্রিয় বন্ধু রকিবের মতই হয়তো সকালে ঘুম থেকে উঠে কারো মৃত্যু সংবাদ শুনতে পাবে ও!

সকালে ঘুম থেকে উঠেই উত্তেজনায় পুরো শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল তার। কোনওমতে বিছানা থেকে উঠে মা'কে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মা, কাল রাতে আমাদের গ্রামে কি কেউ মারা গেছে?'

মা বিস্ময়ে ওর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'সেজান, তুই কীভাবে জানলি যে, কাল রাতে গ্রামে কেউ মারা গেছে? তুই তো এইমাত্র ঘুম থেকে উঠলি!'

'না, মানে; কাল রাতে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি তো তাই।' আমতা আমতা করে মিথ্যে কথাটা বলল সে তার মাকে।

'হ্যাঁ, আমাদের দুই-তিন বাড়ি পরে একলা ভিটায় যে বুড়িটা থাকত, সে কাল রাতে মারা গেছে।'

মায়ের কথাটা শুনে ভয়ে, বিস্ময়ে ও ওখানেই ধপাস্ করে পড়ে

অজ্ঞান হয়ে গেল।

তিন

একবার। দু'বার। তিনবার। মধ্যরাত্রির সুনসান নীরবতা চিরে অনেক দিন...অনেক দিন পর অচেনা পাখি (?)-র ভয়ংকর ডাকটা শুনতে পেল সেজান আবারও।

এবং বুঝতে পারল, ওই ডাকের সাথে সাথেই জারী হয়ে গেল কারও মৃত্যু পরোয়ানা!

রুবেল কান্তি নাথ

রহস্যময় অন্তর্ধান

এক

মজিদপুর, নীলফামারি জেলার এক শহর, আসলে শহর না বলে গ্রাম বলাই ভাল। এখানকার চেয়ারম্যানের নাম রহমতউল্লাহ খান। ভদ্রলোকের বয়স পঁয়ত্রিশ। বড়ই সজ্জন ব্যক্তি। আশপাশের পাঁচ গ্রামের মানুষ সততার জন্য তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করে। মানুষের আপদ বিপদে সর্বাগ্রে তিনি পাশে দাঁড়ান।

গরমকালের এক সন্ধ্যায় নিজের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে তিনি বিশ্রাম করছিলেন। ঘরটা সুন্দর করে সাজানো। বৈঠকখানার জানালার পাশে, গদিমোড়া চেয়ারে রহমত সাহেব বসে ঝিমুচ্ছেন। ঘরের অন্য পাশে একখানা খাটিয়ার ওপর তাঁর দাদী বসে কোরান পড়ছেন। বৃদ্ধার বয়স আশির ওপরে। ঘরের আরেক দিকে রহমত সাহেবের স্ত্রী মরিয়ম, বাচ্চাদের পড়াচ্ছেন। বৈঠকখানার দরজার পাশে একটা টুলের ওপর বয়স্ক এক চাকর মনিবের আদেশের অপেক্ষায় বসে আছে। এসব দেখে সুখী পরিবারের চমৎকার একটা ছবি পাওয়া যায়।

বৈঠকখানার দেয়ালে ঝোলানো বড় ঘড়িটায় ঢং ঢং করে রাত নয়টা বাজল। রহমত সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর টুপি আর লাঠি হাতে করে দরজার দিকে এগুলেন।

তাঁর স্ত্রী মরিয়ম বলল, 'বাইরে যাচ্ছেন? একটু দাঁড়ান, আমি টর্চ লাইটটা নিয়ে আসছি।'

রহমত সাহেব স্ত্রীর কথায় কান দিলেন না। দ্রুত সদর দরজা খুলে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়লেন।

দাদী কোরান তেলাওয়াত থামিয়ে কাঁপা কাঁপা স্বরে জিজ্ঞেস

করলেন, 'এত রাতে রহমত কোথায় গেল?'

'উনি তো বলেছিলেন আজ রাতে বেরুবেন না,' মরিয়ম বলল। 'মনে হয় কোন বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছেন। এক্ষুনি এসে পড়বেন। চিন্তা করবেন না।'

ছেলে মারা যাবার পর নাতিটিকে নিয়ে বড় বেশি দুশ্চিন্তা করেন এই বৃদ্ধা। মাথা নাড়িয়ে আবার কোরান তেলাওয়াত করতে লাগলেন।

রাত দশটা বাজল। রাতের খাবারের সময় হলো। কিন্তু রহমত সাহেব ফিরে এলেন না। আশ্চর্যের ব্যাপার! কারণ যত কাজই থাকুক প্রতিদিন রাত দশটায় পরিবারের সবাইকে নিয়ে রহমত সাহেব এক সাথে খাওয়া-দাওয়া করেন। কখনও এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি । সবাই খেতে বসল। ভাবছে, এখুনি হয়তো রহমত সাহেব ফিরে আসবেন। কিন্তু সবার খাওয়া শেষ হলো, রহমত সাহেব ফিরলেন না। চিন্তায় পড়ে গেল সবাই।

রহমত সাহেবের সকল বন্ধুর বাড়িতে পাঠানো হলো চাকরদের। অনেকক্ষণ পর তারা ফিরে এসে জানাল উনি কোনও বন্ধুর বাড়িতে যাননি।

বুড়ো দাদী মুখ গম্ভীর করে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'আমার শরীরের যা অবস্থা–কখন মরে যাই ঠিক নেই। মরণের সময় যদি রহমতকে দেখতে না পাই, তবে মরেও শান্তি পাব না।'

'এরকম অলক্ষুণে কথা বলবেন না, দাদীমা,' মরিয়ম বলল। 'উনি এখুনি হয়তো ফিরে আসবেন। চিন্তা করবেন না।'

দাদীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য একথা বললেও মরিয়ম নিজেও মনে মনে ভয় পাচ্ছে। তার স্বামী অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ মানুষ। নিয়ম ভঙ্গ তিনি খুবই অপছন্দ করেন। কিন্তু আজ তিনি নিজেই নিয়ম মানছেন না! কী ব্যাপার?

মরিয়ম শোবার ঘরে দাদীকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল। ছেলে-মেয়েরাও যার যার বিছানায় শুয়ে পড়ল। শুধু স্বামীর অপেক্ষায় মরিয়মই সারা রাত জেগে রইল।

ঢং ঢং...। বৈঠকখানার ঘড়িতে বারোটা বাজার শব্দ হলো। চারদিক

নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে পাহারাদারের হাঁক ভেসে আসছে। মরিয়ম শোবার ঘর থেকে বৈঠকখানার জানালার পাশে এসে [illegible]। অজানা এক আশঙ্কায় মরিয়মের মন ছেয়ে গেল। ভাবতে লাগল, কোনও কথা না বলে, কিছু না জানিয়ে তার স্বামী কখনও গভীর রাত পর্যন্ত বাইরে থাকেননি। উনি বলেছিলেন আজ রাতে আর বাইরে যাবেন না। কিন্তু হঠাৎ মত পরিবর্তন করেছেন? কেন? নিশ্চয়ই কোনও জরুরি কাজ আছে। কিন্তু! তা হলে ওকে কিছু বলে গেলেন না কেন?

হঠাৎ বিদ্যুচ্চমকের মত একটা কথা মরিয়মের মনে পড়ল। তার স্বামী এখানকার চেয়ারম্যান, তাঁর অনেক শক্র থাকতে পারে। তা হলে কি শক্ররাই তাঁকে...? কিন্তু, তা কেন হবে! তার স্বামী খুব সৎ মানুষ। গ্রামের সবাই তাঁকে পছন্দ করে। সবারই বিপদে পাশে দাঁড়ান। এরকম লোকের শক্র থাকবে কেন?

একসময় পুব আকাশে লালের ছোপ লাগল। আস্তে আস্তে শিশু সূর্য উঁকি দিল। মরিয়ম ঘরের আলো নিভিয়ে দিল। দুশ্চিন্তা তার দু'চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। সারারাত জেগে সে ভীষণ ক্লান্ত।

ঘরের সবাই ঘুম থেকে উঠল। হাত-মুখ ধুয়ে নাস্তা খেতে বসল। পাশের ঘর থেকে শুকনো কাশির শব্দে বোঝা গেল, দাদীও জেগেছেন।

রাতে যে রহমত সাহেব ফিরে আসেননি, মরিয়ম কাউকে তা বলল না। সবাই ভাবল, নিশ্চয়ই অনেক রাতে বাসায় ফিরে তিনি এখন ঘুমাচ্ছেন।

কিন্তু একথা বেশিক্ষণ গোপন রাখা গেল না। রহমত সাহেব একজন চেয়ারম্যান, নানা লোক নানা কাজে প্রতিদিনই তাঁর কাছে আসে। শেষ পর্যন্ত মরিয়মকে আসল কথাটা বলতেই হলো। বিভিন্ন লোক মারফত গ্রামের প্রায় সবাই জেনে গেল, গতকাল রাত নয়টায় রহমত সাহেব বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেননি।

সারাটা দিন কেটে গেল। রহমত সাহেব এলেন না। চারদিকে অনেক খোঁজ করেও কেউ তাঁর কোনও হদিস করতে পারল না। এরইমধ্যে নানাজনে নানা কথা বলতে লাগল। কেউ কেউ বলল, তিনি জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছেন। কারণ, তাঁর টুপি আর লাঠি নদীর পাড়ে

পড়ে থাকতে দেখা গেছে। আবার অনেকে বলল, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁকে অপহরণের পর খুন করে লাশ গুম করে ফেলেছে। রাতে পাশের জঙ্গলে নাকি গুলির শব্দ শুনেছে কেউ কেউ।

এরকম নানা গুজব শুনে রহমত সাহেবের পরিবার দিশেহারা হয়ে পড়ল। বুড়ী দাদীকে প্রথমে এসব কথা জানানো হয়নি, কিন্তু পরে জানতে পেরে বিছানায় পড়লেন তিনি।

কয়েকটা মাস চলে গেল, রহমত সাহেব ফিরে এলেন না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়া হলো। আশপাশের প্রতিটি গ্রামে খোঁজ নেওয়া হলো। কিন্তু কেউ তাঁর কোনও খোঁজ দিতে পারল না। তিনি যেন হাওয়ায় মিশে গেছেন।

এভাবে সুদীর্ঘ তিন বছর কেটে গেল। রহমত সাহেব ফিরে আসেননি। ধীরে ধীরে তাঁর অন্তর্ধানের প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল। একমাত্র তাঁর পরিবার ছাড়া সবাই তাঁর কথা একেবারে ভুলে গেল।

দুই

তিন বছর পর। চতুর্থ বছর। গ্রীষ্মকাল। রাত দশটা। এক মধ্যবয়সী লোক রহমত সাহেবের বাড়ির সদর দরজায় টোকা দিল। লোকটার মাথায় টুপি, হাতে লাঠি–মলিন মুখ। দেখেই বোঝা যায়, অত্যন্ত ক্লান্ত সে। কিন্তু চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট।

বেশ কয়েকবার ডাকাডাকির পর দরজা খোলা হলো। এক চাকর দরজা খুলে কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কারে চাই?'

প্রশ্ন শুনে আগন্তুক অবাক হলো। যুবকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি? এ বাড়িতে তোমাকে ঢুকতে দিল কে?'

'কী কন? আমি তো এ-বাড়ির কামের পোলা ।'

'এ বাড়িতে কাজ করো! আমার বাড়িতে!'

'আপনের বাড়ি!' যুবক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুকের আপাদমস্তক দেখতে লাগল।

'মানে? এটা আমার বাড়ি নয়?'

'জ্বে, না।'

'তবে কার?'

'এইটা কদম ব্যাপারীর বাড়ি।'

'কোন্ কদম ব্যাপারী? গঞ্জে যার দুটো চালের আড়ত আছে?'

'হ।'

'তুমি কে?'

'আমি ওনার কর্মচারী।'

'আমাকে বোকা ভেবেছ? আমি বুঝি জানি না, কদম ব্যাপারী কোথায় থাকে।'

'ব্যাপারী সাব এ বাড়িতেই থাহে,' তরুণ কর্মচারী দৃঢ় কণ্ঠে বলল।

'আর আমি নিজের বাড়ি চিনব না?' আগন্তুক উপহাসের ভঙ্গিত বলল। 'তুমি আমাকে চেনো?'

'চেনার দরকার নাই। আপনে এবার যাইতে পারেন।' তরুণ দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করল।

'সরো!' যুবককে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে, আগন্তুক বৈঠকখানায় ঢুকে পড়ল। কিন্তু বৈঠকখানার ভেতরে ঢুকে সে অবাক হয়ে গেল। ঘরের আসবাবপত্র, দেয়ালে ঝোলানো ছবি, সবই তার কাছে অপরিচিত মনে হচ্ছে। এ কোথায় এল সে? ছেলেটার কথাই কি ঠিক? এটা তার বাড়ি নয়?

কিন্তু এ ঘর থেকেই তো কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গিয়েছিল সে। তার দাদী, স্ত্রী আর সন্তানেরা তো এ ঘরেই ছিল। বৈঠকখানায় এখন তিনজন লোক বসে কথা বলছে। জানালার পাশে যে নরম গদিটায় ওর দাদী বসত, সেখানে এখন হোঁৎকা এক লোক বসে হুঁকো টানছে। হোঁৎকা লোকটাকে চিনতে পেরে আগন্তুক হতবাক। আরে, এ যে সত্যিই কদম ব্যাপারী!

বিস্মিত হয়ে চারদিকে দৃষ্টি বোলাতে লাগল আগন্তুক। মাত্র ঘণ্টা খানেক আগে এ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল সে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এরকম পরিবর্তন হয় কীভাবে? আগন্তুক ভাবছে, সে কি জেগে

থেকে দুঃস্বপ্ন দেখছে?

'কদম ব্যাপারী, তুমি আমার বাড়িতে কেন?' আগন্তুক ক্রুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

বৈঠকখানায় বসা তিনজন এইমাত্র আগন্তুকের উপস্থিতি টের পেল। কদম ব্যাপারী বিস্ময়ে আঁতকে উঠে বলল, 'ওরে আল্লা, চেয়ারম্যান সাহেব, আপনি? এতদিন কোথায় ছিলেন?'

তিন

আস্তে আস্তে পুরো গ্রাম জেনে গেল রহমত চেয়ারম্যান ফিরে এসেছেন। স্বামীকে ফিরে পেয়ে মরিয়ম আর তার সন্তানেরা খুব খুশি। তিন বছর ধরে তারা অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছে। আর্থিক সংকটের জন্য নিজের বসত বাড়ি কদম ব্যাপারীর কাছে বিক্রি করে ভাড়া বাসায় উঠেছিল। কিন্তু স্বামীকে আদর-যত্ন করেও শেষ পর্যন্ত কাছে রাখতে পারল না মরিয়ম। কয়েক সপ্তাহ পর মারা গেলেন রহমত সাহেব।

কিন্তু মৃত্যুর আগে স্থানীয় মসজিদের ইমাম আর এলাকার বিশিষ্ট কয়েকজনকে ডেকে পাঠালেন। তাঁদের কাছে তিনি এক বিচিত্র কাহিনি বললেন। রহমত সাহেবের অনুরোধে সেই কাহিনি লেখা হলো। লেখার শেষে সবাইকে সাক্ষি হিসেবে সই করতে অনুরোধ করলেন।

ওই পাণ্ডুলিপিটা আজও রহমত সাহেবের পরিবারের কাছে সযত্নে লালিত। সেই বিচিত্র কাহিনি তাঁর জবানীতে বলা হলো:

'আমি রহমতউল্লা খান, মজিদপুর গ্রামের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, স্থানীয় মসজিদের ইমাম আর গ্রামের গণ্যমান্য লোকদের উপস্থিতিতে আমার জীবনের ঘটে যাওয়া এক বিচিত্র ঘটনা উল্লেখ করছি।

'সেদিন ছিল শুক্রবার। আমি বৈঠকখানায় বসেছিলাম। রাত তখন প্রায় নয়টা। আমার দাদী কোরান তেলাওয়াত করছিলেন, আমার স্ত্রী মরিয়ম, বাচ্চাদের পড়াচ্ছিল। সবকিছু স্বাভাবিক ছিল। বৈঠকখানার ঘড়িতে নয়টা বাজার ঘণ্টা পড়ল। এই সময় সদর দরজায় করাঘাতের

শব্দ শুনতে পেলাম। একটু বিরক্ত বোধ করলাম। চেয়ারম্যান হবার এই এক জ্বালা। রাত নেই, দিন নেই, লোকজনের আনাগোনা লেগেই আছে। একটু বিশ্রাম নেবারও ফুরসত নেই।

'সদর দরজায় আবার ধাক্কার শব্দ শোনা গেল। ভাবলাম, বৈঠকখানার সামনে বসা চাকরটা দরজা খুলে কে এসেছে দেখে আমাকে জানাবে। কিন্তু ক্রমাগত দরজা ধাক্কানোর শব্দ হচ্ছে, কিন্তু কেউই খুলছে না। আমি অবাক হলাম। এসময় কে যেন আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'ওঠ। টুপি আর লাঠি নিয়ে বেরিয়ে আয়।' চমকে উঠলাম। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। কে বলল এ কথা! কিন্তু বারবার আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল একটা কথা—বেরোও, বেরোও। আমি আর বসে থাকতে পারলাম না। এক অদৃশ্য শক্তির তাড়নায় আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, কে যেন আমার হাতে টুপি আর লাঠি ধরিয়ে দিল। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসলাম। এসময় আমার স্ত্রী আমাকে বোধহয় কিছু বলেছিল। আমি ওর কোনও কথা শুনতে পাইনি।

'সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে দেখলাম, একটু সামনে, রাস্তার অন্ধকার এক কোণে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার শরীর থেকে অস্পষ্ট নীলাভ দ্যুতি বেরুচ্ছিল। সে এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল।

'আমি কাছে যেতেই সে বলল, "আমার সাথে আসুন।" লোকটাকে আমি চিনি না। কিন্তু বাড়ি থেকে বের হবার পর আমার ইচ্ছা শক্তি যেন সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গিয়েছিল। কোথায়, কেন, কার সঙ্গে যাচ্ছি, জানি না। একটা ঘোরের মধ্যে আমি লোকটার পেছন পেছন যাচ্ছিলাম।

'অনেকক্ষণ যাবার পর একটা সরু নদীর পাড়ে এসে পড়লাম। নদীর পানির রঙ গাঢ় কালো। এত কালো রঙের পানি আমি আগে কখনও দেখিনি। নদী পার হবার জন্য দুটি সরু হালকা তক্তা ছিল। আমার পথ প্রদর্শনকারী রহস্যময় আগন্তুক স্বচ্ছন্দে তক্তার ওপর দিয়ে নদী পার হলো। এক অদৃশ্য টানে আমিও তক্তার ওপরে উঠলাম। আমার ভয় করছিল, মনে হচ্ছিল দেহের ভারে এখনি হালকা তক্তা ভেঙে পড়বে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভালভাবেই নদী পার হলাম।

'নদীর ওপাড়ে পৌঁছে মনে হলো, এক তেপান্তরের মাঠে এসে

পড়েছি। চারপাশে ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট, গাছপালা কিছুই নেই। মাঠের মধ্যে পোড়া ঘাসের গোড়া। এই মাঠে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় আমার ঘোর কিছুটা কাটল। রহস্যময় আগন্তুককে জিজ্ঞেস করলাম, "আমরা কোথায় যাচ্ছি?" কোন উত্তর পেলাম না।

' "আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

'এবারও কোনও উত্তর না দিয়ে আগন্তুক আমাকে অনুসরণ করার ইঙ্গিত দিল। আবারও আমি তার পিছন পিছন হাঁটতে লাগলাম।

'আস্তে আস্তে ঘন কুয়াশা আমাদের চারপাশ ঘিরে ফেলল। চারদিক দেখে মনে হচ্ছিল, আমরা যেন এক ভিন্ন জগতে এসে পড়েছি। রহস্যময় আগন্তুক আর আমি ছাড়া এই জগতে আর কেউ নেই। সর্বত্র কবরের মত নিস্তব্ধতা। মাঝে মাঝে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। ঠাণ্ডা বাতাসে আমার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছিল। বাতাসে ছিল অদ্ভুত এক দুর্গন্ধ।

'এরকম পরিবেশে অনেকক্ষণ চলার পর আমরা একটা বিশাল কুঠিবাড়ির সামনে এসে থামলাম। কুয়াশা একটু পাতলা হয়ে এসেছে। বিশাল কুঠির পাশে আর কোনও বাড়ি দেখতে পেলাম না। বাড়ির বড় বড় জানালাগুলো দিয়ে আলো বাইরে এসে পড়েছে।

'এত বড় বাড়িটা কার? মজিদপুরের আশপাশে এরকম কুঠিবাড়ি আছে বলে তো শুনিনি।

'আগন্তুক আমাকে কুঠিবাড়িতে ঢোকার জন্য ইঙ্গিত করল। আমি বললাম, "এ বাড়ির মালিক কে? যে-ই হোক তাকে তো আমি চিনি না। তা হলে অপরিচিত লোকের বাড়িতে ঢুকব কেন?"

' "এজন্য আপনি কোনও চিন্তা করবেন না," রহস্যময় লোকটা গম্ভীর কণ্ঠে বলল। "কিন্তু একটা বিষয়ে সাবধান করছি, এ বাড়ির ভেতরে যা কিছুই দেখবেন, সে ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন করতে পারবেন না। যদি প্রাণ নিয়ে ফেরার ইচ্ছা থাকে, তবে নীরবে সবকিছু দেখে যাবেন।"

'আমরা বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। অনেকগুলো মোমবাতির আলোয় আলোকিত ঘর। ভেতরে জমকালো পোশাক পরে বেশ কয়েকজন

ইংরেজ পুরুষ আর মহিলা বসে গল্প-গুজব করছেন। আমরা ঢোকা মাত্র তাঁরা আমাদের দিকে তাকালেন, কিন্তু কোন কথা বললেন না। আগন্তুক আমাকে তাঁদের দিকে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত করে নিজে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। ইতস্তত করে আমি এগিয়ে গেলাম। কিন্তু ওঁরা নিজেদের নিয়ে এতই ব্যস্ত যে আমার দিকে তাকালেন না পর্যন্ত।

'আমি ওদের ভালভাবে লক্ষ করার সুযোগ পেলাম। কী আশ্চর্য, প্রত্যেক নারীর গলার চারপাশে লাল দড়ির মত একটা চিহ্ন আছে। পুরুষদের দিকে তাকালাম, তাদের পরনে উঁচু গলার কোট। কিন্তু তার ওপরেই লাল দড়ির ছাপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এর কোনও মানেই বুঝতে পারলাম না।

'আরেকটা ব্যাপার দেখে আরও চমকে উঠলাম। আমার সামনে কয়েকজন পুরুষ তাস খেলছে। কিন্তু যে তাসগুলো নিয়ে তারা খেলছে, সেগুলো থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে।

'প্রচণ্ড ভয় পেলাম। ভাবলাম, এ কোথায় এসেছি?

'পাশের ঘরে ঢুকলাম। এ ঘরটাও চমৎকার করে সাজানো। জানালায় লাল ভেলভেটের পর্দা, মেঝেতে দামী কার্পেট। ঘরের মাঝখানে কারুকাজ করা প্রকাণ্ড সোফা। তাতে অভিজাত চেহারার এক ইংরেজ ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু ঘরের মেঝেতে চোখ পড়তেই আঁতকে উঠলাম, আমার বুকের ভেতর থেকে হৃদপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল।

'রক্ত! মেঝেতে রক্তের স্রোত বইছে। এই স্রোত প্রথমে যে ঘরে ঢুকেছিলাম সেদিকেই বয়ে যাচ্ছে। আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে আমি পাশের ঘরে চলে এলাম। কিন্তু অবাক কাণ্ড! একজন মানুষও এ ঘরে নেই! কয়েক মুহূর্ত আগেও তো এখানে অনেক লোক ছিল। গেল কোথায়?

'হঠাৎ ঘরের উজ্জ্বল আলো ম্লান হয়ে গেল, ভেসে এল চমৎকার গানের সুর। কিন্তু কোনও মানুষজনকে দেখতে পেলাম না। কী করব বুঝতে না পেরে এ ঘর ছেড়ে আবার পাশের ঘরে যেতে চাইলাম, পারলাম না। দরজা বন্ধ। ধাক্কা দিলাম, দরজা খুলল না। দরজার বুকে লাল রঙে ফুটে উঠল চারটা সংখ্যা: ১৭৯৫।

'এর কোনও অর্থ বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ প্রচণ্ড ক্লান্তি লাগল। ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে এল। সামনে একটা নরম গদির সোফা দেখে তাতে বসলাম। গা এলিয়ে দিতেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

'কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না, প্রচণ্ড চিৎকারের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম অনেক রাত হয়ে গেছে। বাড়ির কথা মনে পড়ল। নিশ্চয় সবাই আমার জন্য চিন্তা করছে। কিন্তু এখান থেকে যাব কী করে? এই জায়গা তো আমার অচেনা। আমার বাড়ি থেকে এ জায়গাটা কত দূরে কে জানে? তা ছাড়া রহস্যময় সেই আগন্তুকই বা কোথায়? চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দ বেড়েই চলেছে। মনে হচ্ছে বাইরে থেকে কোনও ডাকাতদল বুঝি হামলা করেছে। আমি সেই আগন্তুকের খোঁজে এঘর ওঘর ঘুরতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত তাকে পেলাম। সে ঠিক একইভাবে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখতে পেয়ে তার কাছে যেতে ইঙ্গিত করল। তার কাছে গেলে, আমাকে নিয়ে সে কুঠিবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসল।

'আবারও আমরা সেই কুয়াশাচ্ছন্ন তেপান্তরের মাঠে হাঁটতে লাগলাম। অনেকক্ষণ হাঁটার পর আগন্তুক আমাকে বলল, "এবার আপনি নিজেই যেতে পারবেন।" দেখলাম, আমি আমার বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছি। রহস্যময় আগন্তুক আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল। তার পরিচয় জানতে পারলাম না।

'অত্যন্ত ক্লান্ত, ভীত আর অবসন্ন মনে, আমি টলতে টলতে বাড়ির দিকে এগুলাম। বার বার মনে হচ্ছিল, রাস্তায় বুঝি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব। তবে বাড়ির সদর দরজা পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছিলাম। আর বাকীটুকু তো আপনারাই জানেন।

'এই হলো আমার জীবনের বিচিত্র কাহিনি। আপনারা বলছেন আমি তিন বছর পর বাড়িতে ফিরে এসেছি কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে এক ঘণ্টা। আপনারা আমার এই কাহিনি বিশ্বাস করবেন কি না জানি না। কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র নামে কসম খেয়ে বলছি, যে ঘটনার বিবরণ আমি দিলাম, তার প্রতিটা কথা সত্যি। এর মধ্যে এক বিন্দুও মিথ্যা নেই।'

রহমতউল্লাহ খানের রহস্যময় অন্তর্ধানের কাহিনি এখানেই শেষ।

পরিশিষ্ট

রহমত সাহেবের জীবনে যা ঘটেছিল তার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া না গেলেও, ওই কুঠিবাড়ি সম্পর্কে একটা জনশ্রুতি রয়েছে।

মজিদপুর থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে সপ্তদশ শতকে ইংরেজরা সত্যিই নাকি এক বিশাল কুঠি তৈরি করেছিল। সেসময় এখানে নীল চাষ হত। এজন্য ইংরেজরা অত্যাচার করে স্থানীয় কৃষকদের জীবন বিষিয়ে তুলেছিল। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কৃষকেরা একদিন দল বেঁধে ওই কুঠিতে ঢুকে সেখানকার সবাইকে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করে। তারপর সেই কুঠি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়।

তবে কি রহমত সাহেব সেই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন? সেই রহস্যময় আগন্তুকই বা কে? তিনি কি কালপুরুষ?

এসব প্রশ্নের উত্তর নেই। এই পৃথিবীতে কত রহস্যময় ঘটনাই তো ঘটে, তার সবগুলোর ব্যাখ্যা কি আমরা জানি?

[বিদেশি গল্পের ছায়া অবলম্বনে]

তারক রায়

অতৃপ্ত আত্মা

ঘটনাটি পুরানো হলেও আজও আমার মনে দাগ কেটে আছে। আমি তখন প্রাইমারীতে পড়ি। বরিশাল শহরে হাতে গোণা কয়েকটা বাড়ি। আর প্রায় সব বিল্ডিংগুলো জোড়া বাঁধা। দেখতে একই রকম। আমাদের দোতলা বিল্ডিংটি, দক্ষিণ পাশে এমনি আরও একটি বিল্ডিং সাথে নিয়ে শহরের মধ্যভাগে অবস্থিত। ডিজাইনের দিক থেকে ওই বাড়িটির চাইতে আমাদের বিল্ডিংটি ত্রুটিমুক্ত আর আধুনিকতার বেশ ছাপ বহন করে। যদিও আমাদের বিল্ডিংটি জনৈক উকিল বাবুর কাছ থেকে কেনা। আমরা বাড়িটিতে ওঠার পর থেকে দেখে আসছি দক্ষিণ পাশের বিল্ডিংটিতে বিরাট একটা তালা ঝুলানো আছে, বাড়ির মালিক ভারত চলে যাওয়ায় কোন মানুষ-জন থাকছে না বাড়িটিতে। অনেকটা পরিত্যক্ত। তবে মতিলাল নামে ওই বাড়ির এক পুরানো চৌকিদার নিচু তলার উত্তর দিকে একটা হালকা ডেরা দিয়ে একাই থাকছে। তার নাকি কোন ভয়-ডর নেই।

এলাকার লোকজন বাড়িটিকে ভূতের বাড়ি বলে আসছে অনেক কারণে। ওই বাড়িটিতে অনেক রকম অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা একটার পর একটা ঘটে যাচ্ছে, তাই সব মিলিয়ে লোকজন পারতপক্ষে বিল্ডিংটির আশপাশে ঘেঁষে না। আমরা ছোটরাও কখনও বিল্ডিংটির কাছে যাই না। বলটা ভিতরে গেলেও ফেরত আনার চেষ্টাটি করি না।

আমাদের বিল্ডিংটির ঠিক লাগোয়া উত্তরদিকের বাড়িটি আমাদের সাবেক বাড়ি। একটি উঠনের চারদিকে নকশা করা টিনের ঘর। চারদিক ফুলের গাছ, পিছনে ফলের বাগান। ওই ঘরগুলোর একটিতে আমাদের ছোট চাচী ও তাঁর পরিবারের সকলে মিলে থাকেন।

চাচী একদিন খুব সকালে আমার আম্মার নাম ধরে ডেকে ডেকে

দোতলার সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে আসতে, আমাদের সকালের ঘুম ভেঙে গেল। চাচী হাঁপাতে হাঁপাতে, ঢকঢক করে দু'গ্লাস পানি খেয়ে ফেললেন। আমরা তাকিয়ে দেখছিলাম চাচীর চোখ দুটো বিস্ফারিত, ভয়ে কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেছেন।

চাচী নিজের থেকে বলে যাচ্ছেন, 'না দেখলে বিশ্বাস হত না। না দেখলে বিশ্বাস হত না কী দেখলাম! আমি কী দেখলাম!' বলে বিলাপ করতে থাকলেন।

আমরা যত জিজ্ঞেস করছি, 'চাচী, কী দেখেছেন?' চাচী শুধু বিলাপ করেই যাচ্ছেন।

আম্মা বারবার জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে কী হয়েছে। কিন্তু তিনি আসল কথাই বলছেন না শুধু বিলাপ করেই যাচ্ছেন।

এক সময় চাচী মুখ খুললেন।

তিনি বলতে লাগলেন, 'আমি ফজরের নামাজ শেষে হেঁটে উঠনের কোনার শেফালী গাছটার কাছে আসতে দেখলাম, লাল শাড়ি পরা কে যেন মাটি থেকে শেফালী ফুল টোকরে ভরছে। আমি চিন্তা করছিলাম কে, এত শীতের সাতসকালে ফুল নিতে এসেছে। আমি তাকে ডাক দিলাম, "কে বউ, কে তুমি, বাড়ির মধ্যে ঢুকেছ?" সে আমার কথায় কোন উত্তরই দিচ্ছে না।

'এতবড় ঘোমটার মধ্য থেকে বোঝা যাচ্ছিল চুলগুলো ফুলে আছে। আর এর একটা গোছা মাটিতে লুটাচ্ছে। আমি পা-পা করে এগুতে সেও উল্টোমুখ করে হেঁটে যেতে লাগল, আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে।

'আমিও নাছোড়বান্দা, বউটি তোমাদের বিল্ডিং-এর পিছন দিকে যেতে আমিও ওর পিছু নিলাম। বউটি একটিবারের জন্যও পিছন ফিরল না, শুধু হেঁটেই যাচ্ছে। আমিও একটু দূরত্ব রেখে হাঁটছি।

'বউটি তোমাদের বিল্ডিং থেকে আরও একটু এগিয়ে এসে পাশের বাড়িটির ওয়ালের সাথে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল! আর আমি হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে থাকলাম, এটা কী হলো! অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ আমার সম্বিত ফিরে পেতে, একদৌড়ে তোমাদের দোতলায় উঠে এসেছি।'

আম্মা সব শুনে ঠাণ্ডা মাথায় বলল, 'আজগুবি, হতেই পারে না। মানুষ কখনও ওয়ালের সাথে মিলে যেতে পারে?'

আমার আম্মা খুব সাহসী। সে কখনও ভূতটুত বিশ্বাস করে না। বলল, 'ও বাড়িটার একটু বদনাম আছে। মানুষ থাকে না, তাই বলে ভূত আসবে কোথা থেকে? আমার মনে হয় না এ রকম কিছু আছে। আপনি ভুল কিছু দেখেছেন।'

চাচী তো রেগে আগুন, 'তুমি কী বলছ? আমি ভুল দেখেছি! আমার কথা বিশ্বাস হয় না?'

রেগে কী যেন বলতে বলতে তিনি চলে গেলেন তাঁদের ঘরে।

চাচী চলে যেতে, আম্মা মুচকি হেসে আমার মেঝ খালাকে একটু নিচু গলায় বললেন, 'আসলে কী,' আম্মা তার কথা থামিয়ে আমাদের ছোটদের দিকে তাকিয়ে, 'কীরে, হাঁ করে কথা গিলতে বসেছিস? এই, তোরা এখানে বসে আছিস কেন! যা হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বস গিয়ে।'

আমি যাই যাচ্ছি ভান করে অপেক্ষা করে যেতে যেতে শুনলাম, আম্মা মেঝ খালাকে বলছে, 'আসলে আমিও অনেক কিছু দেখেছি, বাচ্চারা ভয় পাবে বলে কিছু বলিনি। আপাকে রাগিয়ে দিলাম এজন্যে যে, তার মন থেকে আপাতত ভূতের ভয়টা চলে গিয়ে আমার উপর রাগ করে থাকুক, এটাই আমি চাচ্ছিলাম। পরে গিয়ে তার রাগ ভাঙিয়ে আসবক্ষণ।'

আম্মার শেষ কথাগুলো বারবার আমার কানে বাজছিল, 'আমিও অনেক কিছু দেখেছি।'

কথা ক'টি আমার মনে রেকর্ডের মত বাজছিল আর ওই বিশেষ জায়গায় ভাঙা রেকর্ডের মত বার বার বেধে বেধে যাচ্ছিল।

ভূত মানেই অশরীরী কিছু, ভয়ানক কোন বস্তু। ছায়ার মত পিছনে পিছনে থাকে, দেখা যায় না, শুনলেই আতংকিত হতে হয়। ভূতেদের অনেক বদনাম আছে, সুযোগ পেলেই ঘাড় মটকে খেয়ে ফেলে। মানুষদের ভয় দেখানোই প্রধান কাজ। আমার এতটুকু শখ নেই ভূত দেখার। তবে চোখ কান ওই বাড়িটির প্রতি সজাগ থাকল।

সন্ধ্যা হতেই আঁধার নেমে আসে আর সেই অন্ধকারে বাতিহীন

বাড়িটি আরও ভৌতিক মনে হয়। মনে হয় কারা যেন বাড়িটির চিলেকোঠায় হারমোনিয়াম, ঘুঙুর বাজিয়ে নাচছে, গাইছে, হাসছে-কাঁদছে।

এ হাসি-কান্নার শব্দ এলাকার প্রায় সবাই শুনে আসছে, তাই এ যেন সকলের গা সওয়া হয়ে গেছে।

সন্ধ্যা হলে আমাদের ছাদে যাওয়া নিষেধ।

একদিন সকালে ও বাড়ির চৌকিদার মতিলালকে আধমরা অবস্থায় পাওয়া গেল বারান্দার মাটিতে। মারের দাগগুলো মতিলালের ফর্সা শরীরে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মতিলাল তিনদিন সদর হসপিটালে ছিল। ভাল হয়ে আমাদের বাসায় এসে অজানা কিছু ঘটনা আম্মার কাছে বলতে, আমরাও শুনলাম। বাড়ির মালিক যখন বাড়িটি ছেড়ে যাচ্ছিল, তার কিছুদিন আগে কর্তার ছেলের বউ চিলেকোঠায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। বউটির সাথে কর্তা আর গিন্নীমার কোন বনিবনা ছিল না। আর বউটির স্বামীর সাথেও খটনট বেধেই থাকত। লাশের কাছে যেন কেউ না ভেড়ে সেই ফন্দি করে কর্তাবাবু আর গিন্নীমা সবাইকে বলে বেড়িয়েছিল কলেরায় মরে গিয়েছে।

মতিলালের বাড়ি উড়িষ্যায়। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পরে যে আকাল হয়েছিল, তখন কর্তা তাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে এদেশে। মতিলাল হঠাৎ কেমন স্বরে বলতে লাগল, 'তারা চলে গেলেও মায়ায় ছেলাম গো, মায়ায় এ বাড়িতে ছেলাম,' বলে ঝরঝরিয়ে কাঁদতে লাগল।

আম্মা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'তুমি থাকবে আমাদের সাথে এ বাসায়?' মতিলাল উত্তর না দিয়ে চোখদুটি বড় বড় করে শুধু তাকিয়েই থাকল।

মতিলাল এরপর কোথায় যে চলে গিয়েছে, কেউ তার মুখটি আর দেখেনি।

আকাশের চাঁদটি মেঘের আড়ালে গেলেই বাড়িটির চারধারে যেন মনে হয় ভৌতিক ছায়া খেলা করছে। সেই সাথে ভ্রাম্যমাণ কুকুরের করুণ সুরে দীর্ঘ ভেউ-ওওওওও করে ডাক আরও ভয়ের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। মনে হয় অশরীরী কোন দুরাত্মার ছায়া বাড়িটির আঙিনায় আর

বেওয়ারিশ কুকুরগুলো সেই ছায়া দেখে ভয়ার্ত স্বরে ডাকছে।

অন্ধকার রাতের চেয়ে ভরা পূর্ণিমার রাত আরও ভীতিকর মনে হয়।

বাড়িটিকে ঘিরে আমাদের সব সময় কেমন যেন একটা উৎকণ্ঠা-আতঙ্ক। চাঁদের আলোয় পেঁচাটি কর্কশ ডাক দিয়ে উড়ে গেলে, বাদুড় ডেকে গেলে আমাদের মনে নানা প্রশ্ন উদয় হতে থাকে। এ আবার কীসের আলামত?

আরও একদিন বিকেল শেষে পশ্চিম আকাশ লাল হতেই চারদিকে আঁধার একটু একটু নেমে এল। কুয়াশা কেমন যেন সন্ধ্যার আগেভাগেই পড়তে শুরু করেছে। আম্মা আমি আর আমার ছোট বোনটি আমাদের ব্যালকনিতে বসে বাদাম, কাবুলিবুট খাচ্ছি। হঠাৎ ছোট বোনটি দশ হাত দূরের পাশের বিল্ডিং-এর ব্যালকনির দিকে তাকিয়ে, 'বউ বউ' করে ডাকতে লাগল। আমিও তাকিয়ে দেখলাম সত্যি তো মোড়ায় বউ বসে আছে। লাল শাড়ি, আলতা পায়ে রুপোর ঘুঙুর, চুলগুলো পিঠের উপর ছড়ানো। আমি আম্মার পা ধরে নাড়া দিয়ে তাঁর দৃষ্টি ওদিকে ফিরাতে বলতেই, আম্মা মুহূর্তে ছোট বোনটাকে কোলে নিয়ে দোয়া কলেমা বলতে লাগল। আর আমার মুখ জোর করে ফেরাতে চেষ্টা করল। আমি কিন্তু জোর করে মুখ ফিরিয়ে বউটিকে দেখছি। আমাদের এ কাণ্ডকারখানাতে বউটির যেন কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। এবার আম্মা জোরে জোরে দোয়া পড়তে লাগল। আম্মার এ অবস্থা দেখে আমি বেশ কৌতূহলী হয়ে বউটিকে দেখছি। ঠিক সে মুহূর্তে মসজিদে মাগরিবের আযান দিতেই বউটি মোড়া থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে এক ঝলক তাকাতেই আমি স্পষ্ট দেখলাম, ওর মুখে কোন মাংস নেই, দাঁতগুলো বেরিয়ে এসেছে। কী বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে! মুহূর্তের জন্য আমি ওর চেহারা দেখেই একটা চিৎকার দিলাম। এরপর আমি আমাকে বিছানায় পেয়েছি। কখন বিছানায় এসেছি জানি না। অনেক লোকের কথা শুনে চোখ খুলে দেখলাম, তেতো ওষুধের শিশি হাতে খোরশেদ ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই আমি বলতে লাগলাম, 'আমি কোথায়, কখন এখানে এসেছি?'

আব্বা বললেন, 'তুমি বাসাতেই আছ।'

আব্বা-আম্মার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তারা উৎকণ্ঠিত। এ ঘটনার বেশ কিছু দিন পর একদিন সকালে দেখলাম অনেকগুলো লোক এসে ওই ভুতুড়ে বাড়িটিকে ধোয়া মোছা শুরু করে দিয়েছে। শুনতে পেলাম এক জজ সাহেব এখন থেকে এখানে থাকবেন। সরকারী বাড়ি, তাই সরকারী লোক থাকবে।

জজ সাহেব আর তাঁর মিসেস সময়মত বাড়িটিতে উঠলেন। চারদিক ঝকঝকে তকতকে। খানসামা, বাবুর্চি, পিয়ন, চাপরাসি, ঝাড়ুদার ঘুরছে ফিরছে।

এখন কোথায় ভূত? গেল কোথায় সেটা? সবার মনে স্বস্তি। বিশেষ করে আমাদের বাসার সবার। আমাদেরও আর মাথা ব্যথা নেই সে বিষয়ে।

আমাদের বেশ যাতায়াত হচ্ছে এ বাসায়। বিশেষ করে জজ সাহেবের মিসেস আমাকে ঢের স্নেহ করেন। ভাল কিছু রান্না হলে আমাকে খেতে ডাকেন। পুজোতে নাড়ু নিজ হাতে বানিয়ে খাইয়েছেন। আমাকে নাকি তাঁর ছোট ছেলেটির মত দেখতে, যে এখন পরলোকে। তাঁর বড় ছেলে থাকে অস্ট্রেলিয়া। সে আসছে শীতে বউ নিয়ে এ বাসাতে আসবে। ছেলে আসবে বলে, কাকীমা সব সময় ব্যস্ত থেকে শুধু দিন গুনছেন আর সুযোগ পেলেই আমাকে তাঁর বউ আর ছেলের গল্প শোনান।

একদিন সকালে কাকীমা তাঁদের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকছেন শুনে, বিছানা থেকে নেমে গেলাম জিজ্ঞেস করতে কেন ডাকছেন?

কাকীমা বললেন, 'জানো আমার ছেলে দেশে এসেছে বউ নিয়ে। দেখবে না, তোমার বৌদিকে?'

আমি বললাম, 'কই, কোথায়?'

কাকীমা ডাকতে লাগলেন, 'শিপ্রা, শিপ্রা, এদিকে একবার আসো তো।'

আমি অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকলাম–এতদিন যাদের গল্প শুনে এসেছি সেই শিপ্রা বৌদিকে দেখার জন্যে।

শিপ্রা বৌদি আমাদের বারান্দার পাশাপাশি ব্যালকনিতে আসতেই আমি তাকে একদৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম। কোথায় যেন তাকে আগে দেখেছি! হঠাৎই আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠল, সেই শাড়ি, সেই আঁচল, চুল, আলতা দেয়া পা, রুপোর ঘুঙুর। স্মৃতির সেই ভয়ঙ্কর মাংসবিহীন মুখ শিপ্রার মুখের উপর বসাতেই, ভয়ে রেলিং-এর হাতল ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে কিছুক্ষণ শক্ত হয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। শিপ্রা বৌদি খিলখিলিয়ে হেসে বললেন, 'কী হলো, ঠাকুর পো, লজ্জা লাগছে?' হাসিটাও যেন সেই গভীর রাতে শোনা হাসির মত। মাথাটা একটু উঁচু করে তাকাতেই দেখলাম, সেই পিশাচীর চেহারাটা সুস্পষ্ট। আমি কাউকে কিছু না বলে ঘরের দিকে দিলাম এক দৌড়। এরপর আমি কখনও ওদের সামনে যাইনি। শিপ্রা বৌদিরা এক সময় অস্ট্রেলিয়া ফিরে গিয়েছেন। কাকীমাদের সাথে আমার আর সখ্য রইল না। কাকীমারাও বদলী হয়ে চলে গেলেন কোথাও। তবে আজও সে বীভৎস, কুৎসিত চেহারা মনে পড়লে ভাবি, ভূতটার সাথে শিপ্রা বৌদির অবিকল মিল হলো কীভাবে?

মনোয়ার রহমান হারুন

ভুডু

সেদিন যদি বৃষ্টি না হত, এসব কিছুই ঘটত না। বেলাল চাচা বেঁচে থাকতেন আর আমার বোনেরও অমন দশা হত না।

চিলেকোঠায় হানা দেয়ার মতলব ছিল তিতলি আপুর। ওর বয়স পনেরো—আমার চেয়ে তিন বছরের বড়। আর আমি ওকে খুব ভয় পাই। ও যা বলে বিনাবাক্যব্যয়ে সব পালন করি।

'বেলাল চাচা কিংবা মলি চাচীকে একবার বলা উচিত ছিল না?' জিজ্ঞেস করলাম তিতলিকে।

'আরে গাধা ওরা কি বাসায় আছে নাকি যে অনুমতি চাইবি?' খেঁকিয়ে উঠল তিতলি আপু যেন পাঁচ বছরের একটা মেয়েকে চোখ রাঙাচ্ছে। বড় বোনদের নিয়ে এই-ই সমস্যা—তারা ভাবে তারা সবজান্তা, আসলে সব কিছু জানে না। 'চাচা-চাচী বাসায় থাকলেই কী না থাকলেই কী,' বলে চলল আপু। 'আমি যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি চিলেকোঠায় ঢুঁ দেব, দেবই। তোর ইচ্ছে হলে আসবি না হলে নাই।'

তিতলি আপুর সঙ্গে আমি পারতপক্ষে তর্ক করি না মার খাওয়ার ভয়ে। অবশ্য চিলেকোঠায় উঁকি দেয়ার ইচ্ছে আমারও কম নয়। বাবা-মা গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার পরে চাচা-চাচীর বাড়িতে এসেছি মাস ছয় হতে চলল। চিলেকোঠার ঘরটির প্রতি আমাদের দু'বোনেরই দুর্দমনীয় আকর্ষণ। কিন্তু ও ঘর দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত পড়ে আছে বলে ওখানে আমাদের যাওয়া বারণ। শহরের উপকণ্ঠে বেলাল চাচার এই বিশাল বাড়িটির বয়স নাকি প্রায় শতাব্দী ছুঁই ছুঁই। আমাদের জমিদার প্রপিতামহ এ বাড়ি বানিয়েছেন। বংশের শেষ প্রদীপ নিঃসন্তান বেলাল চাচা তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এ বাড়িতে এখন বাস করছেন। বাড়ির সামনে বিরাট একটি বাগানও আছে। তবে বর্ষা চলছে বলে আমরা বাগানে

তেমন খেলতে যাই না। আজ ছুটির দিন, চাচা-চাচী জরুরী কী একটা কাজে বাইরে গেছেন, অবসর কাটানোর মত তেমন কিছু নেই, তাই চিলেকোঠায় উঁকি দেয়ার পরিকল্পনা করেছে তিতলি আপু।

মই বেয়ে চিলেকোঠার ঘরে উঠে এল আপু, পেছন পেছন আমি। যেন আলাদিনের গুহায় ঢুকেছি। বড় বড় ট্রাংক, বাক্স, আসবাব। একটা মস্ত কাঠের সিন্দুকও আছে। ধুলো পুরু হয়ে জমে রয়েছে ওগুলোর ওপর। জিনিসগুলো দেখে প্রথম দিকে উত্তেজনা বোধ করলেও একটু পরেই হারিয়ে ফেললাম আগ্রহ। ভেবেছিলাম গুপ্তধন-টন পেয়ে যাব। জমিদার বাড়ির চিলেকোঠার ঘরে কাঠের সিন্দুকে গুপ্তধনের ম্যাপট্যাপ থাকে, গল্পে পড়েছি। কিন্তু এ ঘরের সিন্দুকে হাবিজাবি বোঝাই। আবর্জনার বর্ণনা দিয়ে আপনাদের মেজাজ খারাপ করতে চাই না। তবে আমার মেজাজ খারাপ হলো চিত্তাকর্ষক কিছু দেখতে না পেয়ে। আপুকে বললাম এই আধা-অন্ধকার, গুমোট ঘরে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি নীচে যাচ্ছি।

'দাঁড়া, এই ট্রাঙ্কটা একটু খুলে দেখি,' আমাকে বাধা দিল তিতলি আপু। পুরানো একটা ট্রাঙ্ক খুলছে ও। ট্রাঙ্কের মাথায় কালো, বড় বড় অক্ষরে লেখা J.C.

J.C মানে জামিল চৌধুরী। আমাদের বড় চাচা। আমাদের জন্মেরও আগে মারা গেছেন। আব্বার কাছে বড় চাচার অনেক গল্প শুনেছি। উনি ছিলেন বিশ্ব-পর্যটক। পৃথিবীর এমন দেশ নেই যেখানে ঘুরতে যাননি। শুনেছি বোর্নিওতে জাহাজ-ডুবি হয়ে মারা গেছেন জামিল চাচা। চাচার ট্রাঙ্কের ভেতরে হয়তো রহস্যময় কিছু পাওয়া যাবে ভেবে আমরা উৎসাহী হয়ে উঠলাম। কিন্তু পুরানো জামা-কাপড় আর ভ্রমণ সংক্রান্ত মোটামোটা ইংরেজি বই ছাড়া আর কিছু নেই। না, আছে। আপু কাপড়ের স্তূপের নীচ থেকে বের করে আনল জিনিসটা।

একটা পুতুল।

কাপড়ের পুরানো একটা পুতুল। ভুল বললাম কাপড় নয়, কতগুলো পালক দিয়ে বানানো হয়েছে পুতুলটাকে। গায়ে কাপড়ের পরিমাণ খুবই অল্প। চোখের জায়গায় সাদা বৃত্ত এঁকে কালো কালি দিয়ে চোখের মণি

ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কদাকার দেখতে।

'জানিস এটা কী?' জিজ্ঞেস করল তিতলি। ডানে-বামে মাথা নাড়লাম আমি। জানি না। 'এটা হলো ভুডু পুতুল।' বলে পুতুলটা আমার মুখের সামনে এনে 'হাউ' করে উঠল ও।

'ফাজলামি কোরো না তো!' মুখ সরিয়ে নিলাম আমি। 'ভুডু কী জিনিস?'

'কালো যাদু। ক্যারিবিয়ানের লোকজন ব্ল্যাক ম্যাজিক বা কালো যাদুর চর্চা করে। জামিল চাচা নিশ্চয় ওখানে গিয়েছিল। ভূতের ওঝারা এসব ভুডু পুতুলের গায়ে পিনের খোঁচা মেরে মানুষজনকে অসুস্থ বানিয়ে ফেলে। আরও কত কিছু করে!'

'তুমি এতসব জানলে কী করে?' ভুডু পুতুলের এত ক্ষমতা বিশ্বাস হতে চাইল না আমার।

'কেন, বইতে পড়েছি,' বলল তিতলি আপু। 'সেবা'র হরর লেখক অনীশ দাস অপুর ভুডুর ওপর একটা বই আছে। ওতে ভুডু নিয়ে বিস্তারিত সব লেখা আছে, ছবিসহ।'

তিতলি আপু হাতের পুতুলটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ওর চাউনিটা কেমন অদ্ভুত। আমার গা শিরশির করে উঠল।

আমার দিকে চোখ তুলে চাইল আপু। 'জানিস, ওই বইটা পড়ার পরে আমার বহুবার মনে সাধ জেগেছে। ইস, ওরকম একটা পুতুল যদি সত্যি পেতাম! স্বপ্নটা আজ পূরণ হলো।'

'লেখকরা বানিয়ে অনেক কিছু লেখে। তা কখনও সত্যি হয় নাকি?' ঠোঁট ওল্টালাম আমি।

'তুই ভুডু পুতুল সম্পর্কে কিছুই জানিস না। তাই গাধার মত কথা বলছিস,' দাবড়ি দিল আপু। 'ভুডু সত্যি নাকি মিথ্যা তার প্রমাণ তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

পুতুল নিয়ে নীচে নেমে এল তিতলি আপু। ওর পড়ার টেবিলের পিন কুশন থেকে একটা পিন নিল। বিড় বিড় করে বলল, 'এটা কার ওপর ব্যবহার করা যায় ভাবছি।' হঠাৎ চোখ পড়ল বুড়ো মালী বারেক দাদুর ওপর। শুনেছি এ বাড়িতে বহুদিন ধরে আছে মানুষটা। তার

একমাত্র কাজ বাগানের যত্ন নেয়া। মাঝে মধ্যে বাড়ির ফাইফরমাশও খাটে। তবে বেশিরভাগ সময় তাকে দেখি নাক ডেকে ভোঁসভোঁস করে ঘুমাচ্ছে। লোকটা অলস এবং ফাঁকিবাজ।

'বারেক দাদুকে দিয়েই এক্সপেরিমেণ্টটা হয়ে যাক!' উৎসাহী গলায় বলল তিতলি আপু।

বুড়ো লোকটাকে আমার তেমন পছন্দ হয় না। কাজেই তাকে দিয়ে আপু ভুডু এক্সপেরিমেণ্ট করবে শুনে আমি সোৎসাহে আপুর কথায় সায় দিলাম। তা ছাড়া সত্যি এতে কাজ হয় কিনা দেখার কৌতূহলও হচ্ছিল বেশ।

বারেক দাদু বারান্দার কাঠের টুলে বসে ঝিমোচ্ছিল। তিতলি আপু বলল, 'আমাদের শুধু যা করতে হবে তা হলো এ পুতুলটাকে ভাবতে হবে বারেক দাদু।' পণ্ডিতি ভঙ্গিতে আমার ওপর লেকচার ঝাড়ছে ও। 'পুতুলের গায়ে যে-ই পিনের খোঁচা দেব, দেখবি দাদু "বাবারে মারে" করে চিৎকার দিয়ে উঠেছে।'

আমরা পুতুলটার দিকে তাকিয়ে এক মনে ভাবতে লাগলাম, এটা বারেক দাদু। তারপর তিতলি পুতুলের পিঠে ঢুকিয়ে দিল পিন।

কিন্তু কিছুই ঘটল না।

'বলেছিলাম না এসব ভুয়া,' হি হি করে হেসে উঠলাম আমি।

'চুপ! এটা ভুয়া না,' ঠোঁট কামড়াল আপু, 'এটা দিয়ে তো কাজ হবার কথা ছিল। হয়তো আমি কোনও ভুল করে ফেলেছি।'

আমার বড় বোনের মাথায় একবার কোনও মতলব ঢুকলে ওটা সে হাসিল করে ছাড়বেই।

'আয় আমার সঙ্গে,' হুকুম দিল আপু। ওর পেছন পেছন চললাম চাচার লাইব্রেরিতে। চাচা বইয়ের সাংঘাতিক পোকা। হাজার হাজার বই আছে তাঁর। আমি অবশ্য গল্পের বইটই তেমন পড়ি না। তিতলি আপু পড়ে। তবে বেশিরভাগ হরর গল্প। এজন্যই বোধহয় ওর মাথায় সবসময় হরর চিন্তা গিজগিজ করে।

চাচার বিশাল লাইব্রেরির একটা আলমারি বোঝাই শুধু সেবা প্রকাশনীর বই। মাসুদ রানা, অনুবাদ, ওয়েস্টার্ন, তিন গোয়েন্দা। আরও

কত কী! তিতলি আপু আলমারি খুলে একটা বই বের করল। বইয়ের নাম **'ভুডু'** লেখক *অনীশ দাস অপু*। আপু বইয়ের পাতা খুলে মনোযোগ দিয়ে কী যেন পড়ল কিছুক্ষণ। তারপর লাফিয়ে উঠল, 'ইয়েস! পেয়ে গেছি!'

'কী পেয়েছ?'

'এখানে লিখেছে ভুডু পুতুল দিয়ে ভূতের ওঝারা যার ক্ষতি করতে চাইত, আগে ওই লোকের শরীর থেকে কিছু একটা সংগ্রহ করে নিত।'

'কী রকম?'

'ধর চুল-টুল জাতীয় কিছু।'

আমরা চলে এলাম বারান্দায়। এখন আর বৃষ্টি পড়ছে না। বেশ ঠাণ্ডা একটা হাওয়া বইছে। শীতল বাতাসে বারেক দাদু রীতিমত নাক ডাকতে লেগেছে।

'বুড়োর মাথা থেকে কীভাবে চুল আনা যায় বল তো?'

ফিসফিস করল আপু।

'গিয়ে বলব নাকি দাদু তোমার এক গাছি চুল দেবে? আমাদের খুব দরকার।'

'আরে ছাগল,' ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল তিতলি। 'তা হলে তো বুড়ো সন্দেহ করে বসবে।' হঠাৎ কী দেখে যেন ওর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'পেয়ে গেছি!'

'কী পেয়েছ?'

'বুড়োর টুপি। ওর টুপিতে নিশ্চয় চুল লেগে আছে।' আঙুল বাড়িয়ে বারেক দাদুর মাথার টুপিতে ইঙ্গিত করল আপু। 'যা, টুপিটা খুলে নিয়ে আয়।' আদেশ করল ও।

'আমি পারব না বাপু!' সভয়ে এক কদম পিছিয়ে গেলাম। 'যদি জেগে যায়?'

'যতসব ভীতুর ডিম,' আমার দিকে রোষকষায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল তিতলি আপু। তারপর পা টিপে টিপে এগোল বারেক দাদুর দিকে। পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল মিনিটখানেক। আমি দশ হাত দূরে দাঁড়িয়েও বুড়োর নাসিকা গর্জন শুনতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে বোমা

ফাটালেও এ ঘুম ভাঙবে না। দেখলাম আপু আলগোছে দাদুর মাথা থেকে সাদা টুপিটি খুলে নিল। টুপির ভিতরে চালিয়ে দিল আঙুল। তারপর আবার আগের জায়গায় ফিরে গেল টুপি। আমার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বুড়ো আঙুল তুলে দেখাল আপু। তারপর বেড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে ফিরে এল। মুঠো খুলে দেখাল। কয়েক গোছা সাদা চুল হাতে।

টেপ দিয়ে চুলের গোছা ভুডু পুতুলের গায়ে লাগিয়ে দিল তিতলি আপু। ফিরে এলাম বারান্দায়। দাঁড়ালাম একটা থামের আড়ালে। হাতে আলপিন নিয়ে আপু বলল, 'নে, এবার আবার আগের মত ভাবতে শুরু কর।'

আমরা আবার ভাবতে লাগলাম পুতুলটা অন্য কেউ নয়, স্বয়ং বারেক দাদু। তারপর ওটার নিতম্বে পিন ফুটিয়ে দিল আপু।

বিকট একটা চিৎকার দিয়ে টুল থেকে লাফিয়ে উঠল বুড়ো, পাছায় হাত ঘষছে। চেহারায় যন্ত্রণা এবং হতবিহ্বল ভাব।

হিসহিস করে উঠল আপু, 'কাজ হয়েছে!'

'এটা কাকতালীয়ভাবেও ঘটতে পারে,' বললাম আমি।

ঘটনা দেখে অবাক হলেও আমি বিস্ময়ের ভাবটুকু গোপন করেছি। কারণ চাই না আপু বুঝে ফেলুক তার কর্মকাণ্ডে আমি মুগ্ধ এবং তাজ্জব।

'তোর বিশ্বাস হচ্ছে না, না? ঠিক আছে, দ্যাখ!' বলতে বলতে পিনটা এবার পুতুলের পায়ে ঢুকিয়ে দিল তিতলি। আরেকটা আর্তনাদ ছাড়ল দাদু, এক ঠ্যাঙে লাফাতে লাগল। যে পায়ে খোঁচা খেয়েছে সেই ঠ্যাঙটা হাত দিয়ে ধরে লাফাচ্ছে।

তিতলি আপু এবার পুতুলের অপর পায়ে পিন ফোটাল। 'বাবারে মারে!' বলে বুড়ো সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে ধপাশ।

বারেক দাদুকে কোলা ব্যাঙের মত হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখে হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। আপু আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে দ্রুত বারান্দা থেকে টেনে নিয়ে এল পাছে বুড়ো আমার হাসি শুনতে পায়।

'দেখলি তো কী জিনিস আমরা পেয়ে গেছি,' বিজয় উল্লাস আপুর

চোখে। 'সত্যিকারের একটি ভুডু পুতুল!'

চাচা-চাচী বাসায় ফিরলেন বিকেল পাঁচটায়। তিতলি আপু আমাকে বলল, 'চল্, একটু মজা করে আসি।' পুতুল নিয়ে নীচে নেমে এলাম আমরা। চাচা-চাচী বাগানে চেয়ার পেতে বসেছেন। বারেক দাদু তাঁদের জন্য চায়ের আনজামে ব্যস্ত। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে বেচারা। যন্ত্রণাক্লিষ্ট চেহারা।

'আপনার কী হয়েছে, বারেক চাচা?' উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইলেন মলি চাচী। 'খোঁড়াচ্ছেন কেন?'

'জানি না, আম্মা...দুপুর বেলা একটু ঝিমুনির মত আইছিল...হঠাৎ পায়ে এমন বেদনা হইল...লাফ মাইরা উঠলাম,' চেহারা করুণ করে বলল বারেক দাদু।

'বাতের ব্যথা নয়তো?' জানতে চাইলেন বেলাল চাচা। 'তোমার তো মাঝে মধ্যেই বাতের ব্যথা ওঠে।' 'বাতের বেদনা নয় গো, ছোট সাব। বাতের বেদনা এত ব্যথা দেয় না। মনে হইল কেউ আমার পায়ে গরম লোহার পেরেক ঢুকাইয়া দিছে।'

আমরা রান্নাঘরে, জানালার পাশে দাঁড়িয়ে খিকখিক করে হাসলাম। এখান থেকে বাগান দেখা যায় পরিষ্কার, লোকজনের কথাও শোনা যায় স্পষ্ট।

'আমাকে পুতুলটা একটু দাও না,' ফিসফিস করে বললাম তিতলি আপুকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার হাতে পুতুলটা দিল ও। আমি পুতুলের হাঁটুতে ঘ্যাচ করে ঢুকিয়ে দিলাম পিন।

বারেক বুড়ো লাফ মেরে হাঁটু চেপে ধরল, তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল মলি চাচীর গায়ে। চাচী পট থেকে চা ঢালছিলেন কাপে। হাত থেকে ছিটকে গেল পট। মাটিতে পড়ে ঝনঝন শব্দে ভাঙল। চাচা হাত বাড়িয়ে চাচীকে না ধরলে পটের সঙ্গে তাঁরও পপাত ধরণীতল হত।

'আয় হায় আম্মা। এইডা কী হইল। মাফ করেন গো, আম্মা। আমারে মাফ কইরা দেন।' হাঁটুর ব্যথা ভুলে গিয়ে চাচীর কাছে হাত জোর করে মাফ চাইতে লাগল মহা বিব্রত বারেক দাদু।

'না, না। ঠিক আছে,' নিজেকে সামলে নিয়েছেন চাচী।

বেলাল চাচা বুড়োকে বললেন, 'বারেক চাচা, তোমার আসলে ডাক্তার দেখানো উচিত। কল্লোল সাহেবকে ফোন করে দিচ্ছি। তুমি তাঁর চেম্বারে চলে যাও।'

ডা. মিজানুর রহমান কল্লোল আমাদের হাউজ ফিজিশিয়ান। কাছেই তাঁর চেম্বার। রিকশা করে যাওয়া যায়।

সে রাতে শুতে যাবার সময় তিতলি আপুকে বললাম সে যেন পুতুলটা জামিল চাচার ট্রাঙ্কে ভরে রেখে আসে। কারণ এমন অশুভ শক্তির একটা জিনিস নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া না করাই ভাল। কখন কী অঘটন ঘটে যায় কে জানে! 'পুতুল দিয়ে মজা করা এক জিনিস আর মানুষের ক্ষতি করা আরেক জিনিস,' আপুকে বলেই ফেললাম শংকার কথা।

'রাখ তোর পণ্ডিতি,' ঝংকার দিয়ে উঠল তিতলি আপু। 'কারও যদি আমি ক্ষতি করিই তো তোর কী? আমার যারা ক্ষতি করেছে আমি তাদের এবারে মজা টের পাইয়ে দেব। আর শোন–' হঠাৎ আমার হাতটা জোরে মুচড়ে দিল ও। 'ভুডু পুতুলের কথা আমরা ছাড়া কেউ জানে না। তুই যদি কাউকে বলেছিস তো–' আরেকটা মোচড় দিল হাতে। '–এ পুতুল দিয়ে তোর বারোটা বাজিয়ে ছাড়ব।'

পরদিন পুতুল নিয়ে স্কুলে গেল তিতলি। ও আর আমি একই স্কুলে পড়ি। আপু নাইনে, আমি সিক্সে।

'হস্তিনী জাহেদার আজ খবর আছে,' স্কুলে ঢুকতে ঢুকতে বলল তিতলি আপু। জাহেদা ওর ক্লাসমেট। ইয়া মোটা। কমপক্ষে ৯০ কেজি হবে ওজন। আপুর সঙ্গে তার প্রায়ই খিটিমিটি লাগে।

লাঞ্চ ব্রেকের আগে আর তিতলি আপুর সঙ্গে দেখা হলো না। ওকে খুশি খুশি লাগছে।

'হস্তিনীটাকে আজ উচিত শিক্ষা দিয়েছি,' হেসে উঠল ও। তারপর ঘটনাটা বলল।

জাহেদার পাশে আপু আজ সেধে গিয়ে বসেছিল। জাহেদা ক্লাস চলার সময় টয়লেটে গেলে সে চট করে ওর ব্যাগ খুলে চিরুনি বের

করে। চিরুনিতে জাহেদার চুল লেগে ছিল। আপু চুলগুলো লাগিয়ে দেয় ভুডু পুতুলের মাথায়।

'ভূগোল ক্লাসে বসে ওকে শায়েস্তা করেছি,' খিক খিক হাসল তিতলি আপু। 'তুই তো জানিস আমাদের ভূগোলের প্রাকটিকাল আলাদা ক্লাসে হয়। আমি সবার পেছনের বেঞ্চিতে গিয়ে বসেছিলাম। তারপর চুপিসারে পুতুলটা বের করে আনি ব্যাগ খুলে। না, আজ পিন ব্যবহার করিনি। পুতুলটার মাথাটা শুধু একটু মুচড়ে দিয়েছিলাম। তাতেই হস্তিনীর অবস্থা যদি তুই দেখতি, তুলি! মাথা চেপে ধরে মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে খেতে বাচ্চাদের মত চিৎকার করছিল আর গোঙাচ্ছিল!'

জাহেদার অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল সবাই। টিচার স্কুলের এক বুয়াকে দিয়ে তক্ষুনি জাহেদাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। 'হস্তিনী কাল আবার আসুক। আরেকটা ডোজ দেব ওকে। ওর মাথা যন্ত্রণা ইহ জীবনে যাতে না ছাড়ে সে ব্যবস্থা আমি করছি।'

আপুর চেহারাটা হঠাৎ করুণ দেখাল। 'তবে দুঃখ কী জানিস, ওকে বলতে পারব না এসব কাণ্ড আমিই ঘটাচ্ছি। ও জীবনেও জানতে পারবে না আমার সঙ্গে ঝগড়া করার শোধ নিচ্ছি এভাবে। বললেই তো পুতুলের কথা জেনে যাবে।'

আমার দিকে তাকাল আপু, চাউনিতে স্পষ্ট হুমকি। 'আমাদের গোপন কথাটা কেউ জানবে না, তাই না, তুলি?'

পরদিন জাহেদা স্কুলে এসে আবার তিতলি আপুর প্রতিহিংসার শিকার হলো। ভয়াবহ মাথা ব্যথা নিয়ে আজও তাকে স্কুল ছাড়তে হলো। তারপরের দিনও একই ঘটনা ঘটল। আসলে আমার বোনটা সাংঘাতিক প্রতিহিংসাপরায়ণ। একবার কারও ওপর রেগে গেলে তার চরম সর্বনাশ না করে ছাড়ে না।

মুটকি জাহেদাকে আমারও পছন্দ নয়। কিন্তু দিনের পর দিন ওকে এভাবে নির্যাতিত হতে দেখে ওর জন্য শেষে খারাপই লাগছিল। কিন্তু আমি কী করব? আমি আপুকে একবার অনুরোধ করেছিলাম জাহেদাকে আর কষ্ট না দিয়ে রেহাই দিতে। সে আমার দিকে এমন হিম দৃষ্টিতে তাকাল যে আমার বুকের রক্ত জমে বরফ। বলল আমি যেন নিজের

চরকায় তেল দিই নইলে আমারও নাকি জাহেদার মত অবস্থা হবে।

যতই দিন যাচ্ছে, তিতলি আপুকে ততই যেন গ্রাস করে নিচ্ছে অশুভ ভুডু পুতুল। কোনও কারণ ছাড়াই সে বারেক দাদুর পেছনে লেগে রয়েছে। নানানভাবে ত্যক্ত করছে মানুষটাকে। বেচারাকে এখন প্রায়ই দৌড়াতে হচ্ছে ডাক্তার কল্লোলের কাছে কখনও হাত, কখনও পিঠ কখনও বা পেটে ব্যথা নিয়ে।

তিতলির কবল থেকে যেন কারও রেহাই নেই। সেদিন ওর ঘরে গিয়ে দেখি বিছানায় বসে চাচার পুরানো সিগার বক্স নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। বক্সটা বেশ ফুলো ফুলো দেখাচ্ছে।

'কী আছে এর ভেতরে?' জানতে চাইলাম আমি।

গর্বভরে ভেতরের জিনিসগুলো বের করে আমাকে দেখাল ও। অনেকগুলো দেশলাইয়ের বাক্স। গায়ে হিজিবিজি হস্তাক্ষরে নানানজনের নাম লেখা। বেশিরভাগ ওর ক্লাসের সহপাঠীদের নাম, দু'একজন শিক্ষকেরও নাম আছে।

'তুমি এদের সবার চুল জোগাড় করে এসব বাক্সে রেখেছ?' জানতে চাইলাম আমি।

'শুধু চুল না—আরও অনেক কিছু আছে,' জবাব দিল আপু। রিদওয়ান রহমান লেখা একটি দেশলাইয়ের বাক্স খুলল ও। মি. রহমান ওদের ম্যাথ টিচার। বাক্সের ভেতর রক্তমাখা পুরানো তুলো।

'রহমান সারের আঙুল কেটে গিয়েছিল টেবিলের ধারালো কোনায় লেগে।' জানাল তিতলি আপু। 'রক্ত মুছে তুলোটা তিনি ময়লা ফেলার ঝুড়িতে ফেলে দিয়েছিলেন। আমি ওটা কুড়িয়ে এনেছি।'

'রক্ত দিয়েও কাজ হয়?'

'অবশ্যই। যে কোনও কিছু—লোকের শরীরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকলেই হলো।'

আরেকটা বাক্স খুলল তিতলি। ভেতরে দু'তিনটে কাটা নখ।

'এ নখগুলো কার?'

'বেলাল চাচার।' শয়তানি হাসি ফুটল আপুর মুখে। আঁতকে উঠলাম আমি। 'কিন্তু এগুলো দিয়ে কী করবে তুমি?'

'তোর কী ধারণা, ছাগল? দ্যাখ—আমি মলি চাচীরও এক গোছা চুল জোগাড় করেছি।'

'কি-কিন্তু কেন? তুমি নিশ্চয় ওদের কোনও ক্ষতি করবে না?'

'না, এখনই সেরকম কোনও ইচ্ছে নেই। তবে বাধ্য হলে করব।'

'কাজটা ঠিক হচ্ছে না, আপু,' বললাম আমি। 'এ জিনিসগুলো এক্ষুনি ফেলে দাও। নইলে—'

'নইলে কী?'

'আমি তোমার ভুডু পুতুলের কথা সবাইকে বলে দেব।'

আরেকটা দেশলাইয়ের বাক্স বের করল তিতলি। ওতে আমার নাম লেখা। 'খবরদার কাউকে এ কথা বলবি না। বললে তোর দশা কী হবে বুঝতে পারছিস?'

বাক্স খুলল ও। ভেতরে আমার দুধ দাঁত। জীবনের প্রথম দুধ দাঁত। যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম নিজের টেবিলের ড্রয়ারে। তিতলি আপু কখন ওটা হাতিয়ে নিয়েছে টেরও পাইনি।

'দাঁত দিয়ে চুল এবং রক্তের মতই কাজ হয়,' হুমকি দিল তিতলি। 'কাজেই মুখটা বন্ধ রাখবি—নয়তো তোরও বারোটা বাজিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে!' ভয় পেয়ে গেলাম আমি।

নিজের ঘরে ফিরে এলাম। ভয়ে শুকিয়ে গেছে কলজে। যে সব জিনিস জোগাড় করেছে তিতলি আপু ও দিয়ে অনেক লোকের ক্ষতি করতে পারবে ও। আমাকেও যে ছেড়ে কথা কইবে না তা তো বুঝিয়েই দিল। অবশ্য যদি আমার আপন বোন হত তা হলে নিশ্চয় আমার ক্ষতি করার হুমকি দিত না। ওর সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক নেই বলেই আমার ক্ষতি করতে দ্বিধা করবে না তিতলি। দিন দিন যেভাবে বেপরোয়া হয়ে উঠছে, আমার মন বলছে শীঘ্রি খুব খারাপ কিছু হয়তো ঘটবে।

এক হপ্তা পরে সত্যি ভয়ঙ্কর একটি ঘটনা ঘটল। ভুডু পুতুল নিয়ে দিনরাত মেতে থাকা তিতলি আপু স্কুলের পড়ায় একটুও মন দিচ্ছিল না। সাপ্তাহিক পরীক্ষাগুলোয় বেশিরভাগ সাবজেক্টে ফেল করছিল ও। শাস্তি হিসেবে হেড মিস্ট্রেস ওকে নাচের দল থেকে বহিষ্কার করলেন।

বললেন সাপ্তাহিক পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল না করা পর্যন্ত ওকে নাচের দলে নেয়া হবে না। ওর জায়গায় শারমিন দীপা নামে একটি মেয়ে সুযোগ পেয়ে গেল। দীপার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে কারণ তিতলি আপু এ মেয়েটির একগুচ্ছ চুল তার সিগার বক্সে সযত্নে রেখে দিয়েছে।

ঘটনাটা যখন ঘটাল আপু, আমি তখন ওর সঙ্গে ছিলাম। আমরা স্কুলের মূল সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমাদের স্কুলটা বিশাল। তিনতলা। নাইন এবং টেনের ক্লাস নেয়া হয় তিনতলায়। তিতলি তার ইউনিফর্মের পকেটে ঢুকিয়ে এনেছে ভুডু পুতুল। শাস্তি দেবে শারমীন দীপাকে। শারমীন দীপার অপরাধ সে আপুর জায়গা দখল করার পরে নাকি মশকরা করে বলেছিল, 'তোমার কপাল ভালই পুড়েছে, তিতলি। মনে হয় না নৃত্যাঞ্জলিতে নাচার সুযোগ তুমি আর কোনদিন পাবে।'

'নৃত্যাঞ্জলি' নামে চ্যানেল আইতে একটি নাচের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। আমাদের স্কুল ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। আগামী সোমবার অনুষ্ঠানটির রেকর্ডিং। আপুর খুব শখ ছিল টিভিতে নাচবে। কিন্তু শখটা আর পূরণ হলো না। শারমীন দীপার নাম ছিল ওয়েটিং লিস্টে। তিতলি আপু দল থেকে বাদ পড়ায় টিভিতে চেহারা দেখানোর সুযোগ পেয়ে গেছে ও। এমনিতেই অপমানে জ্বলছিল আপু, তার ওপর দীপার বক্রোক্তি ছিল ওর জন্য কাটা গায়ে নুনের ছিটে। রাগে ওর ফর্সা মুখ লাল। আমি ভেবেছি শারমীন দীপাকে হয়তো হালকা শাস্তি দেবে আপু। কিন্তু ওর প্রতিহিংসা যে কত ভয়ানক চাক্ষুস প্রমাণ পেলাম সেদিন। ক্রুদ্ধ ঘোড়ার মত মেঝেতে পা ঠুকছিল আপু। আর ও রেগে গেলে উন্মাদ হয়ে ওঠে। এবং উন্মাদ হয়ে উঠলে যা খুশি তাই করতে পারে তিতলি আপু।

'ওই যে আসছে ইঁদুরটা,' সাপের মত হিসহিস করে উঠল আপু। দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নামছে শারমীন দীপা। আপু পকেট থেকে পুতুলটাকে বের করেই বাঁ পায়ে দিল এক মোচড়।

প্রাণঘাতী আর্তনাদ বেরিয়ে এল দীপার মুখ থেকে। বিস্ফারিত চোখে দেখলাম ওর বাঁ পা অদ্ভুতভাবে বাঁকা হয়ে গেছে, পরমুহূর্তে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল দীপা। ডিগবাজি খেতে খেতে সিঁড়ি বেয়ে ছিটকে মেঝেতে

হাঁটু ভাঙা 'দ'-এর মত পড়ল। পড়েই থাকল। আর নড়াচড়া করছে না। পতনের চোটে নাক-মুখ ফেটে গেছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। সবাই ছুটে এল। ক্লাসে যাচ্ছিলেন আমাদের এক টিচার, মি. শামসুদ্দীন। তিনিও ছুটে এলেন। তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলেন রক্তাক্ত দীপাকে দেখে। ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স আনা হলো। দীপাকে নিয়ে হাসপাতালে রওনা হয়ে গেল অ্যাম্বুলেন্স।

শারমিন দীপার এমন অবস্থা দেখে আমার চোখে প্রায় জল এসে গেল। তিতলি আপুর খুবই অন্যায় হয়েছে কাজটা। তার বদলে দীপাকে তার নাচের দলে নেয়া হয়েছে এটা নিশ্চয় মেয়েটার দোষ নয়। আর দীপা যদি আপুকে নিয়ে একটু মশকরা করেই থাকে তাই বলে এত বড় শাস্তি দিতে হবে? দীপার নিশ্চয় পা ভেঙে গেছে। কিন্তু আমার বোনের কোনও বিকার দেখলাম না। সে আমাকে টেনে নিয়ে গেল ওখান থেকে। মুখে তৃপ্তির হাসি।

'এবার দেখব শারমীন দীপা কীভাবে টিভিতে নাচে!' কণ্ঠে বিষ ঢেলে বলল আপু।

পরদিন স্কুলে এসে শুনলাম দীপাকে ভাঙা পা নিয়ে কমপক্ষে পনেরো দিন হাসপাতালে শুয়ে থাকতে হবে। আরও একমাসের আগে তার হাঁটাচলার জো নেই। তিতলি আপুকে আবার নাচের দলে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে। তবে শারমীন দীপা দেড়মাস স্কুলে আসতে পারবে না শুনে সে দুঃখ প্রকাশ তো করলই না বরং মুচকি হেসে আমাকে বলল, 'আমার সঙ্গে লাগতে এলে এখন থেকে সবার দশা এরকম করব। কাউকে ছেড়ে দেব না।'

তিতলি আপুকে নিয়ে আমার খুব চিন্তা হচ্ছিল। দিন দিন ও বেপরোয়া হয়ে উঠছে। মানুষকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পাচ্ছে। ওকে কী করে ঠেকাব বুঝতে পারছি না।

একদিন সকালে বেলাল চাচার কাছে একটি চিঠি এল। লিখেছেন আমাদের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। চিঠি পড়ে রেগে আগুন চাচা।

'তিতলি কোথায়?' গর্জন ছাড়লেন তিনি।

'ওর ঘরে,' বললাম আমি।

ঝড় তুলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন চাচা। আমার চাচার স্বভাবটা শান্ত। তবে রেগে গেলে তিনি বাঘ। আমি চাচার পেছন পেছন ওপরে চলে এলাম। তবে আপুর ঘরে ঢোকার সাহস হলো না। দাঁড়িয়ে রইলাম দরজার পাশে। ভয়ে ধড়ফড় করছে বুক। চাচা যেরকম রেগেছেন আপুর কপালে কী আছে আল্লাই জানেন...

'এর মানে কী!' বেলাল চাচার ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ভেসে এল। 'তোমার হেডমিস্ট্রেস কমপ্লেন লেটার পাঠিয়েছেন। বলছেন তুমি নাকি পড়াশোনায় একদম মনোযোগী নও। সাপ্তাহিক সবগুলো পরীক্ষায় ফেল মেরে বসে আছ। আর শিক্ষকদের সঙ্গেও নাকি ভাল ব্যবহার করছ না। তুমি জানো কত কষ্ট করে ওই স্কুলে তোমাদের দু'বোনকে ভর্তি করিয়েছি? হেডমিস্ট্রেস যদি এখন তোমাকে স্কুল থেকে বের করে দেন?'

জবাবে বিড়বিড় করে কী যেন বলল তিতলি আপু ঠিক বোঝা গেল না।

'তোমাকে একটা কথা পরিষ্কার বলি, তিতলি, শোনো,' গরগর করে উঠলেন চাচা। 'এখন থেকে প্রতিদিন স্কুল শেষে বাড়ি ফিরে সোজা হোমওয়ার্ক নিয়ে বসবে। আমি নিজে তোমার পড়া নেব। আমি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তোমার ছুটি নেই।'

'তাই নাকি?' ভেসে এল তিতলি আপুর চিৎকার, 'তুমি আমাকে জোর করলেই হলো? আমাকে তোমার শাসন করার অধিকার নেই। কারণ তুমি আমার বাবা নও!' চটাস করে চড় মারার শব্দ হলো। সাথে সাথে আপু গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল।

'আবার যদি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলেছ!' ভেসে এল চাচার গমগমে কণ্ঠ। তারপর খুলে গেল দরজা। থমথমে চেহারা নিয়ে বেরিয়ে এলেন চাচা।

আমি আপুর ঘরে ঢুকলাম। বিছানায় বসে কাঁদছে ও। ফর্সা ডান গাল লাল হয়ে আছে। আঙুলের দাগ পড়ে গেছে। আমাকে দেখে মুখ তুলে তাকাল ও।

'ও কে যে আমার গায়ে হাত তোলে?' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল

তিতলি আপু, 'তোর বাবা-মা পর্যন্ত কোনদিন আমার গায়ে একটা টোকা পর্যন্ত দেয়নি। আর ওই লোকটা আমাকে এভাবে মারল! ঠিক আছে, আমিও দেখাচ্ছি মজা।'

লাফ মেরে বিছানা ছাড়ল আপু। ছুটে গেল ওয়ার্ড্রোবের সামনে। ওর রাতের পোশাকের নীচে লুকানো সিগার বক্স। বের করল ওটা। বক্স খুলে বের করল বেলাল চাচার নাম লেখা দেশলাইয়ের বাক্স।

'ক্-কী করছ তুমি?' আঁতকে উঠলাম আমি।

'দ্যাখ না কী করি!'

তিতলি আপু বেলাল চাচার একটা কাটা নখ পুতুলের গায়ে সেঁটে দিল সেল্লোটেপ দিয়ে। তারপর মুখটা বিকৃত করে ধাঁই করে পিন ঢুকিয়ে দিল পুতুলের বুক বরাবর।

নীচে, লাইব্রেরি ঘর থেকে ভেসে এল বেলাল চাচার চিৎকার।

আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ি বেয়ে নীচে ছুটলাম। ভয়ে শুকিয়ে গেছে কলজে। জানি না কী দেখব!

বেলাল চাচা লাইব্রেরি ঘরের মেঝেতে বুক চেপে গড়াগড়ি খাচ্ছেন, ব্যথায় নীল হয়ে গেছে মুখ, কোটর ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ। গলা দিয়ে ঘরঘর আওয়াজ বেরুচ্ছে।

আমি ঘর ফাটিয়ে চিৎকার দিলাম, 'চাচীইই!'

স্কয়ার হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্স চলে এল। ডা. কল্লোল ফোন পাওয়া মাত্র ছুটে এসেছেন। চাচাকে পরীক্ষা করে বললেন হার্ট-অ্যাটাক। রক্তশূন্য মুখে মলি চাচী চাচাকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে উঠলেন। কল্লোলও গেলেন সঙ্গে। আমি ছোট বলে সঙ্গে নিলেন না। আর তিতলি আপু ঘর থেকেই বেরুল না। বারেক দাদু দেশের বাড়ি।

অ্যাম্বুলেন্স হাসপাতালে রওনা হবার পরে আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে ওপরে চলে এলাম। সোজা ঢুকলাম তিতলির কামরায়। সে বিছানায় বসে কুৎসিত চেহারার পুতুলটাকে আদর করছে। পুতুলের বুকে তখনও গেঁথে আছে আলপিন।

'তুমি মানুষ নও, ডাইনি!' তিতলির দিকে তাকিয়ে গলা ফাটালাম

আমি। 'পর যে আপন হয় না তুমি আজ আবার প্রমাণ করলে। বাবা-মা যে কী কুক্ষণে তোমার মত মেয়েকে দত্তক নিয়েছিল! চাচা যদি মরে যায়!'

শ্বাপদের মত জ্বলে উঠল তিতলির চোখ। 'তোরা কেউ আমার আপন নোস্ তা তো ভাল করেই জানিস তা হলে আবার প্যাঁচাল পাড়ছিস কেন? তোর চাচা মরে গেলে আমার কী? আমার গায়ে হাত তুলেছে। এখন তার ফল ভোগ করুক।'

আমি কটমট করে তাকিয়ে থাকলাম তিতলির দিকে। 'তোমাকে আমার আপু ডাকতেও ঘৃণা হচ্ছে!' বলে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

রাত ন'টার দিকে মলি চাচী হাসপাতাল থেকে ফোন করলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন মারা গেছেন বেলাল চাচা। এটা তাঁর দ্বিতীয় হার্ট স্ট্রোক। ডা. কল্লোল নাকি চাচার প্রথমবার স্ট্রোকের সময়ই বলেছিলেন দ্বিতীয়বার স্ট্রোক হলে চাচাকে বাঁচানো মুশকিল হবে। চাচা সাবধানতা অবলম্বন করে চলতেন। কিন্তু তিতলি তাকে বাঁচতে দিল না।

চাচী বাসায় ফিরলেন রাত একটার সময়, লাশ দাফন করে। জানালেন ডা. কল্লোলই সব ব্যবস্থা করেছেন। আমাদেরকে গোরস্তানে যেতে দেয়া হয়নি যদি ভয় পাই! ঢাকায় চাচীর কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। পরম আত্মীয়ের কাজ করেছেন কল্লোল চাচা। তাঁর স্ত্রী, ওয়ানাইজা চাচী সর্বক্ষণ ছিলেন মলি চাচীর সঙ্গে। রাতে আমাদের সঙ্গে থাকতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু মলি চাচী বললেন দরকার নেই।

ওয়ানাইজা চাচী চলে যাবার পরে অনেকক্ষণ কাঁদলেন মলি চাচী। তাঁর সঙ্গে আমিও কাঁদলাম। একবার ভাবলাম চাচীকে বলে দিই ভুডু পুতুলের কথা। কিন্তু বিশ্বাস করবেন না বলে চুপ করে রইলাম। বেলাল চাচাকে আমি খুব পছন্দ করতাম। বাবার মৃত্যুর পরে তিনি আমাদেরকে বাবার আদর দিয়ে পিতা-মাতার মৃত্যু শোক অনেকটাই ভুলিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ তিতলিটা এরকম একজন মানুষের ভালবাসার প্রতিদান দিল এভাবে!

কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লেন চাচী। আমি একটা কাঁথা দিয়ে

তাঁর গা ঢেকে দিলাম। তারপর চলে এলাম তিতলির ঘরে। তিতলি নাইটি পরে আছে তবে ঘুমায়নি এখনও। মৃত পুতুলটাকে দোল খাওয়াচ্ছে আর গুনগুন করে গান গাইছে। আমার ওর দিকে আর তাকাতে ইচ্ছে করছিল না। ঘেন্না লাগছিল। চলে আসছি, পেছন থেকে খপ করে আমার হাত চেপে ধরল তিতলি। ঘুরলাম আমি। তিতলির চোখ উন্মাদের মত চকচক করছে।

'পুরো ঘটনাটার জন্য মলি চাচী আমাকে দোষারোপ করবে জানি আমি,' খসখসে গলায় বলল ও। 'পুতুলটার কথা অবশ্য সে জানে না, তবে বেলাল চাচার সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটি তো শুনেছে। সে ধরেই নেবে আমার কারণে হার্ট-অ্যাটাক হয়েছে চাচার।'

'ঠিকই তো, তোমার জন্যই মারা গেছে চাচা। এই পুতুলটা তোমাকে একটা ডাইনি বানিয়েছে, আপু।'

'আপু' বলতে চাইনি, কিন্তু মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে।

'আমি ডাইনি না,' হিসিয়ে উঠল তিতলি, 'ডাইনি তোর মলি চাচী। সে তোকে যতটা ভালবাসে তার সিকিভাগও আমাকে বাসে না। বাসবেই বা কেন আমি তো তোর আপন বোন নই। এখন আমার জীবনটাকে নরক বানিয়ে ছাড়বে। কিন্তু আমি সে সুযোগ তাকে দেব না।'

'কেন? কী করবে তুমি তার?' আমার মুখ শুকিয়ে গেল। 'প্লীজ, চাচীর কোন ক্ষতি কোরো না।'

'এ বাড়িতে শুধু তুই আর আমি থাকব,' শীতল হাসল তিতলি। 'তোকে আমি যতই বকাঝকা করি না কেন তোকে আমি যথেষ্ট ভালওবাসি, তুলি। এ বাড়িতে শুধু আমরা দু'জন থাকলে কেউ আমাদেরকে চোখ রাঙাতে পারবে না, কিছু বলতে পারবে না।'

তিতলির হাসি আমার সমস্ত শরীরে ঢেলে দিল বরফ জল। ওকে তো আমি চিনি। ও যখন প্ল্যান করেছে ঠিকই খুন করে ফেলবে মলি চাচীকে। ওকে আমার থামাতেই হবে...

আমি হাঁটু গেড়ে ওর সামনে বসলাম। করজোড়ে বললাম, 'প্লীজ, আপু, চাচীকে মেরো না। মলি চাচী তোমাকে কম ভালবাসে কথাটা ঠিক না। সে তোমাকে আমার মতই ভালবাসে।'

'আরে যা ছাগল!' ঠোঁট ওল্টাল তিতলি।

'তা হলে কাল সকাল পর্যন্ত অন্তত চাচীকে বেঁচে থাকতে দাও,' আকুতি করলাম আমি। 'এখন তুমি রাগের চোটে উল্টোপাল্টা বলছ। কাল সকালে হয়তো তোমার গরম মাথাটা ঠাণ্ডা হবে। তখন আর এসব খুন খারাবীর চিন্তা করবে না।'

'আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তার নড়চড় হবে না,' নিষ্ঠুর গলায় বলল তিতলি। 'আমার পা ধরে কান্নাকাটি করলেও লাভ নেই। তোর চাচীকে মরতেই হবে। সে আজ রাতে হোক আর কাল সকালেই হোক।'

আমি থ হয়ে গেলাম। পনেরো বছরের একটা মেয়ে কী অবলীলায় বলছে সে একজন মানুষকে খুন করবে। এটা কি সত্যি তিতলি নাকি ওই শয়তান ভুডু পুতুলটা ওর ওপর ভর করেছে, ওকে সম্মোহন করে এসব কাজ করাচ্ছে? আমি 'ভুডু' বইটা পড়েছি তিতলির কাছ থেকে নিয়ে। কোনও কোনও ভুডু পুতুলের ওপর নাকি পৈশাচিক আত্মা ভর করে। তারা ভুডু পুতুলের মালিককে সম্মোহন করে তাকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করায়। তিতলির ক্ষেত্রে এমন কিছু ঘটেনি তো?

তিতলি আবার তার পুতুল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি ওর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ঢুকলাম নিজের ঘরে। শুয়ে পড়লাম বিছানায়। কিন্তু ঘুম আসছে না। ভাবছি তিতলি মলি চাচীর কোনও ক্ষতি করার আগেই ওর কাছ থেকে কীভাবে পুতুলটাকে বাগিয়ে আনা যায়।

কিন্তু তিতলি পুতুলটাকে কখনও কাছ ছাড়া করে না। এমনকী ঘুমায়ও ওটাকে বুকে জড়িয়ে। পুতুল চুরি করতে গেলে ও নির্ঘাত জেগে যাবে।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায়। কাজটা ভয়ঙ্কর কিন্তু এ ছাড়া তিতলিকে থামাবার কোনও উপায় নেই।

আমি অনেকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইলাম বিছানায়। মোটামুটি যখন নিশ্চিত হলাম এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে তিতলি, পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলাম নিজের কামরা থেকে। আমার পাশের ঘরটাই তিতলির বেডরুম। ওর ঘরে ঢুকলাম বুকে হৃৎপিণ্ডের ধড়াশ ধড়াশ নিয়ে। সোজা চলে গেলাম তিতলির ওয়ার্ড্রোবের সামনে। লুকানো জায়গা থেকে বের করে

নিলাম সিগার বক্স।

চাঁদের আলোয় 'মলি চাচী' লেখা দেশলাইয়ের বাক্সটি তুলে নিলাম। বাক্সের ভেতরে মলি চাচীর কয়েক গাছি চুল।

আমি নিঃশব্দ পায়ে চলে এলাম আমার ঘুমন্ত বোনের শিয়রে। ড্রেসিং গাউনের পকেটে আগেই নিয়ে আসা ছোট, ধারালো কাঁচিটি বের করে অত্যন্ত সাবধানে তিতলির এক গোছা চুল কেটে নিলাম। চাচী এবং তিতলি দু'জনের চুলই কুচকুচে কালো। ভালভাবে লক্ষ না করলে বোঝা যাবে না কার চুল কোন্‌টা।

চাচীর চুল দেশলাই বাক্স থেকে বের করে ফেলে দিলাম। ওখানে ভরে রাখলাম তিতলির চুল। তারপর চুপচাপ সিগার বক্স যথাস্থানে রেখে বেড়ালের পায়ে ফিরে এলাম নিজের ঘরে। সে রাতে আর ঘুম হলো না আমার। সারারাত কাঁদলাম। চাচার জন্য এবং তিতলির জন্য। আমি এরকম কিছু করতে চাইনি। কিন্তু মলি চাচীকে বাঁচাতে এ ছাড়া অন্য কোনও উপায়ও ছিল না।

পরদিন সকালে উঠে তিতলির পায়ে ধরলাম যেন সে মলি চাচীর কোনও ক্ষতি না করে। কিন্তু আমার কথা কানেই তুলল না। সে ইতিমধ্যে পুতুলের গায়ে সেল্লোটেপ দিয়ে জড়িয়ে দিয়েছে চুল।

'আয়,' বলল তিতলি, 'এক সঙ্গে উপভোগ করি মজা।'

মলি চাচী ডাইনিং টেবিলে বসে আছেন। তাকিয়ে আছেন দেয়ালের একটি বাঁধানো ফটোগ্রাফের দিকে। চাচী আর চাচার বিয়ের রঙিন ছবি। আমাদের দিকে পেছন ফেরা। তবে থেকে থেকে পিঠটা কেঁপে উঠছে বলে বোঝা যায় চাচী কাঁদছেন।

তিতলি পিন ঠেকাল ভুডু পুতুলের মাথায়।

'প্লীজ, আপু...প্লীজ,' ফিসফিস করলাম আমি, আমাকে গ্রাহ্য করল না তিতলি। মলি চাচীর দিকে তাকিয়ে অশুভ, ভয়ঙ্কর একটা হাসি ফুটল মুখে।

তারপর সে পিনটা আমূল বসিয়ে দিল পুতুলের মাথায়।

বিস্মিত, যন্ত্রণাকাতর একটা দৃষ্টি ফুটল তিতলির চোখে। হাত থেকে খসে পড়ে গেল পুতুল। গগনবিদারী একটা চিৎকার দিল তিতলি।

তারপর পুতুলের মত সে-ও চেয়ার থেকে পড়ে গেল মেঝেতে। বাঁকাতেরা হয়ে শুয়ে রইল।

আমি লাফ মেরে মেঝে থেকে তুলে নিলাম পুতুল, একটানে খুলে নিলাম পিন।

কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে...

স্কয়ার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো তিতলি আপুকে। ও বেঁচে আছে। তবে ডাক্তাররা বলেছেন ওর ভয়ানক ব্রেন হ্যামারেজ হয়েছে। বাকি জীবনটা হাসপাতালেই কাটাতে হবে। মেশিনের সাহায্যে বেঁচে থাকবে ও, তবে মানুষ হিসেবে নয়। একটা ভেজিটেবল হয়ে।

আমি মলি চাচীর সঙ্গে আছি। বড্ড নিষ্প্রাণ আমাদের জীবন। চাচাকে হারিয়ে চাচীর মুখ থেকে সেই যে নিভে গেছে হাসি, ফিরে আসেনি আর।

আমরা প্রতি বিষ্যুদবার তিতলি আপুকে দেখতে হাসপাতালে যাই। ও আমাদেরকে চিনতে পারে না।

আর ভুডু পুতুল? ওটা এখন আমার জিম্মায়। ওটা মানুষের যে ক্ষতি করেছে, আমি চাই না ওকে অন্য কেউ আবার ব্যবহার করার সুযোগ পাক...শুধু আমি ছাড়া!

অনীশ দাস অপু

হরর কাহিনি

ছায়াবৃত্ত

অনীশ দাস অপু সম্পাদিত

দেড় ডজন গল্প নিয়ে প্রকাশিত হলো অনীশ দাস অপু'র দশম হরর সংকলন 'ছায়াবৃত্ত'। নামে হরর হলেও এ বইতে পিশাচ কাহিনির আধিক্যই বেশি। যাঁরা পৈশাচিক গল্প পছন্দ করেন তাঁদের দারুণ লাগবে এ বই। আর যাঁরা ভালবাসেন হরর-এর আদলে গায়ে কাঁটা দেয়া রোমাঞ্চ কাহিনি, তাঁরাও হতাশ হবেন না বইটি পড়ে। 'ছায়াবৃত্ত' আক্ষরিক অর্থেই একটা ভৌতিক ছায়া দিয়ে ঢেকে রাখবে আপনাদের। বই পড়া শেষ না করা পর্যন্ত এ ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতেই পারবেন না!



সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

